পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক উচ্চতর ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের জন্ত নির্ধারিত
পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত

মধ্যশিক্ষা জীববিজ্ঞান

১ম খণ্ড

(নবম শ্রেণীর জন্য)

গীতা নন্দ এম্. এস্ সি.

জগৎ নারায়ণ দাস বি. এস্-সি. (অনার্স)
সালকিয়া এ. এস. (বহুমুখী, উচ্চ মাধ্যমিক [illegible] জীববিজ্ঞানে[illegible]
শিক্ষক ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জী[illegible]

ও

[illegible] আ[illegible]

তুষারকান্তি গিরি বি. এস্-[illegible]
জীববিজ্ঞান বিভাগ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় [illegible]লেজ)

দিলীপকুমার নন্দ এম্ এস্-সি. ([illegible]ড মেডালিস্ট)
প্রাণিবিজ্ঞান ও কীটতত্ত্বের অধ্যাপক, কৃষিবিভাগ—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত

প্রাপ্তিস্থান :

নিউ ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স
৮/এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মেসার্স চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১/১/১এ ও বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

বাণী-বিচিত্রা
১৮৩/১, বিধান সরণী (কর্নওয়ালিশ
কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ
কে. ব্যানার্জী
কে. এন্. পাবলিশিং
১৪/১, পেসকার লেন
সালকিয়া—হাওড়া

প্রচ্ছদপট ও চিত্র-রূপায়ণে ঃ
হেমকেশ ভট্টাচার্য বি. এ.

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীধরণী কান্ত
নিউ লক্ষীশ্রী প্রেস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রী
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ— ১৩৬৩ সাল।
দ্বিতীয় সংস্করণ— ১৩৬৬ সাল।
সংস্করণ— ১৩৬৭ সাল।

মূল্য—চার টাকা মাত্র

আমাদের কথা

বছর ঘুরে আসতে না আসতেই আবার আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ কল্পনাতীত ছিল। বইটির গুণগ্রাহী শিক্ষককুলই যে এই সুযোগ আমাদের করে দিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই সর্বপ্রথম তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। শিক্ষক ছাত্রকে শেখান না, শিখতে সাহায্য করেন মাত্র—বিজ্ঞানাশ্রয়ী বস্তুবাদী চিন্তাধারায় এ সত্যকে আজ আর অস্বীকার করা যায় না, কারণ এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে কোন কিছুর অন্তঃস্থ শক্তিই তার বিকাশের মুখ্য কারণ, বাইরের শক্তি সেই বিকাশকে প্রভাবিত করে মাত্র। তাই ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত ঔৎসুক্য, জিজ্ঞাসা ও আগ্রহকে আমরা সমধিক গুরুত্ব দিই। দিই বলেই বইটির উন্নতি বিধানে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক মহোদয়দের পরামর্শগুলি যেমন আমরা সাদরে গ্রহণ [illegible] তেমনি ছাত্রদের সু[illegible] অসুবিধাগুলিও যত্নসহকারে বিবেচনা করার চে[illegible] এ বিষ[illegible] ছাত্রের নিকট হতে প্রাপ্ত কয়েকটি চিঠি আমাদে[illegible] হয়েছে। তাই তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

বইটির উন্নতি সাধনে কী করেছি, আর কী ক[illegible]—এই দু'টো প্রশ্নের প্রথমটির উত্তর দেওয়া সহজ; কিন্তু দ্বিতীয়টি[illegible]রিধি ব্যাপক, সীমাহীন। কারণ বৃহত্তম, সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠতম প্র[illegible]কথা বিকাশশীলতার সত্যনিষ্ঠ মতবাদে নাকচ হয়ে গেছে। সুতরাং কী [illegible]রতে পারতাম—এই প্রশ্ন সব সময়েই আছে, থাকবে এবং কোনদিন শেষ হবার নয়। তাই এর উত্তর এড়িয়ে প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই আসা যাক। ছোট-খাটো রদবদলের কথায় না গিয়ে বইটির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথার [illegible]ধ্যই আমাদের বক্তব্য সীমিত রাখছি। প্রথমতঃ পূর্ব সংস্করণে উদ্ভিদ কোষের বর্ণনা এমনভাবে দেওয়া ছিল, যার ফলে পরীক্ষায় এলে উদ্ভিদ কোষের বিবরণ ছাত্রদের পক্ষে গুছিয়ে লেখা একটু দুরূহ ছিল। তাই ছাত্রদের সুবিধার্থে আদর্শ উদ্ভিদ কোষের কার্যকারিতাসহ একটি পৃথক বর্ণনা এই সংস্করণে সংযোজন করে দিয়েছি। পরে কোষের বিভিন্ন অংশের বিস্তৃত বিবরণ আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে। আগের সংস্কারণে 'প্লাসটিড' সম্পর্কে বিবরণ ছিল নাতিদীর্ঘ। এই সংস্করণে 'প্লাসটিডে'র আকৃতি, উপস্থিতি ও উদ্ভব, গঠন, কার্যকারিতাসহ প্রকারভেদ প্রভৃতির বিবরণ আরও বিশদ করা হয়েছে। ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে কতিপয় নির্দেশও ছাত্রসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে দেওয়া

হয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানের খুব বড় রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিনি ; কেবল পূর্ব সংস্করণের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি শুধরে দিয়েছি। বইটিকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট হতে গঠনমূলক সমালোচনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করি।

—গ্রন্থকারত্রয়

প্রথম সংস্করণে আমাদের কথা

প্রথমেই একথা বলা আবশ্যক যে কেবল মাত্র বইয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও লেখক তালিকায় নতুন নামের সংযোজন এই বই রচনার উদ্দেশ্য নয়। গতানুগতিকতা [illegible]র দুরূহতা অতিক্রম ক[illegible] সহজ, সরল ও চলিত ভাষায় পাঠ্যবিষয়ের [illegible]যণের [illegible]মনে বিজ্ঞান-প্রীতি ও আত্ম প্রতীতি জন্মাবার প্রয়াসেই এ[illegible] সংযত ও স্বল্প কথায় বিস্তৃত তথ্য ও জটিল তত্ত্বের প্রাঞ্জল[illegible]ক স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও শি[illegible]জন মেটাবার উপযুক্ত হাতিয়ারের মর্যাদালাভে এটি সফল হবে বলেই [illegible]শা করি।

‘ম্যানগ্রোভ অর[illegible] উভচর উদ্ভিদ’, ‘প্রাণী শ্বেতসার’—কাকে বলে ; ‘নেকটার’ প্রোটোপ্লা[illegible] কোন্ বস্তু ; ‘প্রোটোজোয়া’ ‘এককোষী প্রাণী, না ‘কোষবিহীন প্রাণী’ ; ‘প্যারোটিড্’ ও প্যারাটয়েড’ গ্রন্থির তফাৎ কী ; ‘প্যারাজোয়া’ কাদের বলে ; ‘এলিট্রা’, ‘সারভিকাম্’ কী—বইটিতে এই রকম কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ছাত্র-মানসে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুহল জাগ্রত ক’রে ‘জীববিজ্ঞান’ শিক্ষায় তাদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের উদ্রেক করবে।

এই বইটির প্রকাশক মহাশয় এবং বন্ধুপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম্. এস্-সি যে ভাবে আমাদের উৎসাহিত করেছেন তাতেই বইটির পরিকল্পনার ভিত্তি রচিত হয়েছে। তাই তাঁদেরকে শুধু ধন্যবাদ জানানো ধৃষ্টতা। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের জীববিজ্ঞান শাখার মাননীয় অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার নন্দ অতি যত্ন সহকারে প’ড়ে বইটির পাণ্ডুলিপি শোধন ক’রে দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নির্দেশিকা রচনায় সাহায্য করায় স্নেহাস্পদ অঞ্জন রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

—গ্রন্থকারত্রয়

Board of Secondary Education, West Bengal

HIGHER SECONDARY COURSE

BIOLOGY

Class IX

Course Constant.	Demonstration.	Practical.	Field Class
Diversity of, life (in Plants) **Habitat, Habit** Distribution on the Earth (elementary) aquatic terrestrial Different substratum Creeping, climbing (by means of tendril, twining) Erect Herb, Shrub, Tree Duration of life Autophyte, Heterophyte—Epiphyte, Parasite, Saprophyte, Insectivorous plants Flowering, Non-flowering.	Charts Charts—Type specimens Protococcus, Spirogyra, Yeast, Mucor (Agaricus) Moss, Fern Water Lily, Bladder wort Jaba (Mango), Pea (Aparajita) Cuscuta, Tulsi Orchid, Grass (Paddy), Coconut		Instruction—to preserve specimens (especially in dry condition). Encourage to collect plant or parts of plants from field and to preserve dry.
Microscope	Instrument—ch Instruction to— section of the specim examine through the use, care and precaution.	raw Take note, observe and practice.	
Similarity of life in internal structure (in plants) **Unicellular plant** **Multicellular plant**	Protococcus, yeast, spirogyra Slide chart	Draw	
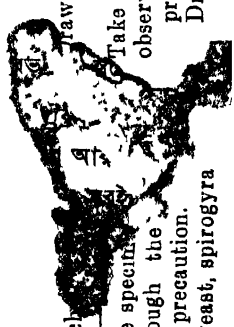
Course Content.	Demonstration	Practical.	Field class
Unit of life		Exami[illegible]e under micros-co[illegible] cells of Onion or T[illegible]ato or Guava and [illegible]aw.	
Cell			
Protoplasm	Movements in a [illegible] of Vallisneria and [illegible] of the filament of Tradescantia.		
	Chemical test in a test tube.	Record.	
Protoplasmic contents			
Cytoplasm, Nucleus, Plastids			
Non-protoplasmic cell contents			
Vacuole			
Starch grain	Charts, specimens	Examime under microscope potato scrapings and section and draw.	
Sugar	Test tube experiment	Record.	
Proteid grains	Section endo-perm of castor examine under microscope	Draw.	
Fat and oil	Specimen—Castor	See that the endosperm of the specimen burns when placed over flame. Leaves a greasy mark on paper when rubbed on it.	

Course content.	Demonstration.	Practical.	Field Class
Cystolith	Slide chart	Draw.	
Raphide	Slide chart	Draw.	
Cell wall	Test for Cellulose and Lignin,	Record.	
Increase in the number of unit.			
Cell division			
Broad outline of Mitosis	Chart, model, slide.	Draw.	
Division of Labour among the units			
Tissues (in Plants)			
Meristematic, Permanent, Parenchyma, Collenchyma **Sclerenchyma**, Vascular Laticiferous	Slides, charts		
Tissue systems (in Plants) in Root, Stem, Leaf	Slides, charts	[illegible] the system separately found in Root, Stem and [illegible]	

Course Content.	Demonstration.	Experiment.
I. A general survey of the animal kingdom and distinctive external features of the following specimens :— (1) Guinea-pig, (2) Pigeon, (3) Lizard, (4) Toad, (5) Frog, (6) Rohu, (7) Shingi, (8) Magur, (9) Koi, (10) Snail, (11) Spider, (12) Centiped, (13) Cockroach, (14) Prawn, (15) Earthworm, (16) Hydra.	(1) Animal kingdom by charts, (2) Actual specimens of the animals mention[illegible] course content. (3) Life history of mosqu[illegible] butterfly. (4) Drowning experiments with airbreathing fishes.	Collection of animals in the field and grouping them. Culture of mosquito and butterfly.
II. Elementary idea about the habit, habitat and external features (details excluded) with a general idea about their functions, of the following :— (1) Earthworm, (2) Cockroach, (3) Prawn (including appendages), (4) Fish (any common bony fish), (5) Toad and frog, (6) Birds, (7) Guinea-pig.	Living specimens and their locomotion, mentioned in the course content. Gills of a common bony fish.	Examination and sketching of the external features of a toad and a fish.
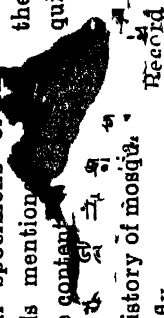
সূচীপত্র

প্রাণিবিজ্ঞান

উদ্ভিদবিজ্ঞান

"কত না অপরিচিত জীব, কত না অপরিচিত তরু……" জানা-অজানা বিচিত্র গাছ-পালা, তরুলতা-গুল্ম, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির সমাবেশে বিপুলা এ পৃথিবী প্রাণময়। এদের গঠন-বৈচিত্র্য, গতি-প্রকৃতি, স্বভাব, বাসস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক, বৃদ্ধি, বিস্তারণ প্রভৃতি ও এদের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে যে গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে তা' উদ্ঘাটন ক'রে সত্যকে আবিষ্কার করে যে বিজ্ঞান তাকেই বলে জীববিজ্ঞান বা Biology (bios=life ; logos=discourse)। সজীব পদার্থ নিয়েই এই বিজ্ঞানের কারবার। জীব-বিজ্ঞানের আবার দুটি বিভাগ—(১) **উদ্ভিদবিজ্ঞান** (Botany) ও (২) **প্রাণিবিজ্ঞান** (Zoology)।

বিভিন্ন উদ্ভিদের বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ, আবিষ্কার ও তা' নিয়ে গবেষণা করাই হচ্ছে উদ্ভিদবিজ্ঞানের কাজ। আর প্রাণিবিজ্ঞানের কাজ প্রাণিকুল সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা।

জড় ও জীব :—পূর্বেই বলা হয়েছে সজীব পদার্থ নিয়েই জীববিজ্ঞানের আলোচনা। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তো আর সজীব নয়। আমাদের চারদিকে যে বিপুল বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ তাদের সবইতো আর সজীব পদার্থ নয়—তাদের কেউবা জড়, কেউবা জীব। সুতরাং জীববিজ্ঞান পড়ার আগে জীব ও জড়ের পার্থক্য নিরূপণ অপরিহার্য্য।

জীব ও জড়ের পার্থক্য

জীব	জড়
(১) এদের দেহ জীব-পঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) দ্বারা গঠিত। প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে জীবনের পদার্থিক ভিত্তি (Physical basis of life)। এদের দেহ প্রোটোপ্লাজম নির্মিত এক বা একাধিক কোষের (cell) সমন্বয়ে গঠিত।	(১) ইট, পাথর, বালি প্রভৃতি জড় পদার্থে জীব-পঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজম থাকে না। আর এদের দেহ কোষ দ্বারাও গঠিত নয়।
(২) বহুকোষী জীব-দেহ বিভিন্ন কার্য করার জন্য কোষ (cell), অংগ (organs) ও তন্ত্রে (systems) সুসংগঠিত।	(২) এইরূপ কার্য সম্বন্ধীয় সংগঠন জড় পদার্থে নেই।

জীব	জড়
(৩) প্রতিটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর সাধারণতঃ একটি সুনির্দিষ্ট আকৃতি ও দেহায়তন আছে।	(৩) জড় পদার্থের এইরূপ কোন সুনির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন নেই।
(৪) জীবদেহে বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ গতি আছে।	(৪) সাধারণতঃ জড় পদার্থের গতি থাকে না।
(৫) জীব অনুভূতি ও সংবেদনশীল —বিভিন্ন উত্তেজনায় সাড়া দিতে সমর্থ।	(৫) বস্তুতঃ এরা কোন উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে না
(৬) পুষ্টি, শ্বাসকার্য রেচন-ক্রিয়া, নিঃসরণ-ক্রিয়া প্রভৃতি বিপাকীয় কাজ (metabolic activities) এদের দেহে দেখা যায়।	(৬) প্রোটোপ্লাজম না থাকায় এদের বিপাকীয় কাজ নেই।
(৭) জীবদেহের সমস্ত কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরিচালিত হয়।	(৭) এরা নিজে থেকে বা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করতে পারে না।
(৮) প্রোটোপ্লাজমের [illegible] ফলে এদের দেহ বৃদ্ধি পায়।	(৮) প্রস্তরাদি জড পদার্থ বাইরের বস্তুর উপলেপে বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু এই বৃদ্ধি পরিপাক ও পুষ্টির ফলে হয় না।
(৯) জীবদেহ স্পন্দনময় ও এতে উত্তেজিত্ব (irritability) আছে।	(৯) জড পদার্থ স্পন্দনহীন ও এতে উত্তেজিত্ব নেই।
(১০) জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু নিয়ে একটি জীবন-চক্র আছে।	(১০) এদের এইরূপ কোন জীবন-চক্র নেই।
(১১) বংশ বৃদ্ধি করা জীবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।	(১১) প্রকৃতপক্ষে বংশবৃদ্ধি জড় পদার্থে দেখা যায় না।
(১২) জীবের বার্ধক্য ও মৃত্যু আছে।	(১২) জড়ের জরা ও মৃত্যু নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীব যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, জড়ে তা' নেই। অতএব জড় থেকে জীবকে পৃথক করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু জীবনের লক্ষণ যাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তারা তো সবাই আর একরকম নয়—পূর্বেই তো বলা হয়েছে জীবের আবার দুটি বিভাগ—উদ্ভিদ ও প্রাণী। সুতরাং এদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পূর্বে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য ভালভাবে নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক।

প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য

প্রাণী	উদ্ভিদ
(১) সাধারণতঃ প্রাণীর দেহাকৃতি সুসমঞ্জস।	(১) সাধারণতঃ উদ্ভিদের দেহাকৃতি অসমঞ্জস।
(২) প্রাণিকোষে সুনির্দিষ্ট কোষ-প্রাচীর নেই। এইজন্য প্রোটোপ্লাজমের বাইরের দিকটি একটি পাতলা ঝিল্লিতে পরিণত হয়েছে—এই ঝিল্লিকে প্লাজমালিমা (Plasmalemma) বলে।	(২) উদ্ভিদ কোষ সাধারণতঃ অজৈব সেলুলোজ (Cellulose) নির্মিত একটি প্রাচীরে আবদ্ধ। ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের (fungi) কোষ প্রাচীর কাইটিন (Chitin) দ্বারা নির্মিত।
(৩) প্রাণিদেহে সাধারণতঃ সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল (Chlorophyll) থাকে না। কতকগুলি ক্ষেত্রে যেমন এককোষী ইউগ্লিনা (Euglena)-তে ক্লোরোপ্লাষ্টিড (Chloroplastid) দেখা যায়।	(৩) সবুজ গাছের দেহে সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল থাকে—এদের সাহায্যে এরা সূর্যকিরণের উপস্থিতিতে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্বারা শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় (Carbohydrates) খাদ্য প্রস্তুত করে।
(৪) এদের কোষাভ্যন্তরের সাইটোপ্লাজমে (Cytoplasm) খুব অল্প ও ছোট কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওল (vacuole) দেখা যায়।	(৪) উদ্ভিদ কোষে বেশী সংখ্যক কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওল দেখা যায় এবং এরা আকারেও বেশ বড় বড়।
(৫) প্রাণী-কোষে একটি বা দু'টি সেন্ট্রিওল (Centriole) সহ একটি সেন্ট্রোসোম (Centrosome) দেখা যায়। কোষ বিভাজনের সময় প্রথমেই সেন্ট্রোসোমটি দ্বিধাবিভক্ত হয়।	(৫) সাধারণতঃ উদ্ভিদ কোষে সেন্ট্রিওল ও সেন্ট্রোসোম দেখা যায় না।
(৬) প্রাণী-দেহ নানা রকম অংগ (Organs) দ্বারা সুসংগঠিত।	(৬) উদ্ভিদ দেহে অংগের এত বিভিন্নতা নেই।

প্রাণী	উদ্ভিদ
(৭) প্রাণীরা একস্থান হতে অন্যস্থানে সহজে বিচরণ করতে পারে। অল্পসংখ্যক প্রাণী যেমন স্পঞ্জ, প্রবাল, প্রভৃতি জলের তলায় অন্য বস্তুর গায়ে লেগে থাকে।	(৭) মাটির সাথে লেগে থাকায় বেশীর ভাগ উদ্ভিদই বিচরণক্ষম নয়। কিছু উদ্ভিদ জলে ভাসমান। আবার কেউ কেউ যেমন অসিলাটোরিয়া (Oscillatoria) প্রভৃতি স্বাধীনভাবে নড়া-চড়া করতে সমর্থ।
(৮) সাধারণতঃ খাদ্যের দিক থেকে এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। বেশী সংখ্যক প্রাণীই হলোজোয়িক (Holozoic) পদ্ধতিতে জৈব খাদ্য গ্রহণ করে। প্রাণীরা উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণী থেকে প্রোটিন (Protein) [illegible]ণ করে।	(৮) সাধারণতঃ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদেরা অজৈব পদার্থ থেকে নিজেরাই কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। পরে কার্বোহাইড্রেট থেকেই এরা প্রোটিন প্রস্তুত করে।
(৯) সাধারণতঃ দেহের সকল স্থান সমান ভাবে বর্ধিত হয়। বৃদ্ধির সময় নির্দিষ্ট, ক্রমশঃ বৃদ্ধির হার কমে যায় ও মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধি মোটেই হয় না।	(৯) এদের দেহের সকল স্থান সমান ভাবে বর্ধিত হয় না—বৃদ্ধির স্থান সীমিত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও এদের দেহ বৃদ্ধি পায়।
(১০) কয়েকটি যেমন ওবেলিয়া (Oblia) প্রভৃতি ছাড়া প্রাণী-দেহ শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত নয়।	(১০) সাধারণতঃ উদ্ভিদের দেহ শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত।
(১১) প্রাণীদের সাধারণতঃ মস্তিষ্কসহ একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আছে। ফলে এরা বিভিন্ন উত্তেজনায় খুব দ্রুত সাড়া দিতে পারে।	(১১) উদ্ভিদ দেহে কোন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র নেই। সুতরাং উত্তেজনায় এরা দ্রুত সাড়া দিতে পারে না।
(১২) প্রসব ক'রে, ডিম পেড়ে বা বিভাজন প্রণালীতে এরা নতুন প্রাণীর জন্ম দেয়।	(১২) সাধারণতঃ বীজ হ'তে ও বিভিন্ন ভেজিটেটিভ (Vegetative) উপায়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

উপক্রমণিকা

উদ্ভিদ নিয়েই উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany) গ'ড়ে উঠেছে। শ্যামল ধরিত্রীর বুক জানা-অজানা অসংখ্য তরু, লতা, গুল্ম ও তৃণের বিচিত্র সমাবেশে প্রাণবন্ত। এই বিচিত্র সবুজের মেলা মানুষের পরিবেশকে যেমন সুন্দর ক'রে রেখেছে, তেমনি এদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলও অসীম, দুর্নিবার। তাই মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্ভিদদের সম্বন্ধে কতই না জেনেছে—জেনেছে তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, বাসস্থান, অংগসংস্থান, গঠন-বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন জীবন-প্রক্রিয়া। আর এই সবকে মূলধন করেই তো উদ্ভিদবিজ্ঞানের সৃষ্টি। বলা অনাবশ্যক যে উদ্ভিদবিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের দু'টি শাখার অন্যতম।

মানুষের সংগে উদ্ভিদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শুধু মানুষ কেন, সমস্ত প্রাণিকুলই খাদ্যের দিক থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের ওপর নিভরশীল। একমাত্র উদ্ভিদেরাই বায়ু, জল ও মাটি থেকে প্রয়োজনীয় অজৈব পদার্থ গ্রহণ ক'রে জটিল জৈব খাদ্য গঠন করে। আর উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই গ্রহণ করে এই খাদ্য। আবার আমাদের বাড়ী-ঘরের জানালা-কপাট চেয়ার-টেবিল, খাট-পালঙ্ক প্রভৃতি সবই তো বৃক্ষ-কাষ্ঠ নির্মিত। এমন কি, আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও আমরা উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ। কিন্তু এই যান্ত্রিক যুগের কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ যেমন কয়লা, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি তো যুগাতীত কালের উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকেই গঠিত হয়েছে। তারপর ঔষধ-পথ্যাদি হিসাবে উদ্ভিদের সফল ব্যবহার আজ আর কারো অজানা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মানব গোষ্ঠীর সংগে উদ্ভিদরাজির সম্পর্ক সুনিবিড়। সুতরাং উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের অপরিসীম আগ্রহ ও কৌতূহল একান্ত স্বাভাবিক।

উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা :—(১) বহির্গঠন সম্বন্ধে আলোচনা বা মর্ফোলজি (Morphology)।

(২) অন্তর্গঠন সম্বন্ধে আলোচনা বা শারীর সংস্থানবিদ্যা (Anatomy or internal morphology)। —কোষসম্বন্ধীয় অংশ বা সাইটোলজি (Cytology) ও সাধারণ আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধীয় অংশ বা হিষ্টোলজি (Histology) এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) উদ্ভিদের শারীর বৃত্ত (Plant Physiology) বা দেহের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা।

(৪) পরিবেশের সংগে উদ্ভিদের সম্পর্কের আলোচনা বা উদ্ভিদের বাস্তু-সংস্থানবিদ্যা (Ecology)।

(৫) উদ্ভিদের নামকরণ ও শ্রেণী বিভাগের বিদ্যা বা সিষ্টেমেটিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান (Systematic Botany)।

১

উদ্ভিদের জীবন-বৈচিত্র্য

(Diversity of life in Plants)

পৃথিবীর পরিবর্তনশীল ত্বকের ওপর প্রতিনিয়ত নানানরূপের খেলা চলছে। কখনো নদী তার গতি-পথ পরিবর্তন ক'রে বিশাল বনভূমিকে ঊষর মরুভূমিতে পরিণত করছে। আবার কখনো নদী তার চলার পথে শুষ্ক মাটিকে উর্বর ক'রে শস্য-শ্যামল ক'রে তুলছে। এইরূপ আরও নানাবিধ কারণে পৃথিবীর জলবায়ু-আবহাওয়ার যেমন পরিবর্তন হচ্ছে, সেইরূপ জীবজগৎও এই পরিবর্তনের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য নিজেরাও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের (mutation) ফলে ধীরে ধীরে পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য রেখে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন উদ্ভিদ ও প্রাণী।

উদ্ভিদের স্বভাব ও বাসস্থান : ভূমির ওপর বিস্তারণ

(Habit and habitat of Plants : Distribution on Earth)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জলবায়ুর জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে। কতকগুলি উদ্ভিদ পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়, কতকগুলি আবার সমতল ভূমিতে জন্মায়। আর কতকগুলি জলে বা মরুভূমিতে জন্মায়। সেইজন্য এক স্থানের উদ্ভিদের গঠন আর এক স্থানের উদ্ভিদের গঠন অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। এইজন্য উদ্ভিদবিদ্‌গণ বাস্তসংস্থান (Ecology) অনুসারে উদ্ভিদকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(ক) **জলজ উদ্ভিদ** (Hydrophyte : Hydro = water ; Phyton = Plant) ও (খ) **স্থলজ উদ্ভিদ** (Geophyte : Geo = Earth)।

জলজ উদ্ভিদ :

(Hydrophyte)

এরা সাধারণতঃ নরম ও মূলহীন হয়। কখনো কখনো আবার কম পরিমাণ মূল দেখা যায়। (১) ঝাঁঝি (Bladderworts), সিঙ্কুকানি পানা (Salvinia) প্রভৃতি উদ্ভিদ মূলহীন। পদ্ম, শালুক, কেশরদাম প্রভৃতি উদ্ভিদেরা সারা দেহ দিয়ে জল শোষণ করে। (২) শালুক ও খুদিপানার যদিও মূল আছে তথাপি এরা মূলরোম বিহীন। (৩) বড় পানার মূলরোম যদিও আছে তবুও এদের মূলে মূলত্র (root cap) নেই। জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড খুব নরম হয় এবং কাণ্ডের মধ্যে বহু বাতবকাশ (air space) থাকে। ফলে এরা বেশ জলে ভেসে থাকতে পারে। জলজ উদ্ভিদের সাধারণতঃ উজ্জ্বল রঙের ফুল ফোটে এবং পাতাগুলি বড় ও গোলাকার হয়। জলের ভেতরের পাতাগুলি সরু সরু হয় অথবা বিভক্ত হয়ে সরু সরু আকার ধারণ করে। ফলে জলের স্রোত কম ব্যাহত হয়। জলজ উদ্ভিদের ফল ও

বীজসমূহ বাতবকাশ এবং নানা প্রকার কৌশল (mechanisms) যুক্ত, ফলে জলের দ্বারা এদের বিস্তারণ (Dispersal) সম্ভব হয়।
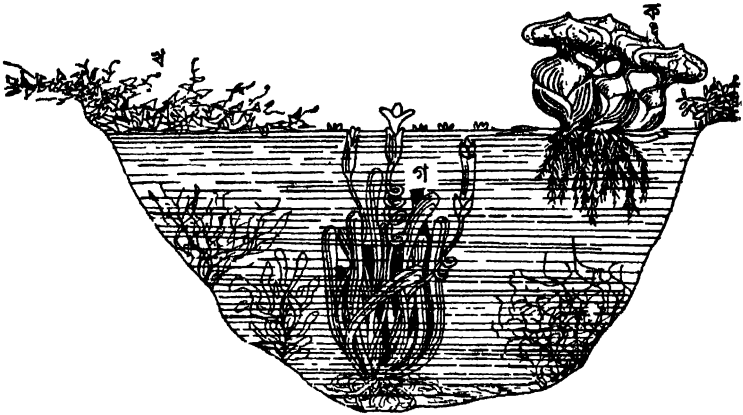
জলজ উদ্ভিদ—(ক) ভাসমান উদ্ভিদ—বড পানা ; (গ) উভচর উদ্ভিদ—কলমী শাক ; (গ) জলমগ্ন উদ্ভিদ—ভ্যালিসনারিয়া (পাতা শ্যাওলা)

জল ও বায়ুর সাথে এদের সম্পর্ক অনুযায়ী জলজ উদ্ভিদকে আবার নিম্নলিখিত তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(১) **ভাসমান উদ্ভিদ (Floating Plants)** :—এদের কেউ কেউ জলের ওপর স্বাধীন অবস্থায় ভাসমান আবার কারো কারো মূল মাটির নীচে প্রোথিত কিন্তু পাতা ও ফুল ভাসমান। যেমন—বড় পানা, কচুরীপানা, খুদি-পানা, জলপদ্ম, শালুক ইত্যাদি।
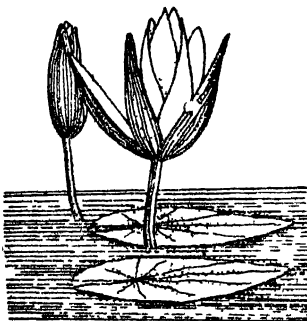
ভাসমান জলজ উদ্ভিদ—শালুক

(২) **জলমগ্ন উদ্ভিদ (Submerged plants)** :—এদের মূল সাধারণতঃ মাটির ভেতর প্রোথিত থাকে ও বাকী অংশ জলের নীচে নিমগ্ন থাকে। যেমন—পাতা ঝাঁঝি, ভ্যালিস-নারিয়া (vallisneria), কারা (chara) ইত্যাদি। এদের পাতাগুলি সরু সরু ও ছোট ছোট হয়।

(৩) **উভচর উদ্ভিদ** (**Amphibious Plants**) :—পুকুর, ডোবা বা নদীর ধারে এদের দেখা যায়। সাধারণতঃ এদের মূল ও কাণ্ডের কিছু অংশ জলের নীচে নিমগ্ন থাকে। আর বাকী অংশ ডাঙার ওপর উঠে এসে বায়বীয় শাখা-পল্লব ধারণ করে। জল শুকিয়ে গেলে এরা কিছুদিনের জন্য সাধারণ উদ্ভিদের (Mesophyte) মত জীবনধারণ করে। যেমন,—পানিমরিচ, হিঙচে, কচু, কলমীশাক, ব্রাহ্মীশাক ইত্যাদি।

স্থলজ উদ্ভিদ :

(Geophytes or Terrestrial Plants)

স্থলজ উদ্ভিদ সাধারণতঃ পাচ প্রকার—

(১) **আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদ** (**Marsh plants or Hygrophytes, Hygro = moisture**) :—ডোবা, পুকুর, খালবিল প্রভৃতির সন্নিকটে স্যাঁতসেঁতে জায়গায এই জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায। হোগলা, শোলা, পদ্ম, কেয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের বৈশিষ্টা স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদের মধ্যবর্তী। এদের মূলগুলি কাদায় আবদ্ধ থাকে। কখনো কখনো কাণ্ডের কিছু অংশ জলের মধ্যে ডুবে থাকে।

কেয়াগাছ

(২) **ট্রোপোফাইট** (**Tropophyte : Tropo = tropical**) :—ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে এই জাতীয় উদ্ভিদসমূহের বৈশিষ্ট্যেব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে এদের পত্ররাজি ঝ'রে পড়ে এবং তখন এদের দেহে জাঙ্গল শ্রেণীর উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বৎসরের বাকী সময়ে এদেরকে সাধারণ উদ্ভিদের মত দেখায়। যেমন,—শিমুল, বেল, শাল ইত্যাদি।

ফণিমনসা

(৩) **জাঙ্গল উদ্ভিদ** (**Xerophyte : Xero = drought**) :—যে সকল মৃত্তিকা সাধারণতঃ শুষ্ক, বালুকাময় ও লবণাক্ত সেই সমস্ত স্থানে এই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। মরু অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলের উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল

উদ্ভিদ সাধারণতঃ বেশী বড় হয় না, কাণ্ড বেশ স্থূল হয় এবং পাতাগুলি কণ্টকে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। এদের মূলগুলি খুব শক্ত ও দীর্ঘ হয় এবং মাটির বহু নিম্নে চলে যায়। ফণিমনসা, ঘৃতকুমারী, বাবলা, হুরহুরে প্রভৃতি জাঙ্গল উদ্ভিদের উদাহরণ।

(৪) **সাধারণ উদ্ভিদ** (Mesophyte : Meso = medium):—যে সব স্থানে মৃত্তিকার জল সাধাবণভাবে থাকে অর্থাৎ খুব বেশীও নয় আবার খুব কমও নয় সেইসব স্থানে এই শ্রেণীর উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর গাছ খুব লম্বা ও প্রচুর শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়। আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদ্ভিদ।

আমগাছ

(৫) **সমুদ্রোপকূলবর্তী উদ্ভিদ** (Halophytes):—এই শ্রেণীর উদ্ভিদ সাধারণতঃ লবণাক্ত মৃত্তিকায় জন্মায়। মাটির জলে লবণ বেশী থাকায় এরা অস্মোসিস (Osmosis) বা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটি হতে জল শোষণ করতে পারে না। তাই মাটির ভেতর অনুভূমিকভাবে অবস্থিত মূল হতে কতকগুলি খাড়া খাড়া মূল মাটি ভেদ ক'রে সোজা উপরে উঠে আসে। এই খাড়া মূলগুলি ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় বায়ু হতে সহজেই অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে। এই ছিদ্রযুক্ত মূল-গুলিকে **শ্বাসমূল** বা **নিউমাটোফোর** (Pneumatophore) বলে। এদের ফলগুলি পেকে মাটিতে না প'ড়ে গাছের শাখায় সংযুক্ত থাকে এবং সেই অবস্থাতেই এদের বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এইরূপ অঙ্কুরোদ্গমকে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম** (Viviparous germination) বলে।
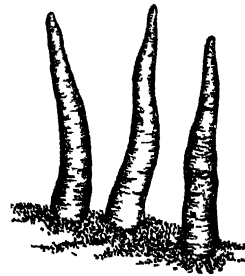
সুঁদরী গাছের মূল

সুঁদরী, গরাণ, বাণা প্রভৃতি এই শ্রেণীর গাছ। সাধারণতঃ নদীর মোহনার কাছাকাছি জায়গায় এই সকল উদ্ভিদরা একপ্রকার অরণ্যের সৃষ্টি করে;

সেই অরণ্যকে ম্যানগ্রোভ অরণ্য (Mangrove forest) বলে। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ অরণ্য দেখা যায়।

বাস্তুসংস্থান-অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের ছক
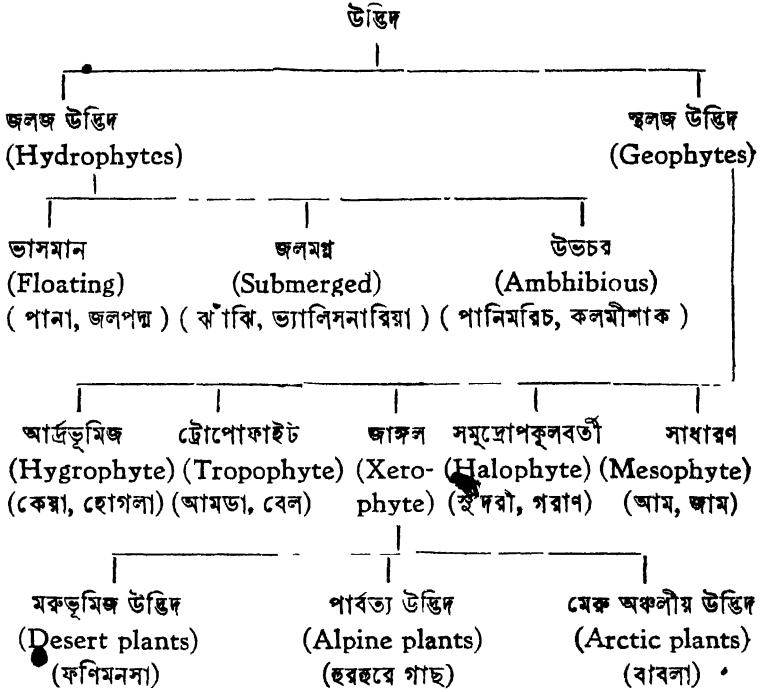
জৈব অভিব্যক্তি ক্রমানুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Plants according to Organic Evolution)

সাধারণতঃ উদ্ভিদ বলতে আমরা এই বুঝি যে, উদ্ভিদের দেহে মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে এবং পরিণত বয়সে ফুল ও ফল হয় এবং ফলের বীজ হতে নতুন গাছের জন্ম হয়। কিন্তু এই বিরাট পৃথিবীতে এমন অনেক গাছ আছে যাদের ফুল বা ফল মোটেই হয় না; এমন কি, দেহে মূল, কাণ্ড বা পাতাও থাকে না। তথাপি এরা নানান উপায়ে জননকার্য সম্পাদন ক'রে বংশবৃদ্ধি করে। এরাই আদিম বা নিম্নস্তরের উদ্ভিদ। জৈব বিবর্তনের (Organic evolution) ফলে এই সমস্ত উদ্ভিদ থেকেই ফুল, ফল ও বীজ সমন্বিত

উচ্চস্তরের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদবিদ্‌গণ তাই ক্রমবিবর্তন অনুসারে উদ্ভিদজগৎকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করেছেন : (ক) **অপুষ্পক উদ্ভিদ** (Cryptogams or Non-flowering Plants) ও (খ) **সপুষ্পক উদ্ভিদ** (Phanerogams or Flowering Plants)।

অপুষ্পক উদ্ভিদ :

(Cryptogams : Cryptos = hidden, Gamos = marriage)

যে উদ্ভিদের ফুল, ফল ও বীজ হয় না, তাদেরকে অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। অপুষ্পক উদ্ভিদ আবার তিন প্রকারের—

১। **সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ বা থ্যালোফাইটা** (Thallophyta) :—এই উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নয়। এই প্রকার মূল, কাণ্ড ও পাতাহীন উদ্ভিদ-দেহকে **থ্যালাস** (thallus) বলে। এই জাতীয় উদ্ভিদ সাধারণতঃ ভেজা জায়গায় বা জলীয় পরিবেশে জন্মায়। এরা আবার দুই প্রকার—

(ক) **শৈবাল বা অ্যালজী** (Algae) :—এদেরকে সাধারণ কথায় শ্যাওলা বলে। শৈবাল সাধারণতঃ সবুজ রঙের হয়। এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকায় এরা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরী করতে পারে। পচা জল, পুকুর, ডোবা প্রভৃতি জায়গায় এরা জন্মায়। এছাড়া যে কোন স্যাঁৎসেঁতে ভিজে মাটিতে শ্যাওলা হয়। স্পাইরোগাইরা (Spirogyra), ইউলোথ্রিক্স (Ulothrix), ইডোগোনিয়াম (Oedogonium), ভাউচেরিয়া (Vaucheria), নস্টক (Nostoc) প্রভৃতি উদ্ভিদ এই শ্রেণীর উদাহরণ।
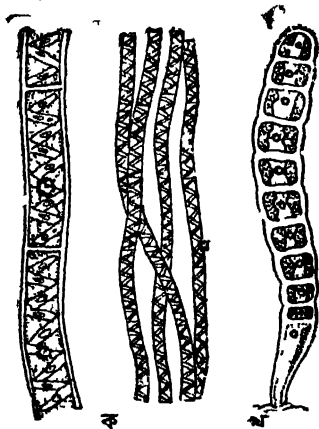
শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ—
(ক) স্পাইরোগাইরা (খ) ইউলোথ্রিক্স

(খ) **ছত্রাক বা ফানজাই** (Fungi) :—এই প্রকার সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না। ফলে এরা বর্ণহীন ও নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না। এইজন্য এরা পরভোজী। সাধারণতঃ এরা পচা

রুটি, ফল চামড়া বা কাঠের ওপর জন্মায়। বর্ষাকালে এদের বেশী দেখা যায়। ব্যাঙের ছাতা (Agaricus), মিউকর (Mucor), পেজাইজা
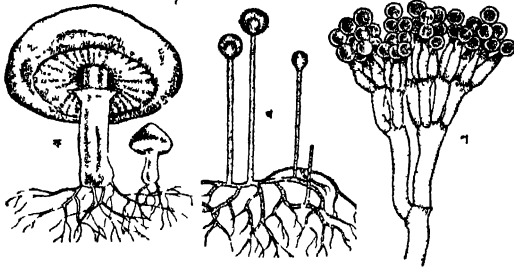
ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ—(ক) ব্যাঙের ছাতা, (খ) মিউকর, (গ) পেনিসিলিয়াম

(Peziza), পেনিসিলিয়াম (Penicilium) প্রভৃতি এই জাতীয় উদ্ভিদ। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধ এই জাতীয় উদ্ভিদ হতেই তৈরী হয়।

২। **মসজাতীয় উদ্ভিদ বা ব্রায়োফাইটা (Bryophyta)** :—সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের পরেই এদের স্থান। এদের দেহ কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। কিন্তু এদের কোন মূল নেই। মূলের পরিবর্তে কাণ্ডের নীচে কতকগুলি এককোষী রোম দেখা যায়—এইগুলিকে **রাইজয়েড** (Rhizoid) বলে। এরা মূলের ন্যায় শোষণ কার্য করে। এই জাতীয় উদ্ভিদ স্থলজ ও আর্দ্রস্থানে জন্মায়। রিক্সিয়া (Riccia), মারকেন্সিয়া (Marchantia), অ্যানথোসেরস (Anthoceros), মস (Moss) প্রভৃতি উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

মস

৩। **ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ বা টেরিডোফাইটা (Pteridophyta)** :—এরা মস অপেক্ষা উন্নত। এদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। ভেজা বা স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে এরা জন্মায়। সেলাজিনেলা (Selaginella),

ইকুইজিটাম (Equisetum), সেরাটপ্‌টেরিস (Ceratopteris), লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium) প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ—(ক) ফার্ণ, (খ) ইকুইজিটাম, (গ) লাইকোপোডিয়াম

সপুষ্পক উদ্ভিদ ঃ

(Phanerogams ; Phaneros = evident)

যে সমস্ত উদ্ভিদে ফুল ও বীজ হয়, তাদেরকে সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। সপুষ্পক উদ্ভিদ আবার দুই প্রকার—

(ক) পাইন, (খ) পাইন গাছের বীজ, (গ) ঝাউ

১। **ব্যক্তবীজী** (Gymnosperms) :—এই সব উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এই যে এদের কোন ফল না হওয়ায় এদের বীজগুলি অনাবৃত অবস্থায় থাকে। পাইন (Pine), ঝাউ (Cycas) প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদ্ভিদ।

২। **গুপ্তবীজী** (Angiosperms) :—এই সকল উদ্ভিদের ফল হয়। সুতরাং এদের বীজ ফলের ভেতর আবৃত অবস্থায় থাকে। গুপ্তবীজী আবার দু'রমের—

(ক) **একবীজপত্রী** (Monocotyledons) :—একবীজী উদ্ভিদগুলির বীজে একটি ক'রে বীজপত্র (Cotyledon) থাকে। যথা—নারকেল, কলা, সুপুরি, ভুট্টা, ধান, কচু ইত্যাদি।

একবীজপত্রী—ধানগাছ   দ্বিবীজপত্রী—মটর গাছ

(খ) **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledons) :—এই উদ্ভিদগুলির বীজে দু'টি করে বীজপত্র থাকে। যেমন—আম, কাঁঠাল, ছোলা, তেঁতুল, মটর ইত্যাদি।

অভিব্যক্তিক্রমানুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের ছক
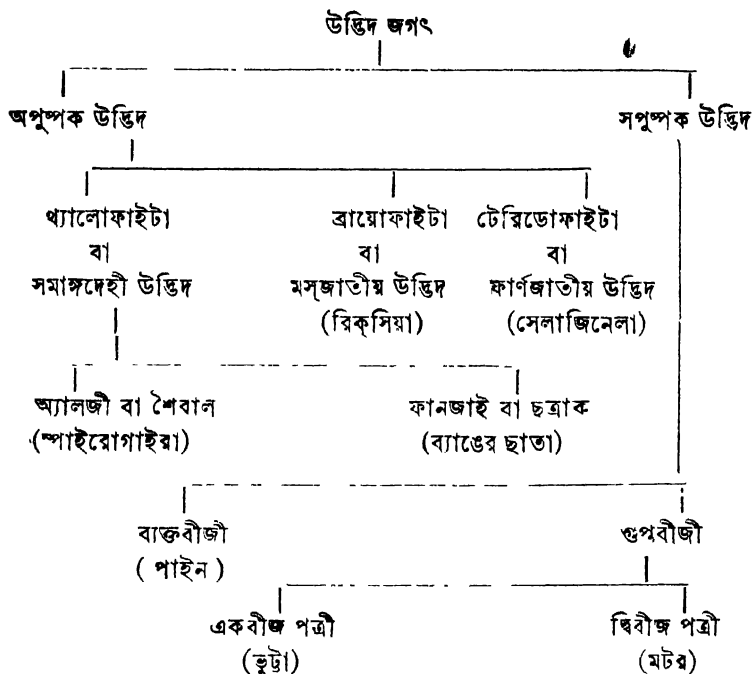
পরিপোষণ পদ্ধতি অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ

(Classification of Plants according to their modes of nutrition)

জীবনধারণের জন্য পুষ্টি অপরিহার্য। উদ্ভিদের মধ্যে যেমন প্রকারভেদ আছে, ঠিক তেমনি তাদের পরিপোষণের পদ্ধতিও বিভিন্ন। খাদ্যের দিক থেকে কেউবা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল আবার কেউবা অন্যের কাছ থেকে বা অন্যান্য উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। তাই উদ্ভিদবিদ্‌গণ এদের পরিপোষণের পদ্ধতি অনুসারে উদ্ভিদকে প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন—(ক) **স্বভোজী উদ্ভিদ** (**Autophytes**) ও (খ) **পরভোজী উদ্ভিদ** (**Heterophytes**)।

স্বভোজী উদ্ভিদ :

(Autophytes : Auto = self, Phyton = a plant)

এই সকল উদ্ভিদের দেহে ও পাতায় প্রচুর সবুজকণা বা ক্লোরোফিল থাকায় এরা তার সাহায্যে ও সূর্যকিরণের উপস্থিতিতে মাটি ও বায়ু থেকে গৃহীত যথাক্রমে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড হতে শর্করা ও শ্বেতসার (Carbohydrates) জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। বলা প্রয়োজন যে, জল মূলরোম দ্বারা সাধারণতঃ শোষিত হয়ে কাণ্ডের ভেতর দিয়ে পাতায় পৌছায় ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পত্ররন্ধ্রের ভেতর দিয়ে পাতায় প্রবেশ করে। খাদ্য গঠনের এই প্রক্রিয়াকে **অঙ্গার আত্তীকরণ** (Carbon assimilation) বা **সালোকসংশ্লেষপ্রক্রিয়া** (Photosynthesis) বলে। সুতরাং খাদ্যের দিক থেকে এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন। আম, কাঁঠাল, নারকেল, তাল, শ্যাওলা, ঘাস প্রভৃতি সবুজ পাতাবিশিষ্ট উদ্ভিদ স্বভোজী উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত।

পরাশ্রয়ী উদ্ভিদও (Epiphytes) এই জাতীয় উদ্ভিদ। এরা যদিও অন্য গাছের ওপর বাস করে, তথাপি খাদ্যের জন্য আশ্রয়দাতা গাছের ওপর নির্ভর করে না। এরা বাতাস হতে বায়বীয় মূলের (aerial roots) সাহায্যে জলীয় বাষ্প শোষণ করে ও পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে পূর্বোক্ত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করে। রাস্না প্রভৃতি অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদ (Orchid) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের উদাহরণ।

পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ—অর্কিড (রাস্না)

পরভোজী উদ্ভিদ :

(Heterophytes : Heteros = other)

এই সকল উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল না থাকায় এরা নিজেরা কখনোই খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। তাই খাদ্যের দিক থেকে এরা পরনির্ভরশীল। এদের পরিপোষণের পদ্ধতি অনুসারে এদেরকে আবার চারভাগে ভাগ করা যায়—

১। **পরজীবী** (Parasites):—এই সকল উদ্ভিদেরা অপর উদ্ভিদের গায়ে জন্মায় ও প্রচুর অস্থানিক মূল (Adventitious roots) পোষক উদ্ভিদের (Host plant) দেহে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেখান থেকে খাদ্যরস শোষণ ক'রে বেঁচে থাকে। এই প্রকার অস্থানিক মূলগুলিকে চোষক মূল (Haustoria) বলে। আলোকলতা, স্বর্ণলতা প্রভৃতি পরজীবী উদ্ভিদ
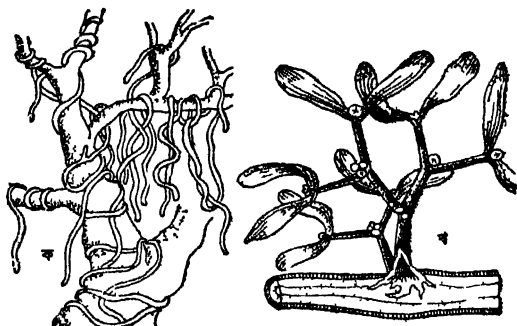
পরজীবী উদ্ভিদ—(ক) পূর্ণ পরজীবী—স্বর্ণলতা, (খ) আংশিক পরজীবী—বানডা

নিজেরা বিন্দুমাত্র খাদ্য নিজে থেকে প্রস্তুত করতে পারে না, তাই এরা পূর্ণ পরজীবী (Total parasite)। পরজীবীরা যখন নিজেরা কিয়দংশ খাদ্য প্রস্তুত করে তখন তাদেরকে আংশিক পরজীবী (Partial parasite) বলে। যথা—চন্দন, বানডা ইত্যাদি।

২। **মৃতজীবী** (Saprophytes):—এই সকল উদ্ভিদ অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত ও গলিত দেহ বা দেহাংশের ওপর বা অন্য কোন পচা জৈব পদার্থের ওপর জন্মায় ও সমস্ত দেহ দিয়ে খাদ্যরস শোষণ করে। যেমন—ব্যাঙের ছাতা, মিউকর প্রভৃতি ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ।

মৃতজীবীরা আবার দু' রকমের—পূর্ণ মৃতজীবী (Total saprophytes) ও আংশিক মৃতজীবী (Partial saprophytes)। পূর্ণ মৃতজীবীরা খাদ্যের জন্য গলিত বা পচা জৈব পদার্থের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যথা—ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। আর আংশিক মৃতজীবীরা পুরোপুরি গলিত জৈব পদার্থের ওপর নির্ভর না ক'রে নিজেরাও কিছু কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে। যথা—মোনোট্রোপা (Monotropa)।

৩। **অনন্যজীবী বা মিথোজীবী** (Symbionts) :—অনন্যজীবীত্বও (Symbiosis) পরজীবীত্বের (Parasitism) মত দুইটি জীবের সহবাস বোঝায়। শুধু তফাৎ এই যে পরজীবীত্বে একটি জীব অন্যটির ক্ষতিসাধন ক'রে উপকৃত হয়, কিন্তু অনন্যজীবীত্বে উভয় জীবই পারস্পরিক সাহচর্যের ভিত্তিতে জীবন-ধারণ করে। উদ্ভিদদের মধ্যে লাইকেন (Lichen) উল্লেখযোগ্য অনন্যজীবী (Symbiont)।
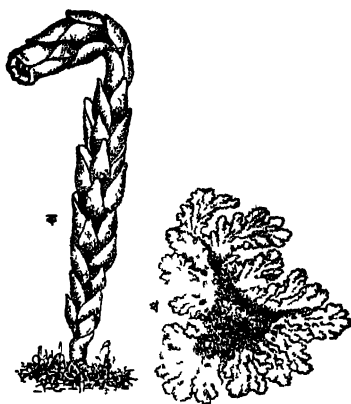
(ক) আংশিক মৃতজীবী—মোনোট্রোপা,
(খ) মিথোজীবী—লাইকেন

৪। **পতঙ্গভুক** (Insectivorous) :—এরা বিরুৎ বা ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। অনেক সময় রোহিণী হয়। এরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরী করতে পারে। কিন্তু এরা যে সমস্ত পরিবেশে জন্মায় সেই পরিবেশের মাটিতে নাইট্রোজেনের বড় অভাব। কিন্তু নাইট্রোজেন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গঠনের একটি মূল উপাদান। তাই এই ধরনের উদ্ভিদেরা বিভিন্ন ধরনের ফাঁদের সাহায্যে নানা প্রকার নিম্নশ্রেণীর কীট ও পতঙ্গ ধ'রে তাদের দেহ হতে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। কয়েকটি পতঙ্গভুক উদ্ভিদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল—

(ক) **কলসপত্রী** (Pitcher plants or Nepenthes) :—এই জাতীয় উদ্ভিদের পাতার অগ্রভাগ একটি কলসে রূপান্তরিত হয় ও কলসের মুখে একধারে একটি উজ্জ্বল লাল রঙের ঢাকনা থাকে। যখন কীট-পতঙ্গ এই লাল রঙের আকর্ষণে ঢাকনাটিতে এসে বসে তখন কলসের অভ্যন্তরস্থ শর্করা জাতীয় রসের লোভে এরা এর ভেতর প্রবেশ করে। শর্করাজাতীয় রসের দ্বারা পতঙ্গগুলির পাখা, পদ প্রভৃতি আবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এরা আর কলস হতে বের হয়ে আসতে পারে না। কলসের মধ্যে জারক রসও (enzyme juice) থাকে সুতরাং পতঙ্গগুলিকে পরিপাক ক'রে শোষণগ্রন্থি (absorptive glands) দ্বারা পতঙ্গের দেহের রস শোষণ করা হয়। কলসপত্রী উদ্ভিদ

ভারতবর্ষে খুব বেশী নেই। আসামের খাসিয়া, জয়ন্তীয়া ও গারো পাহাড়ে কিছু কিছু এদের দেখা যায়।
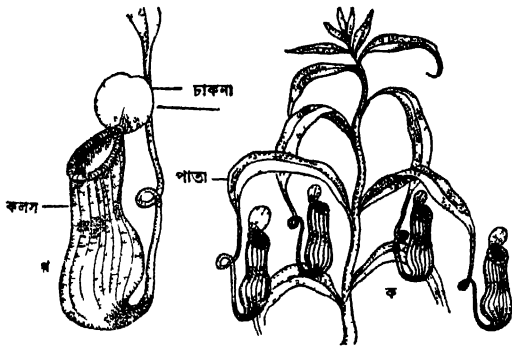
কলসপত্রী উদ্ভিদ—(খ) একটি পাতা, (ক) উদ্ভিদ

(খ) সূর্যশিশির (Drosera or Sundew):—এই উদ্ভিদের পাতার উপরিভাগের পরিধিতে ছোট ছোট সংকোচী শুঁয়া (tentacles) থাকে। শুঙ্গের অগ্রভাগে ফোঁটা ফোঁটা গ্রন্থিরস নির্গত হয়। ঐ রসবিন্দুর ওপর সূর্য-রশ্মি পতিত হলে ওগুলো জল জল করে। এইজন্য এদের সূর্যশিশির বলে।
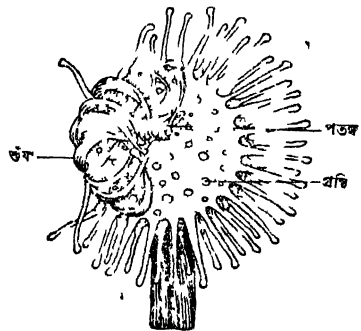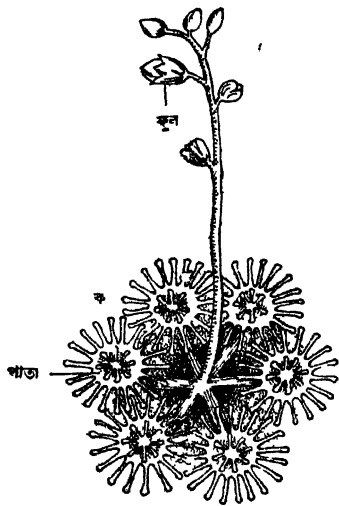
সূর্যশিশির—(ক) উদ্ভিদ, (খ) একটি পাতা

যখনই কীট বা পতঙ্গ ঐ রসবিন্দুকে মধু ভ্রমে তার ওপর বসে, তখনই ঐ রসে প্রাণীটি আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শুঁয়াগুলি বেঁকে গিয়ে কীটকে পাতার

ওপর চেপে ধরে এবং পাতায় জারকগ্রন্থি ও শোষণগ্রন্থি থাকায় অন্যান্য পতঙ্গ-ভুক উদ্ভিদের মত তার দেহের রস পরিপাক ও শোষণ করে।

(গ) পাতা ঝাঁঝি (Bladder-wort or Utricularia) :—এরা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ। এদের পাতার কিছু অংশ রূপান্তরিত হ'য়ে ছোট ছোট থলিতে পরিণত হয়। থলিগুলিতে অন্তর্মুক্ত ফাঁদি দুয়ার (Trap door) থাকে। কীট-পতঙ্গ থলির মধ্যে একবার প্রবেশ করলে দুয়ার ঠেলে আর বের হ'তে পারে না। তারপর এই উদ্ভিদরা বিভিন্ন গ্রন্থি দিয়ে কীট-পতঙ্গদের দেহের রস পরিপাক ও শোষণ করে।

পাতা ঝাঁঝি—(ক) উদ্ভিদ, (খ) একটি থলির আকৃতি
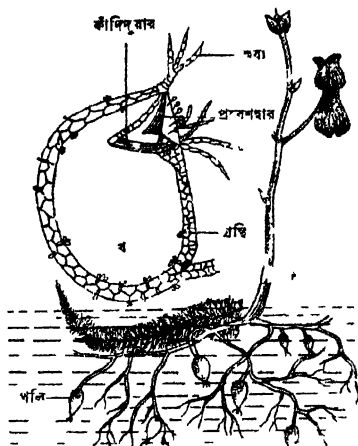
(ঘ) অ্যালড্রোভানডা (Aldrovanda) :—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এরা জন্মায়। আমাদের দেশের সুন্দরবনাঞ্চলের ও দক্ষিণ কলকাতার ডোবা, নালা, খাল-বিল প্রভৃতিতে এদের দেখা যায়। এরা মূলহীন ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। এদের গোলাকার পাতার ওপরে প্রচুর সংবেদনশীল শুঁয়া আছে। পাতার ওপরের ত্বকে শর্করা জাতীয় রস নিঃসৃত হওয়ায় এর লোভে কীট-পতঙ্গরা এসে পাতার ওপর বসে ও রসে এদের পা ও পাখা আটকে যায়। তখন মধ্যশিরাকে মাঝখানে রেখে পত্রফলকটি আপনা আপনি ধীরে ধীরে দু'দিক থেকে ভাজ হয়ে যায়। পত্রত্বকে জারক গ্রন্থি ও শোষণগ্রন্থি থাকায় পতঙ্গগুলিকে এরা সহজেই হজম ও শোষণ করতে পারে।
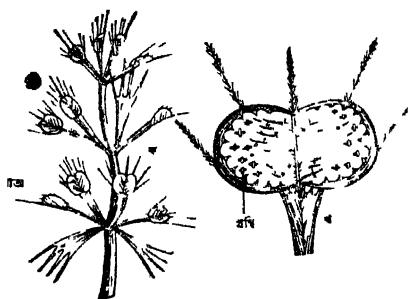
অ্যালড্রোভানডা—(ক) উদ্ভিদ; (খ) একটি পাতা

(ঙ) ডায়োনিয়া (Dionaea):—একে 'ভেনাসের মক্ষি ফাঁদ'-ও (Venus's fly-trap) বলে। এই প্রকার উদ্ভিদের পত্রফলকের প্রান্ত দাঁতালো ও পত্রফলকের প্রতি অর্ধের ওপর তিনটি ক'রে শুঁয়া থাকে। শুঁয়াগুলি খুব সংবেদী এবং যখনই পত্রত্বকের ওপর কীট-পতঙ্গ এসে বসে তখনই মধ্যশিরাকে মাঝখানে রেখে পত্রফলকের অর্ধদ্বয় বুজে যায়। তারপর পত্রত্বকস্থিত জারক গ্রন্থি ও শোষণগ্রন্থি পতঙ্গগুলিকে হজম ও শোষণ করে।

পরিপোষণ পদ্ধতি অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের ছক
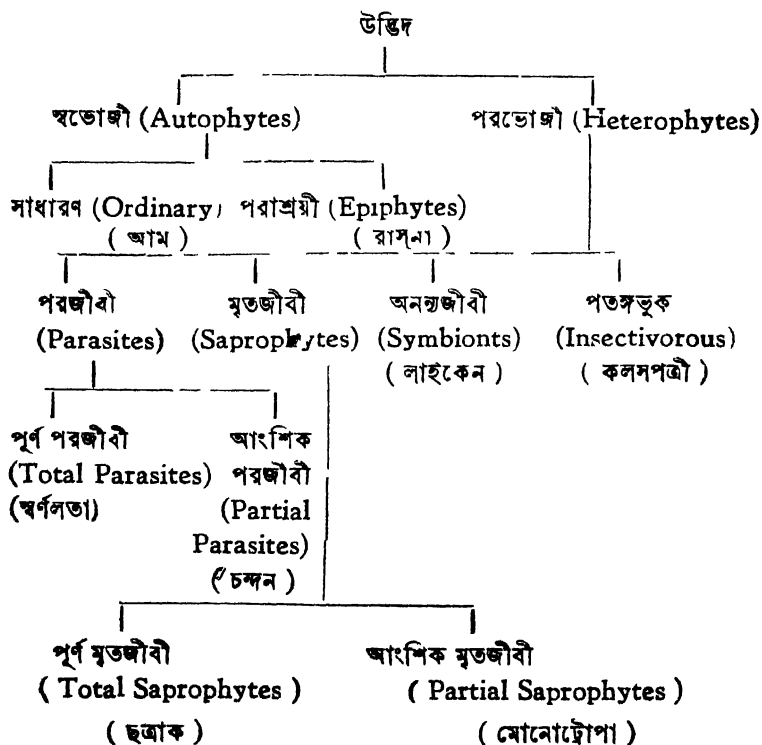
কাণ্ড—সবল ও দুর্বল

(Stem—Erect and Weak)

ভ্রূণ-মুকুল বড় হ'য়ে গাছের বিটপ (shoot) অংশের সৃষ্টি করে। বিটপ মাটির ওপরে থাকে ও আলোকমুখী হয়। বিটপের প্রধান অংশই হল কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখা। কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখা বিটপের অন্যান্য অংশ যেমন

মুকুল, পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। প্রতিটি কাণ্ড গাঁটে গাঁটে বিভক্ত থাকে। গাঁটগুলিকে বলে পর্ব (Nodes); আর দু'টো গাঁটের মাঝখানের অংশকে বলে পর্বমধ্য (internodes)। কোন কোন গাছের কাণ্ড মাটির নীচে গুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং শুধু পাতাগুলি গুচ্ছাকারে মাটির ওপর শোভা পায়। কেবল ফুল ফোটার সময় একটি পুষ্পদণ্ড মাটি হ'তে ওপরে উঠে আসে। এই পুষ্পদণ্ডটিকে ভৌম পুষ্পদণ্ড (Scape) বলে। যেমন—রজনীগন্ধা।

কাণ্ড প্রধানতঃ দু'রকমের: (১) সবল কাণ্ড ও (২) দুর্বল কাণ্ড।

সবল কাণ্ড ও তার প্রকার ভেদ:
(Erect Stem and its Kinds)

যে সব কাণ্ড মাটির ওপর খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে, তাদেরকে সবল কাণ্ড বলে। সবল কাণ্ড মোট চার রকমের হয়—

১। **এক্সকারেণ্ট** (Excurrent):—এই কাণ্ড শাখা-প্রশাখা যুক্ত ও শাখা-প্রশাখাগুলি অনিয়ত পদ্ধতি (Racemose branching) অনুযায়ী উৎপন্ন

(ক) এক্সকারেণ্ট—দেবদারু, (খ) ডেলিকুইসেণ্ট—বট; (গ) কডেক্স—নারকেল

হয়। আর প্রধান কাণ্ডটি শাখা-প্রশাখার চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে উদ্ভিদটিকে দেখতে প্রায় পিরামিডের মত। যেমন—দেবদারু, ঝাউ, ইউক্যালিপ্‌টাস ইত্যাদি।

২। **ডেলিকুইসেণ্ট** (Deliquescent) :—এই প্রকার কাণ্ডও শাখা-প্রশাখাযুক্ত ও শাখা-প্রশাখাগুলি নিয়ত পদ্ধতি (Cymose branching)

অনুযায়ী উৎপন্ন হয়। আর প্রধান শাখার চেয়ে শাখা-প্রশাখাগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে উদ্ভিদটিকে দেখতে প্রায় গম্বুজের মত হয়। যেমন—আম, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি।

তৃণকাণ্ড—বাঁশ

৩। কডেক্স (Caudex):—এইরূপ কাণ্ড সোজা, খাড়া ও শাখা-প্রশাখা বিহীন এবং কাণ্ডের শীর্ষে পত্রমুকুট শোভিত থাকে। যেমন—খেজুর, নারকেল, তাল, সুপুরী ইত্যাদি।

৪। তৃণকাণ্ড বা কালম্ (Culm):—এইরূপ কাণ্ডগুলি শাখা-প্রশাখা যুক্ত বটে, কিন্তু কেবল পর্বগুলি ভরাট থাকে, আর পর্বমধ্যগুলি থাকে ফাঁপা। যেমন—বাঁশ।

দুর্বল কাণ্ড ও তার প্রকার ভেদ:
(Weak Stem and its Kinds)

কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড দুর্বল হওয়ায় এরা মাটির ওপর সোজা ও খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে না। এই সকল উদ্ভিদ মাটির ওপর লতাইয়া চলে
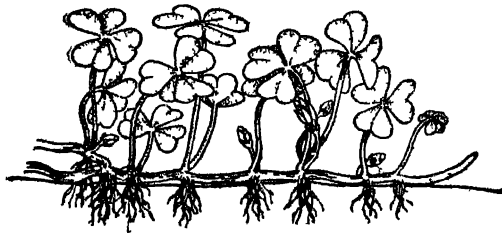
ব্রততী—আমরুল

বা অন্য কোন উদ্ভিদ বা বস্তুকে অবলম্বন ক'রে ওপরে ওঠে। দুর্বল কাণ্ড উদ্ভিদকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

১। ব্রততী (Creepers) :—এই প্রকার লতানো উদ্ভিদ মাটিতে শুয়ে প'ড়ে বৃদ্ধি পায়। এরা মাটির সহিত মিশিয়া থাকে। যেমন—আমরুল শাক, ঘাস, পুঁইশাক ইত্যাদি।

২। রোহিণী (Climbers) :—যে সমস্ত দুর্বল কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা অন্য কোন গাছ বা বস্তুর ওপর নিজেদের জৈবনিক কার্যের প্রয়োজনীয় আলো-বাতাসের সন্ধানে আরোহণ করে সেই সমস্ত উদ্ভিদকে রোহিণী বলে। আরোহণ প্রণালীকে ভিত্তি ক'রে এদেরকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) মূলারোহী-রোহিণী (Root Climbers) :—এরা কাণ্ডের পর্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থানিক মূলের সাহায্যে অপর গাছ বা অন্য কোন অবলম্বনকে আশ্রয় ক'রে ওপরে ওঠে। যথা—গজপিপুল, পান, আইভি ইত্যাদি।

মূলারোহী রোহিনী—পান   অঙ্কুশ রোহিণী—কাঁঠালি চাঁপা   বৃন্তরোহিণী—ছাগলবটি

(খ) অঙ্কুশ-রোহিণী (Hook Climbers) :—এই সকল লতানো উদ্ভিদ তাদের দেহস্থ আঁকশি বা অঙ্কুশ (Hook) দ্বারা আশ্রয়ের ওপর আরোহণ করে। যথা—কাঁঠালি চাঁপা।

(গ) বৃন্ত-রোহিণী (Petiole Climbers) :—এই সব উদ্ভিদের পাতার বোঁটা বা বৃন্তগুলি লম্বাকার আকর্ষে রূপান্তরিত হয় ও তার সাহায্যে এই সকল উদ্ভিদ ওপরে ওঠে। যথা—ছাগলবটি, ঈশ্বরমূল ইত্যাদি।

(ঘ) আকর্ষ-রোহিণী (Tendril Climbers) :—এই সকল উদ্ভিদের দেহে সুতোর ন্যায় পত্রহীন অঙ্গ থাকে। এদেরকে আকর্ষ (Tendril) বলে।

এই আকর্ষের দ্বারা অপর গাছ বা বস্তুকে জড়িয়ে ধ'রে এরা ওপরে ওঠে যথা—কুমড়ো, মটর, লাউ, কুমারিকা ইত্যাদি।

আকর্ষ-রোহিণী—কুমড়ো

(ঙ) **পর্ণ-রোহিণী** (Leaf Climbers) :—এই সব উদ্ভিদের পাতার অগ্রভাগ আকর্ষে রূপান্তরিত হয় ও তার সাহায্যে এরা অপর গাছ বা বস্তুর ওপর ওঠে। যথা—উলটচণ্ডাল।

পর্ণরোহিণী—উলটচণ্ডাল

(চ) **কণ্টক-রোহিণী** (Thorn Climbers) :—দেহস্থ কাঁটার সাহায্যে কোন অবলম্বনের গায় আটকে এই সকল উদ্ভিদ ওপরে ওঠে। যথা—বেতগাছ, বাগানবিলাস, পীতগোলাপ ইত্যাদি।
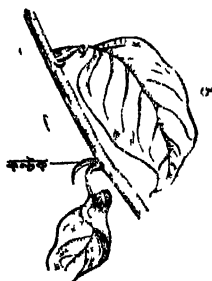
কণ্টক-রোহিণী—বাগান বিলাস

(ছ) **বল্লী** (Stem Climbers) :—এই সকল লতার শাখা-প্রশাখা লম্বা ও কৃশ হয়। তাই এরা শাখা-প্রশাখার সাহায্যেই কোন আশ্রয়কে জড়িয়ে ধ'রে ওপরে ওঠে। এরা দুই প্রকার—(১) **দক্ষিণাবর্ত** (Dextrose)—যখন শাখা-প্রশাখাগুলি কেবল বাম হতে দক্ষিণদিকে আবর্তিত হয়। যথা—খামআলু। (২) **বামাবর্ত** (Sinistrose)—যখন শাখা-প্রশাখাগুলি দক্ষিণ হতে বাম দিকে আবর্তিত হয়। যথা—অপরাজিতা, কুঞ্জলতা ইত্যাদি।

(জ) **কাষ্ঠল লতা** (Lianes) :—এরা বহুবর্ষজীবী রোহিণী লতা। এদের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা কিছুটা শক্ত ও কাষ্ঠল। এইগুলির সাহায্যে এরা

আলোকের সন্ধানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধ'রে তাদের উপরিভাগে আরোহণ করে। যথা—মাধবীলতা, কাঞ্চনলতা ইত্যাদি।

বল্লী—(ক) দক্ষিণাবর্ত—খামআলু; (খ) বামাবর্ত—অপরাজিতা

উদ্ভিদ কাণ্ডের প্রকার ভেদের ছক

কাণ্ড (Stems)

- সবল (Erect or Strong)
  - এক্সকারেন্ট (Excurrent) (ঝাউ)
  - ডেলিকুইসেন্ট (Deliquescent) (বট)
  - কডেক্স (Caudex) (তাল)
  - তৃণকাণ্ড (Culm) (বাঁশ)
- দুর্বল (Weak)
  - ব্রততী (Creepers) (আমরুল শাক)
  - রোহিণী (Climbers)
    - মূলারোহা (Root Climber) (পান)
    - অঙ্কুশ (Hook Climber) (কাঁঠালি চাঁপা)
    - বৃন্ত (Petiole Climber) (ছাগলবটি)
    - আকর্ষ (Tendril Climber) (কুমড়ো)
    - পর্ণ (Leat Climber) (উলটচণ্ডাল)
    - কণ্টক (Thron Climber) (বাগান বিলাস)
    - বল্লী (Steam Climber)
      - দক্ষিণাবর্ত (Dextrose) (খামআলু)
      - বামাবর্ত (Sinistrose) (অপরাজিতা)
    - কাষ্ঠল লতা (Lianes) (মাধবী লতা)
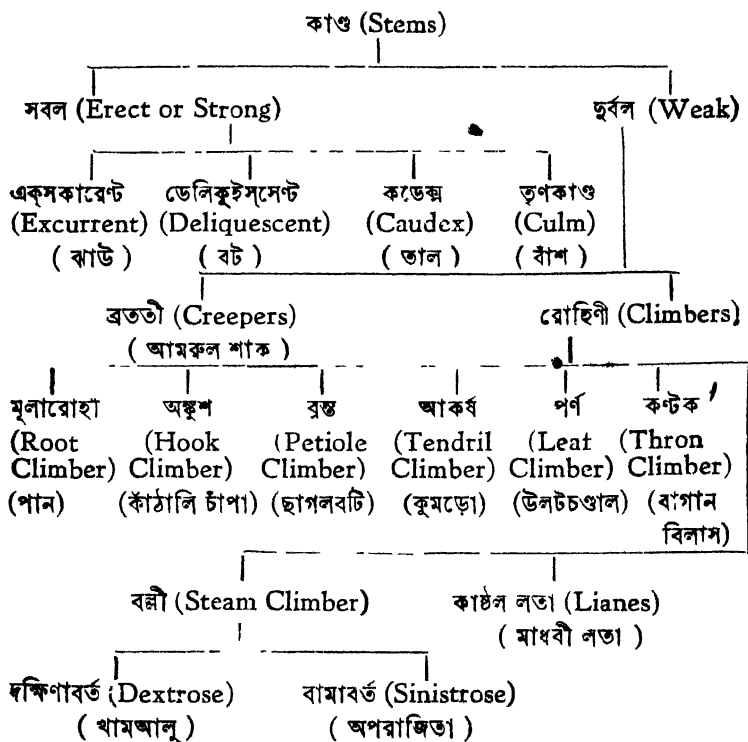
উদ্ভিদের গঠন, উচ্চতা ও আয়ুকাল অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Plants according to their Structure Height and Duration of Life)

দৈহিক গঠন, আয়ুকাল ও জীবনধারা অনুযায়ী উদ্ভিদদের তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) বিরুৎ (Herb), (২) গুল্ম (Shrub) ও (৩) বৃক্ষ (Tree)।

(১) **বিরুৎ (Herb)** :—রসাল ও কোমল কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদকে বিরুৎ বলে। এরা সাধারণতঃ বেশী বড় হয় না। এরা আবার তিনপ্রকারের—

(ক) **বর্ষজীবী (Annuals)** :—এই জাতীয় উদ্ভিদেরা কেবলমাত্র একটি ঋতুতেই বাঁচে। এরা মাত্র একটি ঋতুর মধ্যেই ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন ক'রে ঋতু শেষে ম'রে যায়। যেমন —ধান, ভুট্টা, পাট, সরষে ইত্যাদি।

(খ) **দ্বিবর্ষজীবী (Biennials)** :—এরা মাত্র দু' ঋতুর মধ্যে এদের সমস্ত জীবন-চক্র (life-cycle) সমাপ্ত ক'রে ম'রে যায়। প্রথম ঋতুতে এরা বড় হয় ও মূলে প্রচুর পরিমানে খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখে। দ্বিতীয় ঋতুতে এই সঞ্চিত

বর্ষজীবী বিরুৎ—ভুট্টা

দ্বিবর্ষজীবী বিরুৎ—মুলো
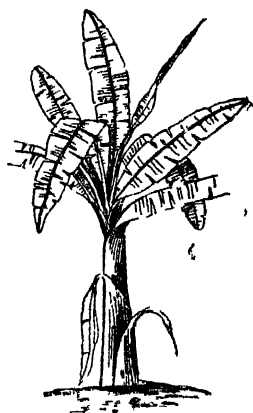
বহুবর্ষজীবী বিরুৎ—কলা

খাদ্য হতে পুষ্টি লাভ ক'রে ফুল, ফল ও বীজ ধারণ করে। তারপর এরা ম'রে যায়। যথা—গাজর, মুলো, শালগম ইত্যাদি।

(গ) **বহুবর্ষজীবী (Perennials)** :—এই প্রকার গাছ বহু বর্ষ ধ'রে বেঁচে থাকে এবং প্রতি বৎসর বিশেষ ঋতুতে এরা ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন করে। যথা—কলাবতী, আদা, হলুদ, কলা, সর্বজয়া ইত্যাদি।

(২) **গুল্ম (Shrubs)** :—যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ডে কাঠের পরিমাণ সামান্য থাকে এবং কাণ্ডটি বৃক্ষকাণ্ডের মত সুপুষ্ট নয় তাদের গুল্ম বলে। এদের প্রচুর পরিমাণ শাখা প্রশাখা থাকে এবং মধ্যম আকারের হয়। যথা—গন্ধরাজ, জবা, গোলাপ ইত্যাদি।

(৩) **বৃক্ষ (Tree)** :—যে সকল উদ্ভিদ লম্বা, কাষ্ঠল ও গুঁড়িযুক্ত হয়, তাদেরকে বৃক্ষ বলে। এদেরকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) **পর্ণমোচী** (Deciduous) :—যে সকল বৃক্ষের পাতাগুলি শীত ঋতুতে ঝ'রে পড়ে, তাদেরকে পর্ণমোচী উদ্ভিদ বলে। যথা—আমড়া, শাল ইত্যাদি।

গুল্ম—জবা

(খ) **চিরহরিৎ** (Evergreen) :—কোন ঋতুতে যে সকল বৃক্ষের পাতা এক সঙ্গে ঝ'রে পড়ে না, বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে ঝ'রে পড়ে, তাদের চিরহরিৎ বৃক্ষ বলে। যেমন—পাইন, দেবদারু ইত্যাদি।

গঠন, আয়ুষ্কাল ও জীবনধারা অনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের ছক
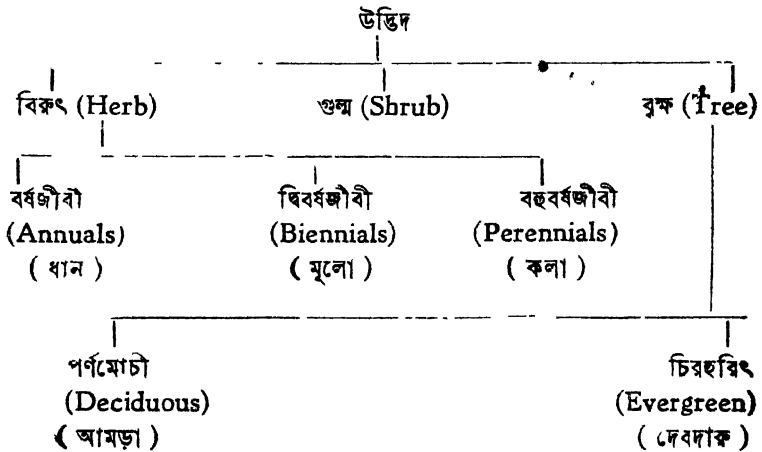
Exexcise (অনুশীলনী)

1. Give an account of the ecological classification of Plants.

[বাস্তু সংস্থান অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের একটি বিবরণ দাও।]

2. Classify the plant kingdom from the evolutionary point of view and give examples.

[বিবর্তনানুসারে উদাহরণসহ উদ্ভিদ জগতের শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা দাও।]

3. Classify plants according to their modes of nutrition and cite suitable examples in each case.

[পরিপোষণ পদ্ধতি অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ কর ও প্রতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত উদাহরণ দাও।]

4. What is an autophyte ? Describe how the autophytic plant manufacture food from inorganic materials.

[স্বভোজী উদ্ভিদ কাকে বলে ? স্বভোজী উদ্ভিদরা কি ভাবে অজৈব পদার্থ থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে তার বিবরণ দাও।]

5. Write an essay on insectivorous plants.

[পতঙ্গভুক উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।]

6. How do you distinguish erect stems from weak stems ? Give an account of weak stemmed plants.

[সবল কাণ্ড ও দুর্বল কাণ্ড চেনার উপায় কি ? দুর্বল কাণ্ড উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।]

7. What do you understand by the terms 'Herb', 'Shrub' and 'Tree' ? Mention the peculiarities by which they differ from one another.

[বিরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ বলতে কী বোঝ ? এদের পরস্পরের পার্থক্যগুলি বুঝিয়ে বল।]

8. Write notes on (টীকা লেখ) :—Amphibious plants (উভচর উদ্ভিদ), Pneumatophore (শ্বাসমূল), Thallus (থ্যালাস), Parasite (পরজীবী), Aldrovanda (অ্যালড্রোভানডা)।

২

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

(Microscope)

ইটের পর ইট বসিয়ে যেমন ইমারত গঠিত হয়, তেমনি অনেকগুলি কোষ (cell)-কে স্তরে স্তরে সাজিয়ে জীবদেহ গঠিত হয়। কোষগুলি খুবই সূক্ষ্ম—এদের খালি চোখে মোটেই দেখা যায় না। সুতরাং জীববিজ্ঞানের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধীয় অংশ বা **হিষ্টোলজি** (Histology) ও কোষ সম্বন্ধীয় অংশ বা **সাইটোলজি** (Cytology) সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভ করতে হ'লে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার অপরিহার্য। তা'ছাড়া পৃথিবীতে অনেক এককোষী প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে ; তাদেরকেও মাইক্রোস্কোপ ব্যতীত দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং মাইক্রোস্কোপ জীববিজ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যক যন্ত্র। প্রকারভেদে অনেক রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখা যায়। একটি **যৌগিক মাইক্রোস্কোপের** (Compound Microscope) বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল—

(১) **পদ বা ভূমি** (Foot or Base) :—এটি সর্বনিম্নে অবস্থিত ও অশ্বক্ষুরের ন্যায় এর আকৃতি।

(২) **স্তম্ভ বা পিলার** (Pillar) :—পদের ওপর খাড়াভাবে অবস্থিত একটি দণ্ড। স্তম্ভের উপরিভাগে একটি খাঁজ থাকে।

(৩) **বাহু বা হাতল** (Arm or handle) :—এর আকৃতি বাঁকা দণ্ডের ন্যায় ও এর তলদেশ স্তম্ভের উপরিভাগের খাজের মধ্যে একটি স্ক্রু দ্বারা আটকানো থাকে। স্ক্রুটিকে ইন্‌ক্লিনেশন স্ক্রু (Inclination screw) বলে। এই স্ক্রুটি থাকার ফলে হাতলটিকে সুবিধাজনক অবস্থায় রাখা যায়।

(৪) **দেহনল বা বডি টিউব** (Body tube) :—এটি বাহুর অগ্রভাগে লম্বালম্বি ভাবে আটকানো থাকে। বিভিন্ন সন্নিবেশক বা অ্যাডজাষ্টমেণ্ট স্ক্রুর সাহায্যে একে সুবিধামত ওঠানো-নামানো যায়।

(৫) **ড্র-টিউব** (Draw tube) :—এটি লম্বভাবে দেহনলের অগ্রভাগে অবস্থিত ও দেহনলের সঙ্গে সংযুক্ত।
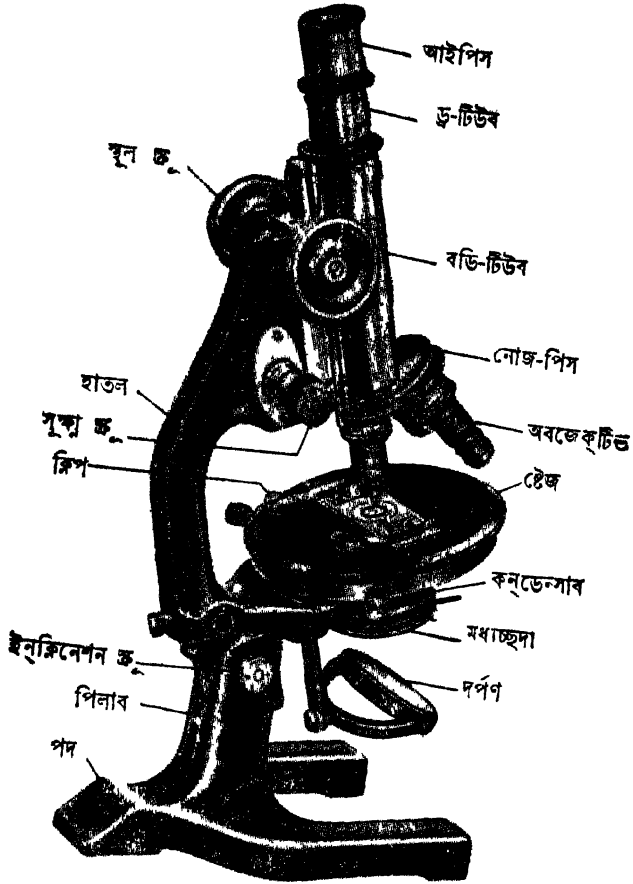
একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও তার বিভিন্ন অংশ

(৬) **অভিনেত্র বা আইপিস** (Eye-piece) :—এটি একটি ফাঁপা নল ও ড্র-টিউবের ভেতর বসানো থাকে। এর অগ্রপ্রান্তটি ড্র-টিউবের ঠিক ওপরেই দেখা যায়। এর অগ্রভাগ ও পশ্চাৎ ভাগে একটি ক'রে সমোত্তল লেন্স (Plano-convex lens) লাগানো থাকে। তাই অভিনেত্রটি বিবর্ধন-ক্ষমতা (Magnification power) সম্পন্ন, অভিনেত্রের কত বিবর্ধন-শক্তি তা' প্রতিটির গায়ে লেখা থাকে।

(৭) **নাসিকা বা নোজ-পিস** (Nose-piece) :—এটি দেহনলের তলদেশে লাগানো থাকে। এটি একটি ঘূর্ণনক্ষম গোলাকার অংশ ও এর তলদেশে বিভিন্ন অবস্থানে সাধারণতঃ দু'তিনটি গর্ত থাকে। এই গর্তগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন বিবর্ধন-শক্তি বিশিষ্ট অভিলক্ষ্য লাগানো থাকে।

(৮) **অভিলক্ষ্য বা অবজেক্টিভ** (Objectives) :—এইগুলিও সরু ফাঁপা নলের মত ও এদের অগ্রভাগ ও পশ্চাৎভাগেও বিবর্ধন-ক্ষমতা সম্পন্ন লেন্স থাকে। বিবর্ধন-শক্তি কত তা' প্রতিটির গায়ে লেখা থাকে। এইগুলি প্যাঁচের সাহায্যে নোজ-পিসের গর্তগুলির মধ্যে আটকানো থাকে।

(৯) **স্থূল ও সূক্ষ্মসন্নিবেশক স্ক্রু** (Coarse and fine adjustment screws) :—এইগুলি হাতলের উপরিভাগের অংশে সংযুক্ত থাকে। এদের সাহায্যে দেহ-নলকে ওঠা-নামা করিয়ে অভিনেত্র ও অভিলক্ষ্যকে উপযুক্ত অবস্থানে সন্নিবেশ করা যায়। স্থূলটির সাহায্যে তাড়াতাড়ি ও সূক্ষ্মটির সাহায্যে খুব ধীরে ধীরে দেহ-নলটিকে ওঠানো ও নামানো হয়।

(১০) **মঞ্চ বা ষ্টেজ** (Stage) :—এটি মোটামুটি বর্গক্ষেত্রাকার অথবা গোলাকার ধাতব অংশ। আলো আসার জন্যে এর মধ্যস্থলে একটি গোলাকার ছিদ্র (hole) থাকে। ছিদ্রটির ওপরেই স্লাইড (slide) বসানো হয়। স্লাইডকে ধ'রে রাখার জন্য ছিদ্রটির দু'পাশে দুটি ক্লিপ (clip) থাকে।

(১১) **কন্‌ডেন্সার** (Condenser) :—এই যন্ত্রটি মঞ্চের ঠিক নীচেই অবস্থিত থাকে ও এর স্ক্রুকে ঘুরিয়ে আলোক কেন্দ্রীভূত করা হয়।

(১২) **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm) :—কন্‌ডেন্সারের নীচে একটি গোলাকার ছিদ্রযুক্ত মধ্যচ্ছদা থাকে। ছিদ্রটিকে ইচ্ছামত ছোট-বড় ক'রে আলোক-প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(১৩) **দর্পণ** (Mirror) :—মধ্যচ্ছদার কিছু নিয়ে একটি গোলাকার দর্পণ থাকে। সাধারণতঃ দর্পণটি পিলারের গায়ে লাগানো থাকে। দর্পণটির

একদিক সমতল ও অপরদিক অবতল। সেইজন্য একে সমাবতল দর্পণ (Plano-concave mirror) বলে। আলোকরশ্মি প্রথমতঃ দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে মধ্যচ্ছদা, কনডেন্সার ও মঞ্চের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ ক'রে স্লাইডে পতিত হয়। কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর অতি পাতলা দেহাংশ বা কোন এককোষী জীবকে ভেজা বা জলশূন্য (dehydrated) অবস্থায় যথাযথ রঙীন ক'রে অথবা রঙীন না ক'রে কাঁচের স্বচ্ছ স্লাইডের ওপর জল, গ্লিসারিন বা অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে স্থাপন করা হয়। দর্পণে প্রতিফলিত রশ্মি কনডেন্সারের সাহাযে কেন্দ্রীভূত হযে মঞ্চের ছিদ্রপথ দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর ভেতর দিয়ে অভিলক্ষ্য বা অবজেক্টিভের লেন্সের ওপর পতিত হয়। সেখান থেকে দ্রষ্টব্য বস্তুর বহুগুণ বর্দ্ধিত আকারের প্রতিকৃতি অভিনেত্র বা আইপিসের মধ্য দিয়ে দর্শকের দৃষ্টি গোচর হয়। কতগুণ বর্ধিত প্রতিকৃতি দেখা যাবে তা নির্ভর করে অভিনেত্র ও অভিলক্ষ্যের বিবর্ধন-শক্তির ওপর। যদি অভিনেত্রের বিবর্ধন-শক্তি '10X' ও অভিলক্ষ্যের '50X' হয় তবে অভিনেত্র দিয়ে দেখলে বস্তুটিকে পাঁচশত গুণ বড় দেখাবে।
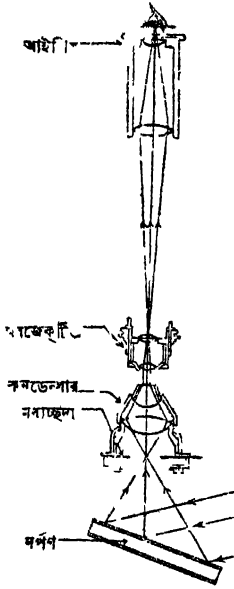
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে আলোকরশ্মির গতিপথ

Exercise (অনুশীলনী)

1. Describe the different parts of a Compound Microscope.

[একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।]

2. Why is Microscope essential for the study of Biology ?

[জীববিজ্ঞান শিক্ষায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র অত্যাবশ্যক কেন ?]

৩

জীবনের একক—কোষ

(Unit of life—Cell)

সুনির্দিষ্ট কার্য সাধনে সমর্থ প্রাচীর বা পর্দাবেষ্টিত নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইটোপ্লাজমই কোষ। ইটের পর ইট সজ্জিত করে যেমন অট্টালিকা গঠিত হয়, তেমনি সমগ্র জীবদেহও একটির পর একটি কোষ দ্বারা গঠিত। আবার জীবদেহের যা'কিছু কাজ তা সবই এই কোষগুলির দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তাই কোষকে গঠন ও কার্যের একক (Structural and functional unit) বলে। আবার জীবদেহের কোষসমূহ প্রতি মুহূর্তে যে নানাপ্রকার বিপাকীয় কার্য বা জৈবনিক কার্য (Metabolic activities or vital functions) সাধন করছে, তা-ই তো সামগ্রিকভাবে জীবন নামে অভিহিত হচ্ছে। সেইজন্যই এক কথায় কোষকে **জীবনের একক** (Unit of life) বলে।

কোষগুলির আকার এতই ক্ষুদ্র যে এদের খালি চোখে দেখা যায় না—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের দেখতে হয়। উদ্ভিদদেহের প্রত্যেকটি কোষের চারদিক একটি কোষপ্রাচীর (Cell wall) দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদ্ভিদ যখন একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত হয়, তাকে এককোষী (Unicellular) উদ্ভিদ বলে, যেমন—ঈষ্ট (Yeast), জীবাণু (Virus)*, ডায়াটোম (Diamtoms) প্রভৃতি। আর যখন অনেকগুলি কোষের সমন্বয়ে উদ্ভিদদেহ গঠিত হয় তখন তাকে বহুকোষী (Multicellular) উদ্ভিদ বলে, যেমন—স্পাইরোগাইরা (Spirogyra), মস (Moss), ফার্ণ (Fern) ও অন্যান্য উচ্চস্তরের উদ্ভিদ।

আদর্শ উদ্ভিদকোষের গঠন :

(Structure of a typical plant cell)

একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম বা জীবপঙ্ক নিয়ে গঠিত। নিম্নে তাদের বর্ণনা দেওয়া হল।

---

*ভাইরাস (virus) হচ্ছে বিভিন্ন মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী খুব ক্ষুদ্রাকৃতির জীব। এরা কখনো জড়ে আবার কখনো জীবে পরিণত হয়।

১। **কোষপ্রাচীর (Cell wall)**—প্রত্যেকটি কোষের চারদিকে প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি দেয়াল বা প্রাচীর থাকে, একে কোষপ্রাচীর বলে। এই কোষপ্রাচীর সাধারণ উদ্ভিদে সেলুলোজ (Cellulose) নামক একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। যদিও প্রোটোপ্লাজম জীবিত পদার্থ, কিন্তু প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে যে কোষপ্রাচীরটি থাকে, তা নির্জীব। কোষপ্রাচীর কোষের চারদিকে শক্ত আবরণ প্রস্তুত ক'রে প্রতি কোষকে একটি বিশেষ আকৃতি দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রাণীকোষের কিন্তু এইরূপ সেলুলোজ নির্মিত কোন কোষপ্রাচীর নেই। এর পরিবর্তে প্রাণীকোষের চারদিকে সাইটোপ্লাজম নির্মিত একটি পাতলা ঝিল্লী থাকে, তাকে কোষ আবরণী (Cell membrane) বা প্লাজমালিমা (Plasmalemma) বলে।
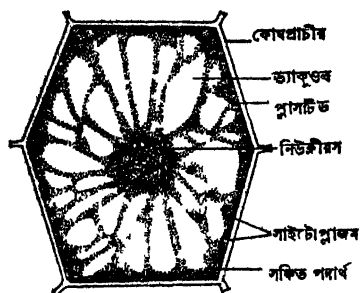
উদ্ভিদকোষ

পেঁয়াজের শল্কপত্রের অন্তস্থিত উপরিত্বকের কয়েক সারি কোষ

উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য উদ্ভিদরা আর একপ্রকার কোষ উৎপন্ন করে। এদের কোন কোষপ্রাচীর থাকে না। সেইজন্য এদেরকে নগ্নকোষ (Naked cell) বলে।

২। **প্রোটোপ্লাজম বা জীবপঙ্ক (Protoplasm)**—কোষের মধ্যে একপ্রকার গাঢ়, অর্ধতরল জেলীর মত থল্‌থলে পদার্থ দেখা যায়, তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। কোষের বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্য কোষ মধ্যস্থিত সংগঠিত (Organised) প্রোটোপ্লাজমকে **প্রোটোপ্লাষ্ট (Protoplast)** বলে। প্রোটোপ্লাষ্ট নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত।

(ক) সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)—প্লাসটিড ও নিউক্লিয়াস ছাড়া
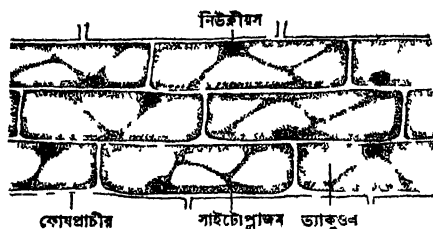
প্রোটোপ্লাজমের বাকি অর্ধতরল ঘন পদার্থকেই সাইটোপ্লাজম বলে। সাইটোপ্লাজমের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছোট, বড়, মাঝারি বিভিন্ন আকারের **কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওল** (Vacuole) দেখা যায়। বয়োপ্রাপ্ত কোষে সমস্ত ভ্যাকুওলগুলি মিলিত হয়ে একটি বড় কেন্দ্রীয় ভ্যাকুওল (Central vacuole) গঠন করে। তখন সাইটোপ্লাজম কোষপ্রাচীর সংলগ্ন হয়ে অবস্থান করে। কেন্দ্রীয় ভ্যাকুওলকে পরিবেষ্টনকারী কোষপ্রাচীর সংলগ্ন এই সাইটোপ্লাজমকেই **প্রাইমোরডিয়াল ইউট্রিকল** (Primordial utricle) বলে। ভ্যাকুওলের মধ্যে একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে, তাকে কোষ রস (Cell sap) বলে।

(খ) **নিউক্লিয়াস** (Nucleus)—এটি প্রোটোপ্লাজমের ঘনতম অংশ, সাধারণতঃ গোলাকার ও কোষের মধ্যস্থলে অবস্থিত। নিউক্লিয়াসটি একটি ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে, তাকে **নিউক্লীয় ঝিল্লী** (Nuclear membrane) বলে। নিউক্লিয়াসের ভূমি রসকে **নিউক্লীয় রস** (Nucleoplasm) বলে। নিউক্লীয় রসের মধ্যে আবদ্ধ থাকে একটি ছোট গোলাকার ঘন অংশ, আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র নির্মিত একটি জালিকা। ঘন গোলাকার অংশটিকে **নিউক্লিওলাস** (Nucleolus) আর জালিকাটিকে **নিউক্লীয় জালিকা** (Nuclear reticulum) বলে। নিউক্লিয়াসটি কোষের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে।

(গ) **প্লাসটিড** (Plastids)—নিউক্লিয়াস ব্যতীত সাইটোপ্লাজমে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার, ডিম্বাকার, দণ্ডাকার প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ঘন অংশ দেখা যায়, এদেরকে প্লাসটিড বলে। প্লাসটিড সবর্ণ অথবা অবর্ণ হয়। সবর্ণ প্লাসটিড যদি সবুজরঙের হয়, তাদের **ক্লোরোপ্লাস্ট** (Chloroplasts) বলে। অন্যান্য রঙবিশিষ্ট সবর্ণ প্লাসটিডকে **ক্রোমোপ্লাস্ট** (Chromoplasts) বলে। বর্ণহীন বা অবর্ণ প্লাসটিডকে **লিউকোপ্লাস্ট** (Leucoplasts) বলে। প্রয়োজনানুসারে একপ্রকার প্লাসটিড অন্যপ্রকারে পরিবর্তিত হতে পারে। সালোকসংশ্লেষ, বর্ণপ্রদর্শন, খাদ্যসঞ্চয় প্রভৃতি কাজে প্লাসটিড সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ঘ) **মাইটোকন্ড্রিয়া** (Mitochondria)—জীবকোষ মাত্রেই সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা যায়। এরা প্লাসটিড অপেক্ষা ছোট এবং আকারে গোলাকার, দণ্ডাকার, দানাকার, সূত্রাকার প্রভৃতি আকারের হয়।

এদের সঠিক কার্যাবলী জানা না গেলেও এরা যে কোষের শ্বাসপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রোটোপ্লাজমস্থিত যে অংশগুলির বর্ণনা ওপরে দেওয়া হল, সেগুলি প্রোটোপ্লাজমের সজীব বস্তু নামে অভিহিত। কিন্তু এইগুলি ছাড়াও প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে নানাপ্রকার জৈব ও অজৈব নির্জীব বস্তু দেখা যায়, এদেরকে এরগ্যাস্টিক বস্তু (Ergastic substances) বলে।

ছকের আকারে উদ্ভিদকোষের গঠন
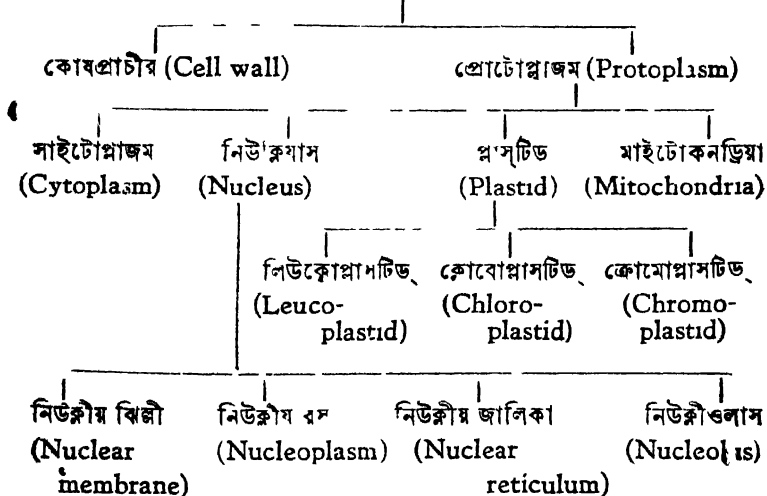
প্রোটোপ্লাজম ও কোষপ্রাচীর
(Protoplasm and the cell wall)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে উদ্ভিদকোষ প্রোটোপ্লাজম ও কোষপ্রাচীর নিয়ে গঠিত এবং আদর্শ উদ্ভিদকোষ বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের নাতিদীর্ঘ বিবরণও লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদকোষ সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রোটোপ্লাজম ও কোষপ্রাচীরের বিবরণ আরও বিশদভাবে জানা আবশ্যক। নীচে সেই বিবরণ দেওয়া হল।

জীব-পঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)

কোষের ভেতর এক প্রকার গাঢ়, অর্ধতরল, জেলীর মত থল্‌থলে পদার্থ দেখা যায়, তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। এই পদার্থটিকে ১৮৩৫ সনে প্রথম আবিষ্কার করেন বৈজ্ঞানিক ডুজারডিন (Dujardin)। জোহানেস পারকিন্‌জি (Johanes Purkinje) নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক 'প্রোটোপ্লাজম' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। আর বিজ্ঞানী মহলে এই কথাটির বহুল প্রচার করেন বৈজ্ঞানিক হিউগো ভন-মল (Hugo von-Mohl)।

জীবের সকল জৈব ধর্ম পালনের জন্য একমাত্র প্রোটোপ্লাজমই দায়ী। জীবন বলতে আমরা যা' বুঝি তা' প্রোটোপ্লাজমেই নিহিত। প্রোটোপ্লাজম ব্যতীত জীবনকে কল্পনাও করা যায় না। তাই বৈজ্ঞানিক হাক্সলে (Huxley) বলেছেন, প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে জীবনের পদার্থিক ভিত্তি (Physical basis of life)। এটি একটি রহস্যময় পদার্থ এবং এখনও এর সম্বন্ধে সব কিছু বিস্তারিত ভাবে জানা যায় নি।

প্রোটোপ্লাজমের প্রকৃতি :
(Properties of Protoplasm)

ভৌত প্রকৃতি (Physical Properties) :—প্রোটোপ্লাজম এক রকম অর্ধতরল (colloid) জেলির মত হড়হড়ে পদার্থ এবং এর ঘনত্ব আবার সব সময় সমান থাকে না। এর আকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (theory) আছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতে এর আকৃতি বিভিন্ন—সাবানের ফেনার মত (alveolar), সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতোর মত (fibrilar), জালকের মত (reticular), দানা দানা মত (granular) ইত্যাদি। উত্তাপ, কোহল (alcohol) ও অম্ল-সহযোগে প্রথমে এর মধ্যে চাঞ্চল্য (irritability) দেখা যায় এবং পরে জমাট (coagulated) বেঁধে যায়। এই জমাট বাঁধাকে তঞ্চন (coagulation) বলে। সজীব প্রোটোপ্লাজম অভিস্রবণ (osmosis) প্রক্রিয়ায় জল গ্রহণ ও জল বর্জন করতে সমর্থ।

রাসায়নিক প্রকৃতি (Chemical Properties) :—রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে যে প্রোটোপ্লাজমের প্রায় ৮০ ভাগই জল। এই জলে অনেক প্রকার জটিল যৌগিক পদার্থ (chemical compound)

মিশ্রিত থাকে। সেইগুলি হচ্ছে—(১) কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় পদার্থ (Carbohydrates), (২) প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় পদার্থ (Protien), (৩) ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় পদার্থ (Fats) ও (৪) অনেক প্রকার অজৈব লবণ (Inorganic salts)। এই যৌগিক পদার্থগুলি আবার কতকগুলি মৌলিক উপাদান (elements) দ্বারা গঠিত।

কার্বোহাইড্রেট—কার্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen) ও অক্সিজেন (Oxygen) দ্বারা গঠিত।

প্রোটিন—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন (Nitrogen) দ্বারা গঠিত, আবার কখনো কখনো এতে গন্ধক বা সালফার (Sulphur) ও ফসফরাস (Phosphorus) থাকে।

ফ্যাট—কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত।

অজৈব লবণসমূহ—পটাসিয়াম (Potassium), ক্যালসিয়াম (Calcium), ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), লৌহ (Iron) ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

জল—জলের মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

তা'হলে প্রোটোপ্লাজম প্রধানতঃ নিম্নলিখিত মৌলিক উপাদান (elements) নিয়ে গঠিত—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ। এরা এক বিশেষ অনুপাতে (ratio) পরস্পর মিশ্রিত থাকে।

প্রোটোপ্লাজমের চলন ঃ
(Movement of Protoplasm)

প্রোটোপ্লাজম কখনই স্থির থাকতে পারে না। সর্বদাই জীবনী শক্তিতে চঞ্চল হয়ে নড়া-চড়া করে। প্রোটোপ্লাজমের এই নড়া-চড়াকেই চলন (movement) বলে। প্রোটোপ্লাজমের এই চলনপ্রক্রিয়া প্রধানতঃ তিন প্রকার—

(ক) **সিলিয়ারী (Ciliary)**:—অনেক সময় নগ্ন প্রোটোপ্লাজমের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতোর ন্যায় অনেক শুঙ্গ বা সিলিয়া (Cilia) জন্মায় এবং এইগুলির সাহায্যে প্রোটোপ্লাজম একস্থান হতে অন্যস্থানে চলাচল করে। যথা—মস, ফার্ণ প্রভৃতি উদ্ভিদের পুংজনন কোষ।

(খ) অ্যামিবয়েড (Amoeboid):—যখন নগ্ন প্রোটোপ্লাজম অ্যামিবার মত ক্ষণপদ (pseudopodia) বার ক'রে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যায়, তখন সেই চলনপ্রক্রিয়াকে অ্যামিবয়েড চলনপ্রক্রিয়া বলে।

সিলিয়াধী গতি
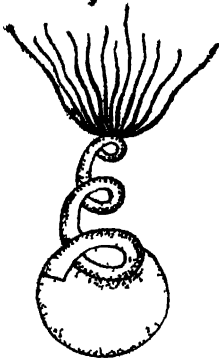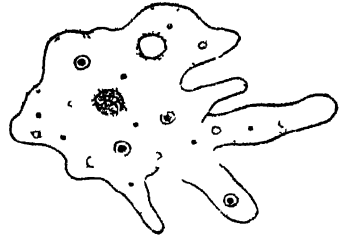
অ্যামিবয়েড গতি

(গ) আবর্তন (Cyclosis):—যখন কোষ কোষ-প্রাচীর যুক্ত থাকে তখন কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের আভ্যন্তরীণ গতিকে আবর্তন গতি বা সাইক্লোসিস (cyclosis) বলে। আবর্তন গতি আবার দু'রকমের—

(১) ঘূর্ণগতি (Rotation):—যখন প্রোটোপ্লাজম কোষপ্রাচীরের ধার দিয়ে একটি বড় কেন্দ্রীয় কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওলকে (vacuole) ঘিরে একটি
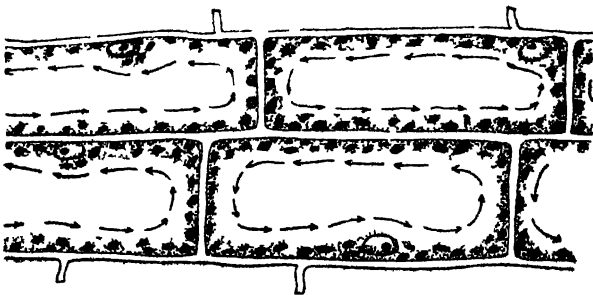
প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহগতি

নির্দিষ্ট পথে চলাচল করে তখন তাকে ঘূর্ণগতি বা প্রবাহ গতি বলে। যথা—পাতা শ্যাওলা বা ভ্যালিসনারিয়া (vallisnaria), ঝাঁঝি ইত্যাদি।

(২) আবর্তগতি (Circulation):—যখন কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম অনেকগুলি ছোট-বড় ভ্যাকুওলকে ঘিরে অনির্দিষ্ট ভাবে বিভিন্ন দিকে

ঘোরাফেরা করে, তখন তাকে আবর্তগতি বলে। কুমড়ো গাছের রোমের কোষে এইরূপ গতি দেখা যায়।

প্রোটোপ্লাজমের আবর্তগতি

প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন গতির ছক
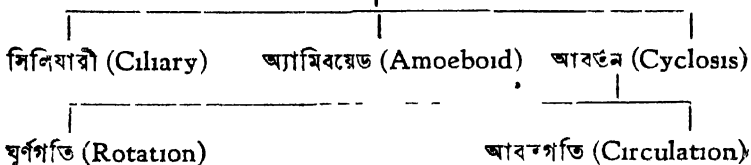
প্রোটোপ্লাজমস্থ বিভিন্ন সজীব ও নির্জীব বস্তুসমূহ :
(Living and non-living contents of Protoplasm)

সজীব বস্তুসমূহ (living contents) :—প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে নিম্নবর্ণিত তিন প্রকার সজীব বস্তু দেখা যায়—

(১) নিউক্লিয়াস (Nucleus), (২) প্লাসটিড্স (Plastids) ও (৩) সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)।

(১) নিউক্লিয়াস্ (Nucleus) :—নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজমের একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন অংশ। সাধারণতঃ এটি গোলাকার ও মধ্যস্থলে অবস্থিত। সাধারণতঃ প্রতিটি কোষে একটি ক'রে নিউক্লিয়াস থাকে। কিন্তু নিম্নস্তরের উদ্ভিদকোষে একটির বেশীও নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসে প্রধানতঃ চারটি অংশ থাকে—
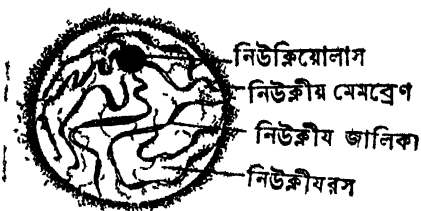
নিউক্লিয়াস ও তার বিভিন্ন অংশ

(ক) নিউক্লীয় ঝিল্লী বা নিউক্লীয় মেমব্রেন (Nuclear membrane)—নিউক্লিয়াসকে বেষ্টন ক'রে

একটি পাতলা আবরণ থাকে তা' নিউক্লিয়াসকে প্রোটোপ্লাজমের আর বাকী অংশ হতে পৃথক ক'রে রাখে। এই আবরণীটিকেই নিউক্লীয় ঝিল্লী বলে।

(খ) নিউক্লীয় রস (Nucleoplasm or nuclear sap)—নিউক্লিয়াসের ভেতর এক প্রকার স্বচ্ছ অর্ধতরল পদার্থ থাকে, তাকে নিউক্লীয় রস বলে। অনেক সময় একে ক্যারিওলিম্ফ (karyolymph) ব'লেও অভিহিত করা হয়।

(গ) নিউক্লীয় জালিকা (Nuclear reticulum)—নিউক্লিয়াসের রসের মধ্যে আবদ্ধ এক প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতোর জালিকা দেখা যায়, তাকে নিউক্লীয় জালিকা বলে। এই সুতোগুলি ক্রোমাটিন সূত্র (chromatin threads) এবং এইগুলিই পরিশেষে ক্রোমোজোমে (chromosomes) পরিণত হয়। বলা আবশ্যক যে ক্রোমোজোমগুলিই বংশগত ধারা (hereditary characters) বহন করে। একেকটি প্রজাতির উদ্ভিদের কোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

(ঘ) নিউক্লিওলাস (Nucleolus)—নিউক্লিয়াসের মধ্যে এক বা একাধিক গোলাকার ঘন পদার্থ দেখা যায়, তাদেরকে নিউক্লিওলাস বলে।

নিউক্লিয়াসের কাজ—নিউক্লিয়াসই প্রোটোপ্লাজমের সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং একে বাদ দিয়ে কোন কোষ বাঁচতে পারে না। কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ক্রোমোজোমের মধ্যে জীবের বংশগত গুণগুলি রক্ষিত থাকে এবং প্রজনন কালে বংশগত গুণগুলি এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে সঞ্চারিত হয়। জননপ্রক্রিয়ার সময়ও নিউক্লিয়াস অনেক প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে।

(২) প্লাসটিড (Plastids)—সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম নির্মিত বিশিষ্ট আকারের ও সুনির্দিষ্ট কাজযুক্ত ছোট ছোট সজীব বস্তু দেখা যায়—এইগুলিকে প্লাসটিড বলে।

আকৃতি (Shape)—গোলাকার, ডিম্বাকার, ডিস্কাকার (Discoid), দণ্ডাকার প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের প্লাসটিড দেখা যায়। শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এদের আকার খুব বড ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। যেমন—ইডোগোনিয়ামের (Oedogonium) ক্ষেত্রে নলাকার (cylindrical), স্পাইরোগাইরার (Spirogyra) ক্ষেত্রে সর্পিলাকার (spiral); জিগ্‌নিমার (Zygnema)

ক্ষেত্রে তারকাকার (star-shaped), ইউলোথ্রিক্সের (Ulothrix) ক্ষেত্রে বলয়াকার (girdle-shaped) ইত্যাদি।

উপস্থিতি ও উদ্ভব (Occurence and Origin)—ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ ও জীবাণু ব্যতীত সকল জীবিত উদ্ভিদকোষেই প্লাসটিড দেখা যায়। উদ্ভিদের উৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থায় কোষের মধ্যে এইগুলি **প্রোপ্লাস্টিড** (Pro-plastids) আকারে বিদ্যমান থাকে। এই প্রো-প্লাস্টিডগুলি খুবই ক্ষুদ্রাকৃতিবিশিষ্ট এবং এরাই বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লাসটিডের জন্ম দেয়। পরবর্তী সময়ে প্লাসটিডগুলিকে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় উদ্ভিদের সেই সেই অংশগুলিতে যে অংশগুলি সালোকসংশ্লেষ, বর্ণ-প্রদর্শন, খাদ্য সঞ্চয় প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করে। প্রোটোপ্লাজম হতে নতুন করে (de novo) প্লাসটিডের উদ্ভব হয় কিনা সে বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত আছে, কারণ প্রো-প্লাসটিডগুলি খুবই ক্ষুদ্র এবং কোন কোন সময় প্রো-প্লাস্টিড দশার পূর্বেই বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা নিউক্লিয়াসের মতই পূর্ববর্তী প্লাসটিড হতেই বিভাজন প্রক্রিয়ায় নতুন প্লাসটিডের জন্ম হয়। প্রাণিকোষে সাধারণতঃ প্লাসটিড থাকে না।

গঠন (Structure)—প্লাসটিডের দেহকে স্ট্রোমা (Stroma) বলে। এর গঠন বড় জটিল এবং একটি পাতলা ঝিল্লী (membrane) দ্বারা এটি আবৃত থাকে। স্ট্রোমার অভ্যন্তরে যে জটিল উপাদানগুলি থাকে, সেগুলি কখনো উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখনো তরলাকারে কখনোবা কেলাসাকারে বিদ্যমান থাকে—এই কেলাসগুলিকে গ্রানা (Grana) বলে।

প্রকারভেদ (Kinds)—প্লাসটিডগুলি প্রধানতঃ দু'রকমের : (১) অবর্ণ প্লাসটিড (Leucoplastids) ও (২) সবর্ণ প্লাসটিড (Chromatophores)।

অবর্ণ প্লাসটিড বা লিউকোপ্লাসটিড—এরা বর্ণহীন। উদ্ভিদের যে অংশ সূর্যালোক পায় না, সেখানেই অবর্ণ প্লাসটিডগুলি থাকে। সাধারণতঃ মাটির নীচে যে সব মূল ও কাণ্ডের অংশবিশেষ থাকে সেই সকল জায়গায় কোষে এদের দেখা যায়।

লিউকোপ্লাস্ট বড় ও ছোট আকারের হয়। বড়গুলি শর্করা হতে শ্বেতসার কণা (Starch grains) প্রস্তুত করতে সমর্থ তাই এদেরকে অ্যামাইলোপ্লাস্ট (Amyloplasts) বলে। আর ছোটগুলি তৈল ও স্নেহজাতীয় খাদ্য গঠনে অংশ গ্রহণ করে ও এলাইয়োপ্লাস্ট (Elaioplasts) নামে অভিহিত।

সবর্ণ প্লাসটিড বা ক্রোমাটোফোর—এরা বিভিন্ন বর্ণযুক্ত প্লাসটিড। এদেরকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) **ক্লোরোপ্লাস্ট** (Chloroplasts)—এদের বর্ণ সবুজ। সাধারণতঃ পাতা ও উদ্ভিদদেহের অন্যান্য সবুজ অংশের কোষে এদের দেখা যায়। ক্লোরোপ্লাস্ট দেখতে গোলাকার, ডিম্বাকার, প্যাঁচানো ফিতে বা জালের মত বা অন্যান্য আকারের হয়, ক্লোরোপ্লাস্টের দেহকে স্ট্রোমা (Stroma) বলে। এইগুলির মধ্যে এক রকমের সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল (Chlorophyll) থাকে
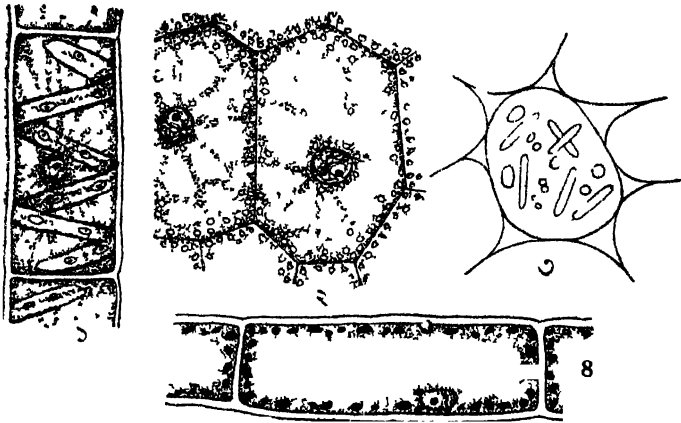
বিভিন্ন রকম প্লাসটিড্স—(১) স্পাইরোগাইরার পাকানো ফিতের মত ক্লোরোপ্লাষ্ট; (২) ভুট্টার লিউকোপ্লাষ্ট; (৩) গাজরের ক্রোমোপ্লাষ্ট, (৪) পাতা শ্যাওলার ক্লোরোপ্লাস্ট্

ব'লে এদেরকে সবুজ দেখায়। ক্লোরোপ্লাস্ট সূর্য-কিরণের উপস্থিতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল দিয়ে উদ্ভিদের জন্য শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। ক্লোরোপ্লাস্ট সূর্যালোকের অভাবে লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয়।

(খ) **ক্রোমোপ্লাস্ট** (Chromoplasts)—সবুজ রঙ ব্যতীত অন্য যে-কোন রঙের প্লাসটিডকে ক্রোমোপ্লাসটিড বলে। এদের আকৃতিও বিভিন্ন। নানান রঙের ফুলের পাপড়িতে, ফলের খোসায় ও উদ্ভিদদেহের অন্যান্য রঙীন অংশের কোষে এদের দেখা যায়। সাধারণতঃ কমলা রঙের ক্যারোটিন (Carotin), লাল রঙের জ্যান্থোফিল (Xanthophyll) ও হলুদ রঙের ল্যুটিনের (Lutein) জন্য এই প্রকার প্লাসটিড বিচিত্র রঙের হয়।

ক্রোমোপ্লাস্ট যে কী কাজ করে তা এখনো সঠিক জানা যায় নি। তবে এর জন্য ফুল ও ফল উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। তার ফলে কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে এবং ফুলে ফুলে পরাগ মিলনে (Pollination) সাহায্য করে।

বিভিন্ন প্লাসটিডের ছক
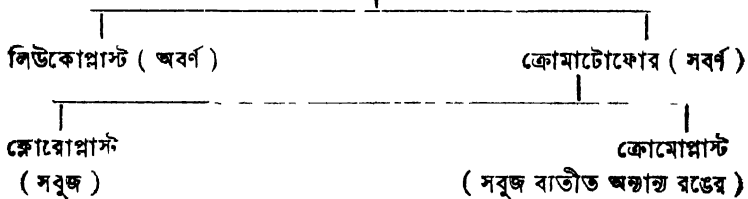
(৩) সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)—প্লাসটিড ও নিউক্লিয়াস ছাড়া প্রোটোপ্লাজমের বাকি অর্ধতরল ঘন পদার্থকেই সাইটোপ্লাজম বলে। কোষ
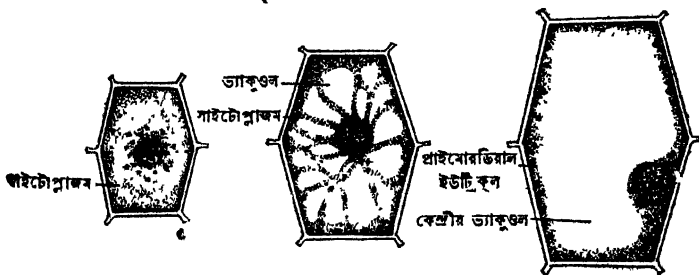
উদ্ভিদকোষের ক্রমপরিণতি ও প্রাইমোরডিয়াল ইউট্রিকলের গঠন

যখন ছোট অবস্থায় থাকে তখন সাইটোপ্লাজম সমস্ত কোষ জুড়ে থাকে। পরে কোষ বড় হওয়ার সংগে সংগে কোষটির আয়তনও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোষের সংগে সামঞ্জস্য রেখে সাইটোপ্লাজম বর্ধিত হতে পারে না। ফলে কোষের মধ্যে কতকগুলি শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়। এই শূন্যস্থানগুলিকে কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওল (vacuoles) বলে। অনেক সময় কোষ যখন আরও বড় হয় সমস্ত ভ্যাকুওলগুলি এক সংগে মিশে গিয়ে কোষের মধ্যস্থলে একটি বড় কেন্দ্রীয় ভ্যাকুওলের সৃষ্টি করে। তখন সাইটোপ্লাজম একটি সরু আবরণের মত হয়ে

কোষ প্রাচীর সংলগ্ন হয়ে থাকে। এই কোষপ্রাচীর সংলগ্ন প্রোটোপ্লাজমকে **প্রাইমোরডিয়াল ইউট্রিকল** (**Primordial utricle**) বলে।

ভ্যাকুওলের মধ্যে এক প্রকার জলীয় পদার্থ থাকে, তাকে কোষ রস (cell sap) বলে। এই কোষ রসে জৈব অ্যাসিড (organic acids), সঞ্চিত খাদ্য (reserve food), অজৈব লবণ (inorganic salts), রেচন পদার্থ (excretory products) ও রঞ্জক দ্রব্য (colouring matters) প্রভৃতি পদার্থ সঞ্চিত থাকে। ভ্যাকুওলের চারদিকে সাইটোপ্লাজমের একটি ঘন দানাবিহীন অংশ সাইটোপ্লাজম ও ভ্যাকুওলের কোষরসকে পৃথক ক'রে রাখে, তাকে টোনোপ্লাজম (Tonoplasm) বলে।

সাধারণতঃ সাইটোপ্লাজম দু'টি স্তরে বিভক্ত থাকে। কোষপ্রাচীর সংলগ্ন বাইরের ঘন স্বচ্ছ ও দানাবিহীন স্তরকে এক্টোপ্লাজম (ectoplasm) বলে ও ভেতরের অর্থাৎ এক্টোপ্লাজম ও টোনোপ্লাজমের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত কম ঘন ও দানাদার অংশকে এণ্ডোপ্লাজম (endoplasm) বলে।

নির্জীব বস্তুসমূহ (**Non-living contents**) **:**—প্রোটোপ্লাজম ব্যতীত কোষস্থিত আর যে সকল জৈব ও অজৈব পদার্থ আছে সেইগুলিকে নির্জীব পদার্থ বলে। তরল বা কঠিন অবস্থায় এরা কোষাবদ্ধ থাকে। বৈশিষ্ট্য অনুসারে এদেরকে প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) সঞ্চিত পদার্থ (Reserve materials)

(২) ক্ষরিত পদার্থ (Secretory products)

(৩) রেচন পদার্থ (Excretory products)

সঞ্চিত পদার্থ—পরিপোষণের সংগে সম্বন্ধযুক্ত সঞ্চিত খাদ্য-উপাদানই এর অন্তর্গত। এরা আবার নিম্ন প্রকারের—

(ক) **শালিজাতীয় পদার্থ বা কার্বোহাইড্রেট** (**Carbohydrates**) —এরা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গঠিত জৈব পদার্থ। এতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলের অনুপাতে থাকে। নীচে শালিজাতীয় পদার্থগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

শর্করা (**Sugar**)—এরা সরলতম জল-অঙ্গার পদার্থ বা কার্বোহাইড্রেট। এরা স্বাদে মিষ্টি ও জলে দ্রবণীয়। উদ্ভিদে দুই প্রকার শর্করা পাওয়া যায়—(১) দ্রাক্ষা শর্করা (Glucose or Grape Sugar)। এর রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। মিষ্টি ফলে ও পেঁয়াজে এই জাতীয় শর্করা পাওয়া যায়।

(২) ইক্ষু শর্করা (Sucrose or cane sugar)। এর রাসায়নিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। ইক্ষু কাণ্ড ও বীটের মূলে এই শর্করা পাওয়া যায়। আবশ্যক মত উৎসেচকের (enzyme) দ্বারা ইক্ষু শর্করা দ্রাক্ষা শর্করায় রূপান্তরিত হয়।

ইনিউলিন (Inulin)—এটিও এক প্রকার জলে দ্রবণীয় জল-অঙ্গার পদার্থ। ডালিয়া, হাতীচোখ প্রভৃতি উদ্ভিদ-মূলের কোষ-রসে তরলাবস্থায় এদের পাওয়া যায়। ডালিয়া মূলের প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে যদি কিছুক্ষণ কোহলে (alcohol) ডুবিয়ে রাখা যায়, তাহ'লে ইনিউলিন ছোট ছোট দানায় পরিণত হ'য়ে কোষ-প্রাচীরের গায়ে লেগে থাকবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিরীক্ষণ করলে এদেরকে গোলাকার হাত পাখার ন্যায় দেখায়।
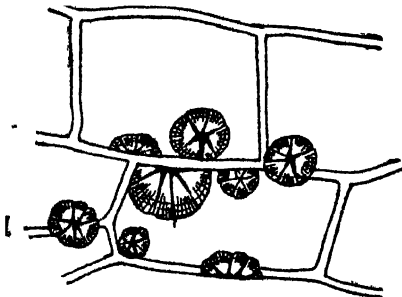
ডালিয়ার মূলের কোষস্থ ইনিউলিন

শ্বেতসার কণা (Starch grains)—এইগুলি জলে বা কোহলে অদ্রবণীয় জল-অঙ্গার পদার্থ। এর রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। লঘু
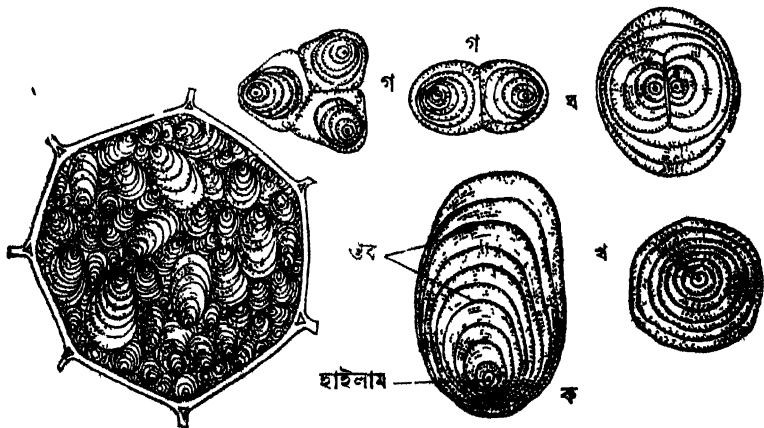
শ্বেতসারকণা—(ক) সরল উৎকেন্দ্রীয়, (খ) সরল সমকেন্দ্রীয়, (গ) যৌগিক; (ঘ) অর্ধযৌগিক

আয়োডিন এর সাথে মিশ্রিত করলে শ্বেতসার কণা নীল বর্ণ ধারণ করে।

ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া ও কিছু সংখ্যক অ্যালজী ব্যতীত প্রায় সকল উদ্ভিদেই শ্বেতসার কণা আছে। বিশেষ ক'রে রসাল মূলে ও ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে এরা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। ধান, গম, যব প্রভৃতি উদ্ভিদেও এদের প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের ডিম্বাকৃতি ও স্তরিত (stratified) দেখা যায়। স্তরগুলি (layers) একটি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল বিন্দুকে বেষ্টন ক'রে রাখে। এই বিন্দুটিকে **হাইলাম** (Hilum) বলে। যদি বিন্দুটি একপার্শ্বে অবস্থিত হয় তা'হলে এই প্রকার শ্বেতসার কণাকে **উৎকেন্দ্রীয়** (Eccentric) বলে—যেমন আলুর শ্বেতসার কণা। যদি হাইলাম শ্বেতসার কণার কেন্দ্রে অবস্থান করে তবে একে বলা হয় **সমকেন্দ্রীয়** (Concentric)—যেমন মটরবীজে পাওয়া যায়। যদি শ্বেতসার কণাগুলি একটি অপরটি হ'তে পৃথক ও মুক্ত থাকে তবে তাদেরকে **সরল** (Simple) বলে। আবার যখন দুই বা ততোধিক শ্বেতসার কণা পুঞ্জীভূত হ'য়ে থাকে তখন তাদেরকে বলে **যৌগিক** Compound)। আবার যখন যৌগিক শ্বেতসার কণাকে বেষ্টন ক'রে এক বা একাধিক সাধারণ স্তর থাকে, তখন তাকে **অর্ধযৌগিক** (Semi-Compound) বলে।

সেলুলোজ (Cellulose)—সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে সেলুলোজও বিভিন্ন গাছে থাকে। শ্বেতসার বা শর্করা অপেক্ষা সেলুলোজ কম পাওয়া যায়। খেজুর, নারকেল প্রভৃতি উদ্ভিদ-বীজের সস্যের অতিরিক্ত প্রাচীরে সেলুলোজ পাওয়া যায়। উৎসেচকের সাহায্যে আবশ্যক মত এরা শর্করায় রূপান্তরিত হয়।

গ্লাইকোজেন (Glycogen)—এও একপ্রকার অদ্রবণীয় জল-অঙ্গার পদার্থ। ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদে সাধারণতঃ এদের দেখা যায়। প্রাণিদেহে প্রচুর পরিমানে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায় ব'লে একে **প্রাণী শ্বেতসার** (animal starch) বলে। লঘু আয়োডিনে পরীক্ষা করলে এদের বর্ণ লালচে বাদামী হয়।

(খ) নাইট্রোজেন ঘটিত সঞ্চিত পদার্থ (Nitrogenous reserve materials)—এরা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ছাড়াও নাইট্রোজেন, সালফার ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানে গঠিত যৌগিক পদার্থ। যে সমস্ত নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগিক পদার্থ কঠিন আকারে বিদ্যমান, তাদের বলে **প্রটিড্ কণা** (Pro-

teid grains), আর যাদের তরলাকারে পাওয়া যায়, তাদের বলে **অ্যামাইনো অ্যাসিড** (Amino acids)। তরল অ্যামাইনো অ্যাসিডের আকারেই এই নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারে। প্রোটো-প্লাজমের একটি উপাদান ব'লে প্রটিড্ কণাগুলি উদ্ভিদের খুব প্রয়োজনীয়। প্রটিড্ কণাগুলি সাধারণতঃ ছোট ও বড় দানার আকারে হয়। এদের সাধারণতঃ মটরের বীজপত্রে, যে সমস্ত বীজে তৈল-পরিমাণ বেশী ও জল-অঙ্গারের পরিমাণ কম সেই সমস্ত বীজের শস্যে (endosperm), ভুট্টা, গম, যব প্রভৃতি বীজত্বকের নিচের স্তরের কোষে পাওয়া যায়।
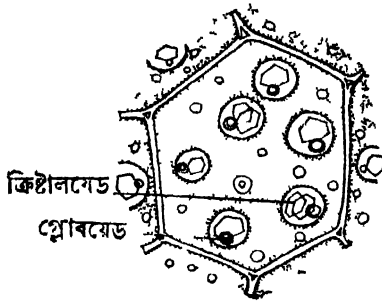
রেড়ি বীজের অ্যালিউরোণ কণা

অনেক বীজে প্রটিড্ কণা অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তখন তাদের বলা হয় **অ্যালিউরোণ কণিকা** (Aleurone grains)। একটি রেড়ি বীজের প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে অনেক শূন্যগহ্বর দেখা যায়। শূন্য-গহ্বরের প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে অ্যালিউরোণ কণিকা আছে। প্রতি অ্যালিউরোণকণিকার দু'টো অংশ। একটি গোলাকার ও ক্ষুদ্র; একে বলে **গ্লোবয়েড** (Globoid)। অপরটি **ক্রিষ্টালয়েড** (Crystalloid), এটি আকারে বড় ও কেলাসিত (Crystalline)। ক্রিষ্টালয়েড মৃদু কষ্টিক পটাশে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু গ্লোবয়েড দ্রবীভূত হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে।
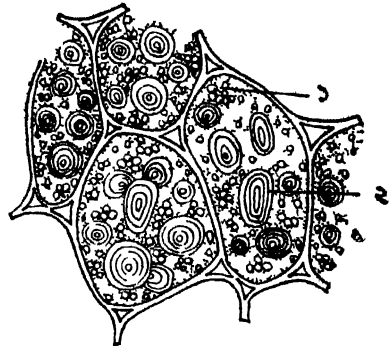
মটরবীজের কোষস্থ –(১) অ্যালিউরোণ কণা, (২) শ্বেতসার

(গ) **স্নেহপদার্থ ও তৈল** (Fats and oils)—এরাও কার্বন, হাইড্রোজেনে ও অক্সিজেনে গঠিত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। কিন্তু এতে

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলের অনুপাতে নেই। এদের খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে বিশেষ ক'রে বীজকোষের সস্তের মধ্যে দেখা যায়। বস্তুতঃ এই রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ **ফ্যাটি অ্যাসিড** (Fatty acid) ও **গ্লিসারিন** (Glycerine) দ্বারা গঠিত। স্নেহপদার্থ সাধারণ তাপে কঠিন অবস্থায় থাকে। এই সকল পদার্থ সাধারণতঃ জলে দ্রবীভূত হয় না। পেট্রোলিয়াম (Petroleum), ইথার (Ether), ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রভৃতিতে এরা দ্রবণীয়। অস্‌মিক অ্যাসিডের (Osmic acid) সংস্পর্শে এরা কালো রঙ্ ধারণ করে।

ক্ষরিত পদার্থ—প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে কোষের ভেতর এই ক্ষরিত পদার্থগুলির (Secretory products) উৎপত্তি হয়। বিভিন্নভাবে এরা উদ্ভিদকে সাহায্য করে। এরা তিন প্রকারের—

(ক) **রঞ্জক পদার্থ** (colouring matters)—ক্লোরোফিল (Chlorophyll), ক্যারোটিন (Carotin), জ্যান্থোফিল (Xanthophyll) এবং আরও অন্যান্য রঙ্ উদ্ভিদে দেখা যায়। এরাই পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতিকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে। ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার (Photosynthesis) একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। কোষরসে সাধারণতঃ তরলাকারে আরও একটি রঙ পাওয়া যায়, এর নাম **অ্যান্থোসায়ানিন** (Anthocyanin)। যখন কোষরসে ক্ষারভাব বেশী থাকে তখন এটি নীল রঙে এবং যখন অম্লভাব বেশী থাকে তখন লাল রঙে রূপান্তরিত হয়।

(খ) **উৎসেচক** বা **এনজাইম** (Enzymes)—এরা প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ। এরা অনুঘটকের মত রাসায়নিক পরিবর্তনের সহায়ক। জীবিত কোষে থেকে এরা শ্বাসপ্রক্রিয়া, আত্তীকরণ, পরিপাক প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্যে সহায়তা করে। এরা অদ্রবণীয় খাদ্যকে দ্রবীভূত ও পরিপাকের উপযুক্ত ক'রে তোলে এবং এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় স্বয়ং অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্তিত থাকে।

(গ) **মিষ্টিরস** বা **নেক্‌টার** (Nectar)—এরা প্রচুর শর্করাযুক্ত ও স্বাদে মিষ্টি। এরা ফুলের মধুগ্রন্থি (Nectar gland) হতে নিঃসৃত হয়। কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট ক'রে এরা পরাগমিলন ঘটাতে সাহায্য করে।

রেচন পদার্থ (Excretory products)—উদ্ভিদের বিপাকীয় কার্যের (Metabolism) ফলে এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থ উপজাত হয়। এরা

কোষাভ্যন্তরে প্রোটোপ্লাজম থেকে দূরে সঞ্চিত থাকে। নিম্নে এদের বিবরণ দেওয়া হল—

(ক) **জৈব অম্ল** (Organic acids)—অনেক উদ্ভিদের কোষরসে বিভিন্ন জৈব অম্ল পাওয়া যায়। যেমন—লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড (Citric acid), আমরুলে অক্সালিক অ্যাসিড (Oxalic acid), তেঁতুলে টারটারিক অ্যাসিড (Tartaric acid) প্রভৃতি।

(খ) **গঁদ** (Gums)—এরা সেলুলোজ গঠিত ও কোষপ্রাচীর হতে বিশ্লিষ্ট হয়ে উৎপন্ন হয়। যথা—গঁদ, কর্পূর ইত্যাদি।

(গ) **রজন** (Resins)—উদ্বায়ী তেলের জারণের (Oxidation) ফলে এদের উৎপত্তি। এরা কঠিন, ভঙ্গুর, অনুদ্বায়ী, জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু কোহলে ও ক্ষারে দ্রবণীয়। যেমন হিঙ্, ধুনো ইত্যাদি।

(ঘ) **ট্যানিন** (Tannins)—এরা নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ এবং ক্ষুদ্রাকৃতির দানার আকারে অথবা পুঞ্জীভূত আকারে উদ্ভিদের কর্টেক্স (Cortex) ও ফ্লোয়েমে (Phloem) পাওয়া যায়। ওক গাছের ফ্লোয়েমে ও তেঁতুল, হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতির ফলেও এদের দেখা যায়। খয়ের একপ্রকার ট্যানিন।

(ঙ) **উপক্ষার** (Alkaloids)—এরা নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ। জৈব অম্লের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় এদের মূল, বীজ, পত্র, ত্বক প্রভৃতিতে তরল বা কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই বিষাক্ত ও তিক্ত স্বাদ যুক্ত। এরা সহজেই কোহলে দ্রবীভূত হয়। সিঙ্কোনা গাছের বল্কলে কুইনাইন, তামাক পাতায় নিকোটিন, আফিমে মরফিন, চা পাতায় থিন (Thein), কফিতে ক্যাফিন (Caffein) ইত্যাদি।

(চ) **প্রয়োজনীয় তৈল** (Etherial or Essential oils)—এইগুলি উদ্বায়ী ও অনেক গাছের ফুলে, ফলে ও পাতায় পাওয়া যায়। প্রতিটিরই স্বতন্ত্র সৌরভ আছে। লেবু, ইউক্যালিপ্টাস প্রভৃতির পাতায় ও লেবু, কমলালেবু, বাতাবীলেবু প্রভৃতি ফলের ত্বকে এইরূপ তেলের গ্রন্থি আছে। এদের চিত্তমোদী সৌরভে কীট-পতঙ্গ আকৃষ্ট হয় ও পরাগ-মিলনে সহায়তা করে।

(ছ) **ক্ষীর** (Latex)—এটি দুধের মত রঙের এক প্রকার রস। এর মধ্যে শর্করা, শ্বেতসার কণা, প্রটিড্ কণা উৎসেচক ও উপক্ষার দ্রবীভূত অবস্থায় আবদ্ধ থাকে। এই রস ক্ষীর নালী (Laticiferous vessels) অথবা

ক্ষীর কোষে (Laticiferous cells) দেখা যায়। এরণ্ড-গোত্র, তুঁত-গোত্র, বকুল-গোত্র প্রভৃতি উদ্ভিদে এই রস পাওয়া যায়।

(জ) ধাতব কেলাস (**Mineral crystals**)—উদ্ভিদের বিভিন্ন কলায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate), ক্যালসিয়াম অক্জালেট (Calcium oxalate) ও সিলিকা (Silica) ঘটিত অনেক প্রকারের কেলাস দেখা যায়। নীচে কয়েকটি ধাতব বস্তুর বিবরণ দেওয়া হল—

বটপাতার সিস্টোলিথ

(১) সিস্টোলিথ (**Cystolith**)—এইগুলি পাতার মধ্যে উপরিত্বকের নীচে এক গুচ্ছ আঙুরের ন্যায় ঝুলতে থাকে। বট, রবার প্রভৃতি গাছের পাতায় এদের দেখা যায়। সিস্টোলিথ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত।
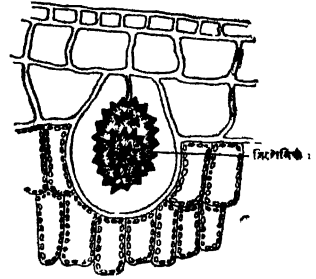
(২) র‍্যাফাইড (Raphides)—এইগুলি ক্যালসিয়াম অক্জালেট দ্বারা গঠিত। সিস্টোলিথের মত এদেরও কোষগহ্বরের মধ্যে দেখা যায়। এরা নানাপ্রকারের হয়। আকৃতি অনুসারে এরা মোটামুটি দু' প্রকারের— **(ক) অ্যাসিকিউলার র‍্যাফাইড (Acicular raphides)**—এদের আকৃতি একগুচ্ছ সূচের মত। লম্বাকার স্ফীত কোষের মধ্যে এদের দেখা যায়। ওল, কচু, কচুরিপানা প্রভৃতির বৃন্তে এদের পাওয়া যায়।
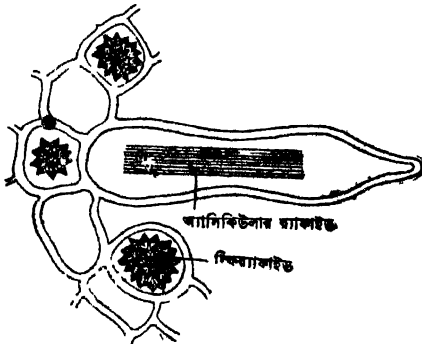
বড়পানার পত্রমূলস্থ র‍্যাফাইড্স্

(খ) স্ফিরর‍্যাফাইড (Sphaeraphides)—এই জাতীয় কেলাসের আকৃতি অনেকটা তারকার ন্যায়। এদেরকে গোলাকৃতি স্ফীত কোষের মধ্যে দেখা যায়। বড়পানার পত্রমূলে এদের দেখা যায়। র‍্যাফাইড হাইড্রোক্লোরিক

অ্যাসিড ও অ্যাসেটিক অ্যাসিডে (Acetic acid) দ্রবীভূত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য র‍্যাফাইড থাকার ফলে কচু, ওল প্রভৃতি খেলে গলা কুট কুট করে।

কোষপ্রাচীর
(Cell Wall)

উদ্ভিদের কোষকে ঘিরে একটি পুরু নির্জীব আবরণী থাকে, তাকে কোষপ্রাচীর বলে। এটি কোষস্থ সজীব অংশ বা প্রোটোপ্লাজমকে রক্ষা করে। কোষপ্রাচীর প্রধানতঃ **সেলুলোজ** (Cellulose) নামক জল-অঙ্গার পদার্থ দ্বারা গঠিত। এর রাসায়নিক গঠন হল ($C_6H_{10}O_5$)x।

কোষপ্রাচীর ও মধ্যচ্ছদা
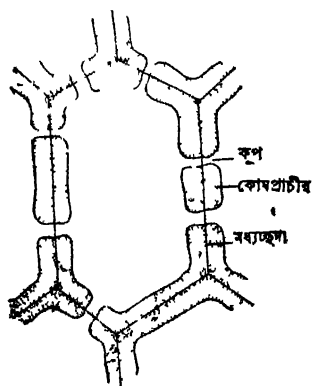
কোষপ্রাচীরের গঠন :—কোষপ্রাচীর সাধারণতঃ প্রোটোপ্লাজমের ক্ষরিত বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়। কোষপ্রাচীর প্রথম গঠিত হবার সময় কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে। প্রথমে কোষপ্রাচীরে **পেকটোজ** (Pectose) নামক জল-অঙ্গার পদার্থ থাকে। পরে উহা **ক্যালসিয়াম পেকটেট** (Calcium pectate) রূপে পরিবর্তিত হয়ে কঠিন হয়, এর পর **পেকটোজ** ও **সেলুলোজ** দ্বারা দ্বিতীয় প্রাচীর গঠিত হয়। তারও পরে **সেলুলোজ** দ্বারা গঠিত হয় তৃতীয় প্রাচীর। পরে কোষ প্রাচীরের মধ্যের স্তরগুলি **লিগনিন** (Lignin) বা **মিউসিলেজে** (Mucilage) পরিবর্তিত হয়।

মধ্যচ্ছদা (Middle lamella)—যখন কোন কোষপ্রাচীর পার্শ্বস্থ কোষপ্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন উপরিস্থিত প্রাচীরগুলির অন্তর্মধ্যবর্তী পর্দার ন্যায় পদার্থকে মধ্যচ্ছদা বলে।

প্লাসমোডেস্‌মাটা (Plasmodesmata) :—কোষপ্রাচীরের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রের সাহায্যে সাইটোপ্লাজমের দ্বারা কোষগুলি পরস্পর পরস্পরের সংগে যুক্ত থাকে। এই সাইটোপ্লাজমীয় সূত্রগুলিকে প্লাসমোডেস্‌মাটা বলে। এদের ফার্ণ, মস প্রভৃতিতে দেখা যায়।

খেজুর বীজের সস্যের কোষস্থ প্লাস্‌মোডেস্‌মাটা
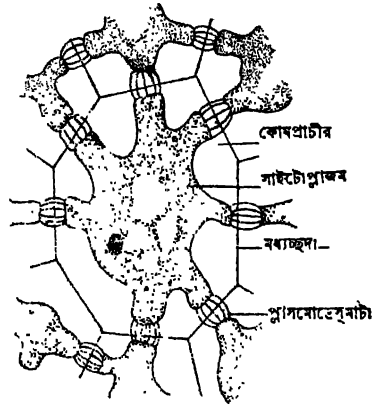
কোষপ্রাচীরের বৃদ্ধি (Development of the cell wall) :—কোষপ্রাচীরের বৃদ্ধির সময় এর উপরিতলের বৃদ্ধির (Surface growth) ফলে এটি পাতলা ও বিস্তৃত হয়। পরে সাইটোপ্লাজম নিঃসৃত নতুন নতুন সেলুলোজ কণিকার সংযোজনে কোষপ্রাচীর স্থূল হতে স্থূলতর হয়। এই প্রকার কোষপ্রাচীরের বৃদ্ধিকে **অন্তর্বেশ** (Intussusception) বলে। কোষপ্রাচীরের স্থূলতা দু' প্রকারে বৃদ্ধিলাভ করে। যখন নতুন সেলুলোজ কণিকা ধীরে ধীরে পুরান সেলুলোজ প্রাচীরের ওপর জমে, তাকে **অ্যাপোজিশন** (Apposition) বৃদ্ধি বলে। আবার যখন কোষপ্রাচীরের স্তরে সেলুলোজ জমা হয় তখন তাকে **সুপারপোজিসন** (Superposition) বৃদ্ধি বলে।

সেলুলোজ বা লিগ্‌নিন কোষপ্রাচীরে সমানভাবে জমা হয় না। কোথাও স্থূল আবার কোথাও পাতলা। এই পাতলা স্থানের ভেতর দিয়ে কোষের রসের আদান-প্রদান হয়।

কোষপ্রাচীরের বিভিন্ন প্রকার স্থূলীকরণ :—কোষপ্রাচীর স্থূল হবার পর সাইটোপ্লাজম শুকিয়ে যায় এবং এই স্থূলীকরণের পর কোষপ্রাচীর নানা প্রকারের হয়।

(১) **বলয়াকার** (Annular)—যখন স্থূলীকরণ আংটির মত বা কূপের মত হয়।

(২) **সর্পিল** (Spiral)—যখন প্যাঁচানো ফিতের মত বা পাকানো সিঁড়ির মত হয়।

(৩) সোপানাকার (Scalariform)—যখন সিঁড়ির ধাপের মত হয়।

(৪) জালকাকার (Reticulate)—যখন অসমান স্থূলীকরণের জন্য জালের মত হয়।
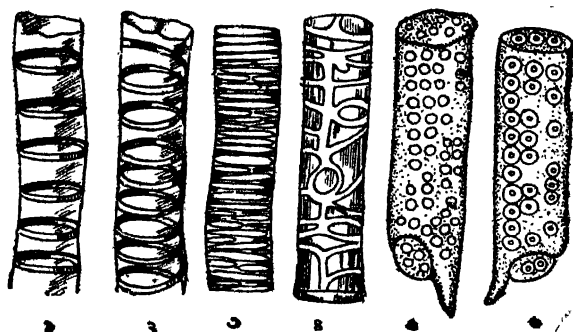
কোষপ্রাচীরের বিভিন্ন স্থূলীকরণ—(১) বলয়াকার; (২) সর্পিলাকার; (৩) সোপানাকার; (৪) জালকাকার; (৫) সাধারণ কূপযুক্ত; (৬) সপাড় কূপযুক্ত

(৫) কূপযুক্ত (Pitted)—স্থূলীকরণের সময় প্রাচীরের উপকরণগুলি সমানভাবে জমে না। ফলে স্থানে স্থানে কিছু পাতলা অংশের সৃষ্টি হয়। এই
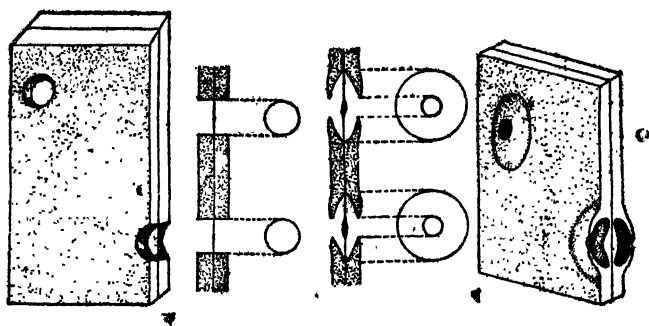
(ক) আংশিক কোষ প্রাচীরে সাধারণ কূপ; (খ) আংশিক কোষ প্রাচীরে সপাড় কূপ

স্থানগুলিকে ছোট ছোট গর্তের মত বোধ হয়, এই গুলিকে কূপ (pit) বলে। কূপগুলি আবার দু'রকমের—(ক) সাধারণ কূপ বা অপাড় কূপ (Simple

pit)—যখন গর্তগুলি গোলাকার হয়। (খ) **পাড়যুক্ত কূপ বা সপাড় কূপ** (**Bordered pit**)—এদের দেখতে সাধারণ কূপের মত, কিন্তু এদের ঝুলানো কানা বা পাড় থাকে।
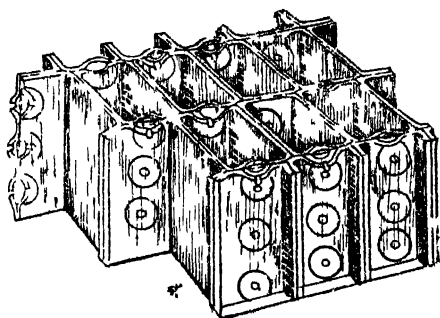
(গ) পাইন গাছের কাণ্ডে সপাড় কূপযুক্ত ট্র্যাকিড্

কোষপ্রাচীরের পরিবর্তন (**Modification of cell wall**) :—কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নানা প্রকার পদার্থে পরিবর্তিত হয়।

(১) **লিগনিফিকেশন** (**Lignification**)—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কোষপ্রাচীরের সেলুলোজ **লিগনিন**-এ (Lignin) পরিবর্তিত হয়। এটি ফ্লোরোগ্লুসিন (Phloroglucin) ও হাইড্রোক্লোরিক (Hydrochloric) অ্যাসিডে লাল বর্ণ ধারণ করে এবং ক্লোরো-জিঙ্ক আয়োডাইডে (Chloro-zinc-iodide) হলুদ বর্ণে রূপান্তরিত হয়।

(২) **কিউটিনাইজেশন** (**Cutinisation**)—রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সেলুলোজে **কিউটিন** (**Cutin**) নামক পদার্থ জমা হয়। এটি মোমের ন্যায় স্থিতিস্থাপক ও কোষের বাইরের দিকে জমা হয়। একে **কিউটিকল** (**Cuticle**) বলে।

(৩) **সুবারাইজেশন** (**Subarisation**)—যখন কোষপ্রাচীরের **সুবারিন** (**Subarin**) নামক তৈলাক্ত রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় তখন কোষপ্রাচীরকে সুবারিন যুক্ত (Subarised) বলে। এটি জল বা গ্যাসের দ্বারা দুর্ভেদ্য।

কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক পরীক্ষা :—কোষপ্রাচীর জল, ক্ষার, কোহল বা মৃদু অ্যাসিডে অদ্রবণীয় এবং ক্লোরো-জিঙ্ক-আয়োডাইড দ্রবণের

(Chloro-zinc-iodide solution) সংস্পর্শে এলে নীলাভ বেগুনী রঙে পরিবর্তিত হয়। সেলুলোজ স্যাফ্রানিন ও মিথিলিন ব্লু (Saffranin and Methylene blue) দ্বারা রঙ করলে মৃদু রঙ ধারণ করে।

Exercise (অনুশীলনী)

1. What is meant by 'Unit of life'? Describe the structure of a typical plant cell.

[জীবনের 'একক' বলতে কী বোঝ? একটি উদ্ভিদ-কোষের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।]

2. What is Protoplasm? Give the physical and chemical properties of Protoplasm.

[প্রোটোপ্লাজম কী? প্রোটোপ্লাজমের ভৌত ও রাসায়নিক গুণগুলি বর্ণনা কর।]

3. Describe various kinds of movement exhibited by Protoplasm.

[প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন চলনপ্রক্রিয়ার একটি বিবরণ দাও।]

4. What are Plastids? Describe various kinds of Plastids and state their functions.

[প্লাসটিড কাদের বলে? কার্যকারিতাসহ বিভিন্ন প্লাসটিডের বর্ণনা দাও।]

5. Describe various non-living cell-inclusions of plants.

[উদ্ভিদের কোষস্থ নির্জীব পদার্থ সমূহের বিবরণ দাও।]

6. Define Cell wall and briefly discuss the origin and growth of the Cell wall.

[কোষপ্রাচীরের সংজ্ঞা কী? কোষপ্রাচীরের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা কর।]

7. Write how Cell-walls are thickened and describe the various types of thickening of Cell walls.

[কোষপ্রাচীর কিভাবে স্থূল হয় লেখ ও বিভিন্ন স্থূলীকরণের বিবরণ দাও।]

8. Write notes on (টীকা লেখ) :—Cell-sap (কোষ-রস), Cyclosis (আবর্তন), Animal starch (প্রাণী শ্বেতসার), Enzyme (উৎসেচক), Nectar (মিষ্টিরস), Cystolith (সিষ্টোলিথ), Raphides (র‍্যাফাইড), Plasmodesmata (প্লাস্‌মোডেস্‌মাটা), Bordered pit (সপাড় কূপ)।

৪

কোষ বিভাজন

(Cell Division)

বৃদ্ধি (growth) সজীব পদার্থের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এক কোষী জীবে দেহকোষের সম্প্রসারণের ফলেই হয় এই বৃদ্ধি। কিন্তু বেশী সংখ্যক উদ্ভিদই তো বহুকোষী—স্থতরাং এদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও জটিল। একটি বহুকোষী উদ্ভিদের প্রথম যখন সৃষ্টি হয়, তখন সে থাকে এককোষী। কালক্রমে সেই কোষটিই ভেঙে ভেঙে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কোষের সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে তা' একটি উদ্ভিদের আকার ধারণ করে। এই প্রকার একটি কোষ বিভক্ত হ'য়ে হ'য়ে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলে **কোষ বিভাজন** (Cell Division)। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়—

(১) **অ্যামাইটোসিস** (Amitosis) বা **প্রত্যক্ষ বিভাজন** (Direct divison) :—এই বিভাজনের সময় কোন **দশা**-র (phases) ভেতর দিয়ে না গিয়ে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই প্রকার বিভাজন যেমন সরল তেমনি আবার বিরল। ব্যাক্টেরিয়া (bacteria), শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদ কারা (chara) প্রভৃতি নিম্ন স্তরের জীবে দেখা যায়। ঈষ্টের (yeast) মুকুলোদ্গম বা কোরকোদ্গম (budding) এই প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়।
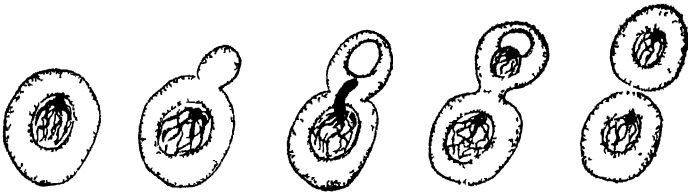
ঈষ্ট উদ্ভিদের মুকুলোদ্গম

(২) **মাইটোসিস** (Mitosis) বা **পরোক্ষ বিভাজন** (Indirect division) :—এটি **দেহকোষের** (Body cells or Somatic cells)

বিভাজন। এই প্রক্রিয়ায় সময় কোষগুলি বিভিন্ন দশা (phases) অতিক্রম ক'রে পরিশেষে অপত্য কোষ (Daughter cells) উৎপন্ন করে।

(৩) **মিয়োসিস** (Meiosis) বা **জনন কোষের** (Germinal cell) **বিভাজন** :—উদ্ভিদের প্রতিটি প্রজাতির কোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে—এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু **নিষেকের** (Fertilization) পূর্বে **স্ত্রী ও পুং জনন কোষের** (Female and Male gametes) প্রতিটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক ক্রোমোজোম দেখা যায়। যে কোষ বিভাজনের সময় একটি পূর্ণ বা ডিপ্লয়েড (Diploid) সংখ্যক ক্রোমোজোম (2n) বিশিষ্ট জনন কোষ ভেঙে অর্ধেক বা হ্যাপ্লয়েড (Haploid) সংখ্যক ক্রোমোজোম (n) বিশিষ্ট জনন কোষের (gametes) সৃষ্টি হয়, তাকে **মিয়োসিস** (Meiosis) বলে। এই বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক ক'মে যায় ব'লে একে **স্বল্পীকরণ বিভাজন**-ও (Reduction division) বলে।

মাইটোসিস বা দেহ-কোষ বিভাজন :
(Mitosis or Somatic cell division)

দেহকোষের বিভাজনকে প্রথমতঃ দু'টি দশায় (stages) বিভক্ত করা যায়—

(ক) **মাইটোসিস বা ক্যারিওকাইনেসিস** (Mitosis or Karyokinesis)—এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসটি বিভিন্ন দশা অতিক্রম ক'রে প্রথমে দু'টি অপত্য নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়।

(খ) **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis)—নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হবার পর এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজমও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই ভাবে দু'টি পৃথক স্বাধীন কোষের সৃষ্টি হয়।

মাইটোসিস বা ক্যারিওকাইনেসিস নিম্নলিখিত চারটি দশায় (Phases) সম্পন্ন হয়—

প্রফেজ বা প্রথম দশা (Prophase) :

(১) প্রথম দশার ঠিক পূর্বে নিউক্লিয়াসটিকে স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস (Resting nucleus) বলে।

(২) নিউক্লীয় জালিকা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতোর ন্যায় পদার্থ বা ক্রোমোজোম গঠন করে। অনেক সময় ক্রোমোজোমগুলি প্রথমে

পরস্পরের সংগে একটি সূত্রগুচ্ছে সংবদ্ধ থাকে। ক্রোমোজোমের এই সূত্রগুচ্ছকে স্পাইরিম (Spireme) বলে। পরে স্পাইরিম থেকে ক্রোমোজোমগুলি পৃথক হ'য়ে হ'য়ে 'V', 'L', 'U' প্রভৃতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে।

(৩) ক্রোমোজোমগুলি আকৃতিতে ক্রমশঃ ছোট ও স্ফীত হয়।

(৪) প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি দু'টি অংশে বিভক্ত থাকে—এই অংশগুলি পরস্পরের গায়ে গায়ে সর্পিলভাবে (spirally) জড়ানো থাকে।
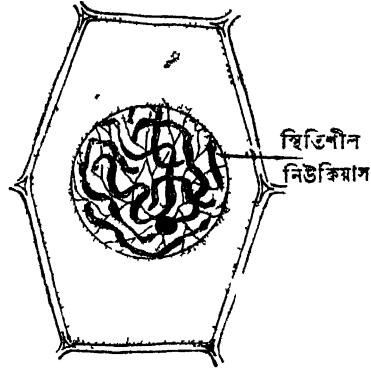
মাইটোসিসের ঠিক পূর্বে কোষস্থ স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস

ক্রোমোজোমের এই খণ্ড দু'টিকে ক্রোমাটিড (Chromatids) বলে। ক্রোমাটিড দু'টি একটি বিন্দুতে পরস্পরের সংগে সংযুক্ত থাকে। বিন্দুটিকে সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) বা কাইনেটোকোর (Kinetochore) বলে।

(৫) নিউক্লিয়োলাস ও নিউক্লীয় মেমব্রেন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(৬) নিউক্লীয় রস থেকে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর আবির্ভাব হয় ও একটি বেম (Spindle) গঠনের সূত্রপাত হয়।

মেটাফেজ বা দ্বিতীয় দশা (Metaphase):

(১) এই দশায় বেমটির (spindle) গঠন সম্পূর্ণ হয়। বেমের প্রান্তদ্বয়কে মেরু (Poles) বলে। বেম দু' প্রকার তন্তু দ্বারা গঠিত—বেমতন্তু (Spindle fibres) ও আকর্ষ তন্তু (Tractile fibres)।

(২) প্রতিটি ক্রোমোজোম বা প্রতিজোড়া ক্রোমাটিড সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) অংশে আকর্ষ তন্তুর গায়ে লেগে যায়।

(৩) এই ক্রোমাটিডগুলি বেমের বিষুবরেখায় নিজেদেরকে সজ্জিত করে। প্রতিজোড়া ক্রোমাটিড এখনো সেন্ট্রোমিয়ারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত থাকে।

অ্যানাফেজ বা তৃতীয় দশা (Anaphase):

(১) এই দশায় প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বিধাবিভক্ত হয়। ফলে প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দু'টি পৃথক হয়ে যায়।
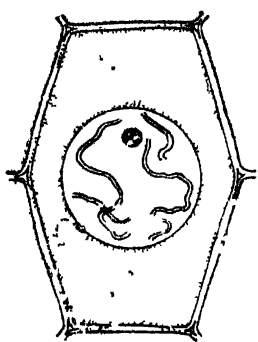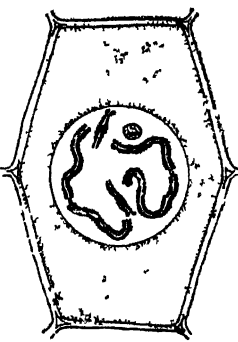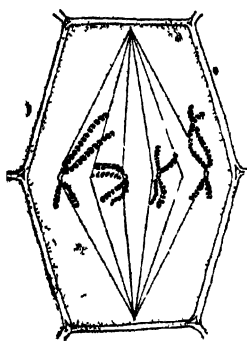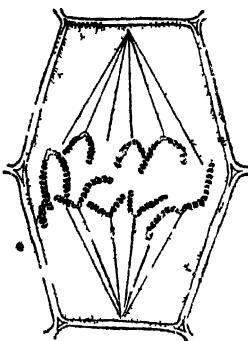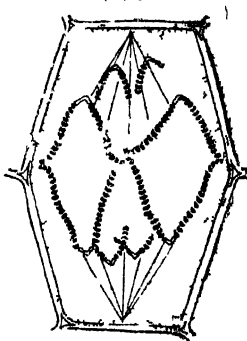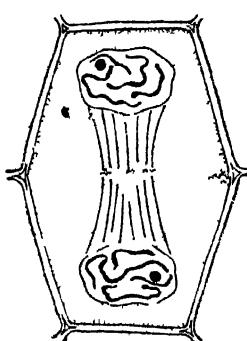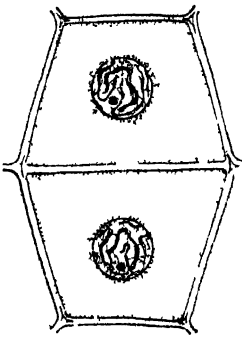
মাইটোসিসের বিভিন্ন দশা ও সাইটোকাইনেসিস

(২) ক্রোমাটিডগুলি পরস্পর হতে পৃথক হবার পর তন্তুগুলির সংকোচনের ফলে মেরুদ্বয়ের দিকে অগ্রসর হয়। এই ভাবে ক্রোমাটিড সংখ্যার এক অর্ধাংশ এক মেরুতে ও অপর অর্ধাংশ অন্য মেরুতে যায়। এটি উল্লেখযোগ্য যে প্রতিটি ক্রোমাটিডের সেণ্ট্রোমিয়ারটিই আগে মেরুর দিকে যায়, আর ঝুলন্ত বাহুদ্বয়টি যায় পরে। ক্রোমাটিডগুলিকে এখন অপত্য-ক্রোমোজোম বলে।

টেলোফেজ বা চতুর্থ দশা (Telophase):

(১) প্রতিটি মেরুতে অপত্য-ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে পুনরায় নিউক্লীয় জালিকা গঠন করে।

(২) বেম ও এর তন্তুগুলি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে।

(৩) এই সময় নিউক্লীয় মেমব্রেন ও নিউক্লিয়োলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। ফলে দু'টি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়।

সাইটোকাইনেসিস :—মাইটোসিসের টেলোফেজ বা চতুর্থ দশা থেকেই এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় জনিতৃ-কোষের (mother cell) সাইটোপ্লাজম অপত্য নিউক্লিয়াস দু'টিকে দু'পাশে রেখে মাঝ বরাবর বিভক্ত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকালে জনিতৃ-কোষের বিষুব প্রদেশে বিন্দু বিন্দু সেলুলোজ কণিকা জমিতে থাকে। এইভাবে প্রচুর সেলুলোজ কণিকা জমবার পর কোষটির বিষুব প্রদেশে একটি কোষপাত (Cell-plate) গঠিত হয়। এই কোষপাতটি লম্বালম্বি মাঝ বরাবর ফেটে যায় ও সাইটোপ্লাজমকে দ্বিধাবিভক্ত করে। এই ভাবে দু'টি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।

অবাধ কোষ-গঠন :
(Free Cell-formation)

বস্তুতঃ এই প্রক্রিয়াটি মাইটোসিসেরই একটি পরিবর্তিত রূপ। এই প্রক্রিয়ায় জনিতৃ-কোষের নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় পর পর কয়েক বার বিভক্ত হয়ে কোষের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট অপত্য-নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। এরপর প্রতিটি অপত্য-নিউক্লিয়াস কিছু সাইটোপ্লাজম ও একটি প্রাচীর দ্বারা আবৃত হয়। এইভাবে জনিতৃ-কোষের অভ্যন্তরে অনেকগুলি অপত্য-কোষের সৃষ্টি হয়। এই অপত্য-কোষগুলি জনিতৃ-কোষের কোষপ্রাচীর

ফেটে যাবার পর বের হয়ে আসে। কোন কোন শৈবাল ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদে এই প্রকার কোষ-গঠন দেখা যায়।
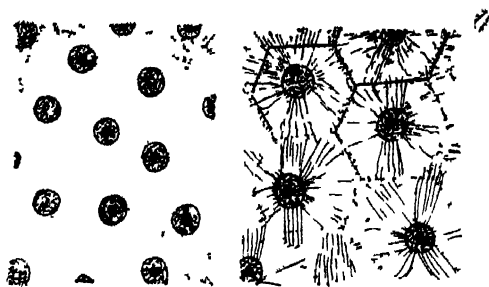
অবাধ কোষ গঠন—(ক) একই জনিতৃ কোষে অসংখ্য অপত্য নিউক্লিয়াস,
(খ) কোষপ্রাচীরের সৃষ্টি ও নতুন কোষের গঠন

Exercise (অনুশীলনী)

1. What is Mitosis ? Describe its various stages.

[মাইটোসিস কী ? মাইটোসিসের বিভিন্ন দশাগুলি বর্ণনা কর।]

2. Write notes on (টীকা লেখ)—Amitosis (অ্যামাইটোসিস), Meiosis (মিয়োসিস), Free Cell-formation (অবাধ কোষ-গঠন)

৫

কলা ও তার কাজ

(The Tissue and its Function)

উদ্ভিদের দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সমন্বয়ে গঠিত। নীচু স্তরের উদ্ভিদের দেহ একটি মাত্র কোষ দ্বারা গঠিত এবং এই কোষটির দ্বারাই এদের যাবতীয় কার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু উঁচু স্তরের উদ্ভিদ-দেহ বহু কোষ নিয়ে গঠিত। শ্রম বিভাগের (Division of labour) ফলে বিভিন্ন কার্য সাধনের জন্য কোষগুলি দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। এই প্রকার এক একটি কোষের দলকে— যেখানে সংযুক্ত কোষগুলির আকার, গঠন, উৎপত্তি ও কাজ প্রায় একই, **কলা** (Tissue) বলে। কলার কোষগুলি পরস্পর জোড়ার সময় যদি ফাঁক থাকে তবে তাকে **কোষান্তর রন্ধ্র** (Intercelluar space) বলে। কোষান্তর রন্ধ্র দু'রকমের—(১) যখন কোষগুলির কোষপ্রাচীর অনুদৈর্ঘ্যে (longi-tudinally) চিরিয়া কোষান্তর রন্ধ্র তৈয়ারী করে তখন তাকে **সিজোজেনিক** (Schizogenic) কোষান্তর রন্ধ্র বলে। (২) যখন কতকগুলি মাঝখানের কোষ বিনষ্ট হয়ে রন্ধ্র গঠন করে তখন তাকে **লাইসিজেনিক** (Lysigenic) কোষান্তর রন্ধ্র বলে।

সাধারণতঃ কলা দু' প্রকারের—(ক) ভাজক কলা ও (খ) স্থায়ী কলা।

ভাজক কলা ঃ
(Meristemetic Tissue)

যে কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে নতুন নতুন কোষের উৎপত্তি করে, তাকে ভাজক কলা বলে। অবস্থান অনুসারে এদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। **অগ্রস্থ ভাজক কলা** (Apical meristem) :—এইগুলি মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত হ'য়ে উদ্ভিদকে দৈর্ঘ্যে বর্ধিত হ'তে সাহায্য করে।

২। **পার্শ্বস্থ ভাজক কলা** (**Lateral meristem**)—এরা কাণ্ড ও মূলের পার্শ্বে অবস্থিত থেকে পরিধি বর্ধনে বা মোটা হ'তে সাহায্য করে।
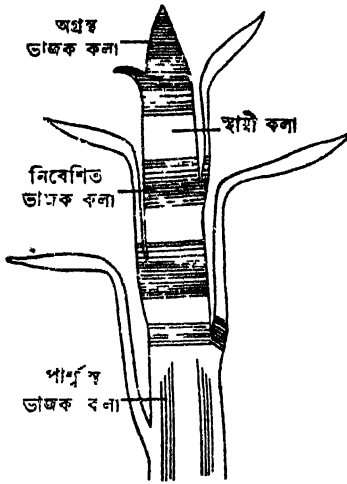
কাণ্ডের দীর্ঘচ্ছেদের বিভিন্ন ভাজক কলার অবস্থিতি

৩। **নিবেশিত ভাজক কলা** (**Intercalary meristem**):—এই রকমের কলা অগ্রস্থ ভাজক কলা হতে খুব বেশী পৃথক নয় তবে এরা ওপরে ও নীচে দু'টি স্থায়ী কলার মাঝখানে অবস্থিত। এরাও দৈর্ঘ্যে বর্ধিত হতে সাহায্য করে, তবে কিছুদিন পরে এরা কোষ বিভাজন শক্তি হারিয়ে ফেলে।

উৎপত্তি অনুসারে ভাজক কলা আবার দু'রকমের—

(ক) **প্রাথমিক ভাজক কলা** (**Primary meristem**)—এরা উদ্ভিদের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সমানভাবে বর্তমান থাকে।

(খ) **গৌণ ভাজক কলা** (**Secondary meristem**)—বিশেষ সময়ে স্থায়ী কলা হ'তে নতুন ক'রে যখন ভাজক কলার উৎপত্তি হয় তখন সেই ভাজক কলাকে গৌণ ভাজক কলা বলে।

স্থায়ী কলা ঃ
(Permanent Tissue)

যে কলার কোষগুলি ভাজক কলা হতে উৎপন্ন হয়ে বিভক্তি শক্তি হারিয়ে একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে, তাকে স্থায়ী কলা বলে। কার্যানুসারে স্থায়ী কলা তিন প্রকার—

১। **সরল স্থায়ী কলা** (**Simple permanent tissue**)—এই কলার কোষগুলির আকার ও কার্য একই রকমের হয়। এরা আবার তিন প্রকারের—

(ক) প্যারেনকাইমা (Parenchyma)—কোষগুলির আকার গোল, ডিম্বাকার বা বহুভুজের মত। স্থানে স্থানে কোষান্তর রন্ধ্র দেখা যায়। এদের কোষপ্রাচীর পাতলা ও সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। সাধারণতঃ এই কোষগুলি জীবিত এবং উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে এই কলা প্রচুর পরিমাণে থাকে। কাণ্ড ও মূলের ত্বক সাধারণতঃ এরাই উৎপন্ন করে।
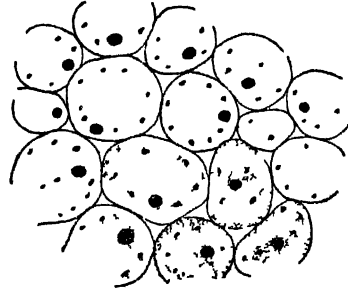
প্যারেনকাইমা

(খ) কোলেনকাইমা (Collenchyma)—এই প্রকার কলার কোষগুলি কথঞ্চিৎ লম্বাটে ও কোষপ্রাচীরের কোণায় কোণায় অতিরিক্ত সেলুলোজ জ'মে সেই স্থানগুলিকে স্থূল করে। কোষগুলি সজীব ও প্রস্থচ্ছেদে গোলাকার বা বহুভূজাকার দেখায়। উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধির (Secondary growth) সময় যদি এই কলা অদৃশ্য হয়, তবে তাকে অস্থায়ী, আর যদি উদ্ভিদের সারাজীবন ধ'রে এই কলাটি থাকে, তবে তাকে স্থায়ী কোলেনকাইমা বলে। সাধারণতঃ কাণ্ডের অধস্ত্বকে (Hypodermis) কয়েকটি স্তরে
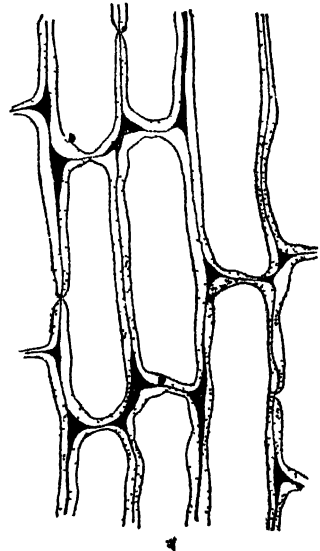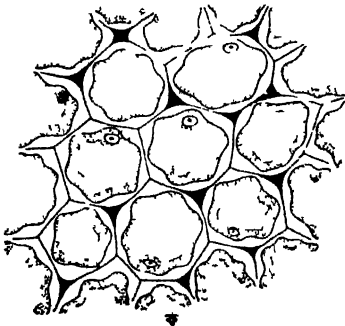
কোলেনকাইমা—(ক) প্রস্থচ্ছেদ, (খ) দীর্ঘচ্ছেদ

এদের বিস্তৃত দেখা যায়। এরা দৃঢ়ীকরণে সাহায্য করে ব'লে এরা একপ্রকার যান্ত্রিক কলা (Mechanical tissue)।

(গ) **স্ক্লেরেনকাইমা** (Sclerenchyma)—এই কলার কোষগুলির কোষপ্রাচীর লিগ্‌নিন যুক্ত হয়ে স্থূল ও কঠিন হয়। কোষগুলি মৃত ও প্রোটোপ্লাজম বিহীন। সাধারণতঃ একবীজপত্রী উদ্ভিদের অধস্তকে ও শিরাত্মক কলাসমষ্টির (Vascular bundles) চারপাশে এদের দেখা যায়। স্ক্লেরেনকাইমা আবার দু'রকমের—
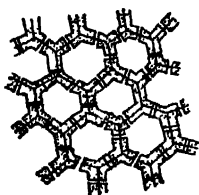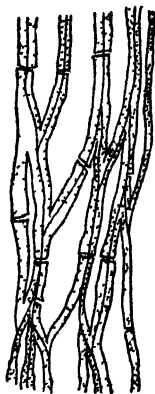
স্ক্লেরেনকাইমা—(ক) প্রস্থচ্ছেদ; (খ) দীর্ঘচ্ছেদ; (গ) স্ক্লেরেনকাইমার একটি তন্তু

(১) **স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু** (Sclerenchyma fibre)—এর কোষগুলি লম্বা ও দু'দিক সূচল। কোষপ্রাচীরে লিগ্‌নিন বেশী পরিমাণে থাকে ও এর গায়ে সরল কূপ দেখা যায়। এদেরকে বাস্ট তন্তু (Bast fibre) এবং কাষ্ঠল তন্তুও (Wood fibre) বলে।

(২) **স্ক্লেরাইড** (Scleride)—এর আকৃতি গোল। কোষপ্রাচীর
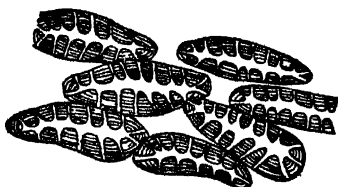
পেয়ারার প্রস্তর কোষ (ক) প্রস্থচ্ছেদ; (খ) দীর্ঘচ্ছেদ

লিগ্‌নিন বা কোন কোন ক্ষেত্রে সুবারিন বা কিউটিন যুক্ত। কোষপ্রাচীরের

উপাদান কোষের ভেতরে এমনভাবে জমে যে কোষ গহ্বরটি অত্যন্ত ছোট হয় ও এর ভেতর নালার মত কতকগুলি আকৃতি দেখা যায়। পেয়ারা, নাশপাতি, আপেল প্রভৃতি ফলের বহির্ত্বকে এই কলা দেখা যায়। এই প্রকার কোষকে প্রস্তর কোষ (Stone cells) বা স্ক্লেরোটিক (Sclerotic) কোষ বলে।

স্ক্লেরেনকাইমা কলা দৃঢ়তা-প্রদানে সাহায্য করে। সুতরাং এটিও যান্ত্রিক কলা।

২। **জটিল কলা (Complex tissue)**:—এই প্রকার কলার কোষগুলি মোটামুটি একরকম কাজ করলেও এদের আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন। নিম্নলিখিত শিরাত্মক কলাগুলিই (Vascular tissue) এর অন্তর্ভুক্ত।

(ক) জাইলেম (Xylem)—এই কলা সম্পূর্ণ বৃদ্ধিলাভের পর চারপ্রকারের হয়। এর মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের মূল হতে জল পত্রের ত্বকে গিয়ে পৌছায়। উদ্ভিদকে শক্তিদানেও এরা সহায়তা
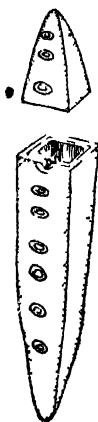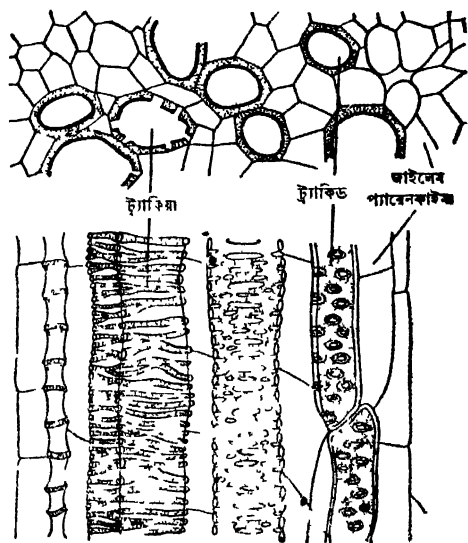
জাইলেম— উপরে প্রস্থচ্ছেদ, নীচে দীর্ঘচ্ছেদ

পাইন গাছের একটি ট্র্যাকিডের চিত্ররূপ

করে। এই কলা নিম্নলিখিত উপাদানে গঠিত—

(১) **ট্র্যাকিড (Tracheid)**—এই মৃত কোষগুলি লম্বা ও এর দুইপ্রান্ত অপেক্ষাকৃত সরু। এর কোষপ্রাচীর লিগ্‌নিনযুক্ত। এতে বলয়াকার, সর্পিলাকার, সপাড় কূপযুক্ত প্রভৃতি স্থূলীকরণ দেখা যায়।

(২) **ট্র্যাকিয়া (Trachea) বা বাহিকা (Vessel)**—এরা আকারে সরু নলের মত ও নির্জীব। এদের কোষপ্রাচীর লিগ্‌নিন দ্বারা গঠিত। লিগ্‌নিন জ'মে এমনভাবে কোষপ্রাচীর স্থূলীকরণ করে যে তার নানান্ আকৃতি হয়। সুতরাং বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালকাকার, কূপযুক্ত, সপাড় কূপযুক্ত—সকলপ্রকার স্থূলীকরণই দেখা যায়। প্রথমে কোষগুলি একটির ওপর একটি ক'রে সজ্জিত হয়ে একটি লম্বা কোষের সারি গঠন করে। তারপর অন্তর্বর্তী সংযোজক কোষপ্রাচীরগুলি বিলুপ্ত হয়ে একটি লম্বা গহ্বরযুক্ত মৃত নল গঠন করে। জল সংবহন করাই এর কাজ।
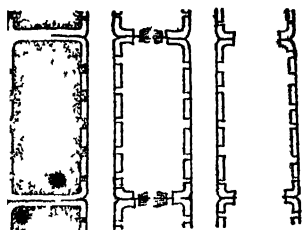
ট্রাকিয়ার গঠন

(৩) **জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma)**—এরা প্যারেনকাইমা কোষ বটে কিন্তু অনেকটা লম্বাটে ধরণের। সাধারণতঃ কোষ-প্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত। আবার কখনো কখনো লিগ্‌নিনযুক্ত হয়ে স্থূল হয়। কখনো কখনো কূপও দেখা যায়।

(৪) **কাষ্ঠল তন্তু (Wood fibre)**—এইগুলি পূর্বোক্ত স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুদ্বারা গঠিত।

(খ) ফ্লোয়েম (Phloem)—এইগুলি একপ্রকার সজীব পাতলা, প্রাচীর-বিশিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত কলা। পাতা হতে উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে খাদ্য সরবরাহ করাই এদের প্রধান কাজ। সময়ে সময়ে এরা খাদ্য সঞ্চয় করেও রাখে। এরা নিম্নলিখিত উপাদানে গঠিত—
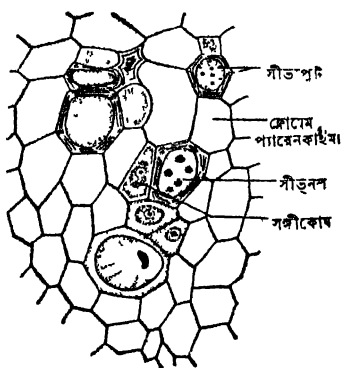
ফ্লোয়েম—প্রস্থচ্ছেদ

(১) **সীভ্‌নল (Sieve tube)**—এটি একপ্রকার নল বিশেষ। এই নলের

প্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। নলের মধ্যে কিছু স্থান অন্তর অন্তর কতকগুলি সছিদ্র প্রাচীর বা চালনীচ্ছদা (Plate) আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত থাকে। এদের সীভ্-প্লেট (Sieve-plate) বলে। সীভ্নলে কোন নিউক্লিয়াস নেই।

(২) সঙ্গীকোষ (Companion cell)—
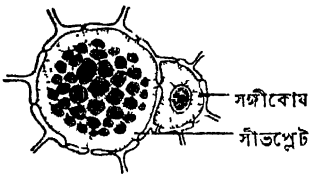
সীভ্প্লেট ও সঙ্গীকোষ
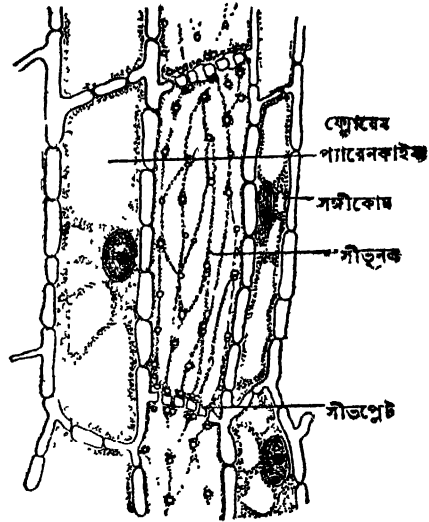
ফ্লোয়েম—দীর্ঘচ্ছেদ

সীভ্নলের গায়ে গায়ে লাগানো ঘন সাইটোপ্লাজমপূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত লম্বাকার কোষগুলিকে সঙ্গীকোষ বলে।

(৩) **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা** (Phloem parenchyma)—এগুলি লম্বাটে ও চওড়া প্যারেনকাইমা কোষ ও আদি ক্যামবিয়াম (Pro-cambium) হ'তে গঠিত।

(৪) **বাস্ট তন্তু** (Bast fibre)—এইগুলি পূর্বোক্ত স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর দ্বারা গঠিত।

৩। **বিশেষ কলা** (Special tissue)—উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য এই ধরণের কলা উৎপন্ন হয়। সুতরাং এদের আকৃতিও স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ এরা রেচন অথবা ক্ষরিত বস্তু (যেমন—গঁদ, মধু, রজন ইত্যাদি) বহন করে।

ল্যাটিসিফেরাস নালী (Laticiferous ducts)—এরা একপ্রকার রেচন বস্তু বহনকারী কলা। এদের নালীর মধ্যে দুধের মত এক প্রকার জলীয় তরুক্ষীর (latex) থাকে। ল্যাটিসিফেরাস নালী আবার দু'রকমের—

(ক) **ক্ষীর নালী (Latex vessel)**—প্রাথমিক ভাজক কলা হতে এর উৎপত্তি। কতকগুলি লম্বা সরু কোষ পরস্পর যুক্ত হয়ে ও তাদের অন্তর্বর্তী প্রাচীরগুলি বিলুপ্ত হয়ে এই নালী গঠন করে। কোষগুলি নানাভাবে যুক্ত হওয়ায় ক্ষীরনালী নানান শাখাবিশিষ্ট হয়। অন্তর্বর্তী প্রাচীরগুলি বিলুপ্ত হওয়ায় নিউক্লিয়াসগুলি নালীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত থাকে, সেইজন্য একে সিনোসাইটিক (Coenocytic) বলে। আফিং, কলা, কচু প্রভৃতি গাছে এই প্রকার ক্ষীরনালী দেখা যায়।
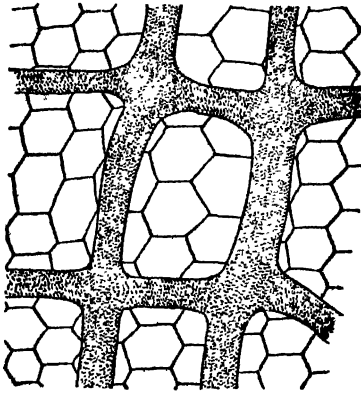
ক্ষীর নালী

(খ) **ক্ষীর কোষ (Latex cell)**—এরা এককোষী ও প্রাথমিক ভাজক কলা হতে উৎপন্ন হয়। এই সজীব কোষগুলি বড় হলে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং শাখা-প্রশাখাগুলি এই প্রকার অন্য কোষের শাখা-প্রশাখার সংস্পর্শে এলেও কখনো যুক্ত হয় না। এই কোষ হতে বহু-প্রকার জৈব রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এদের সাধারণতঃ বট, আকন্দ, অশ্বত্থ, পিপুল, পেঁপে প্রভৃতি গাছে দেখা যায়।
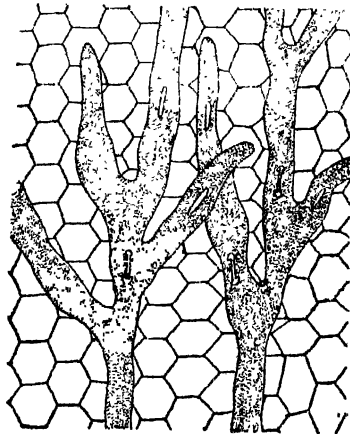
ক্ষীর কোষ

বিভিন্ন কলার ছক
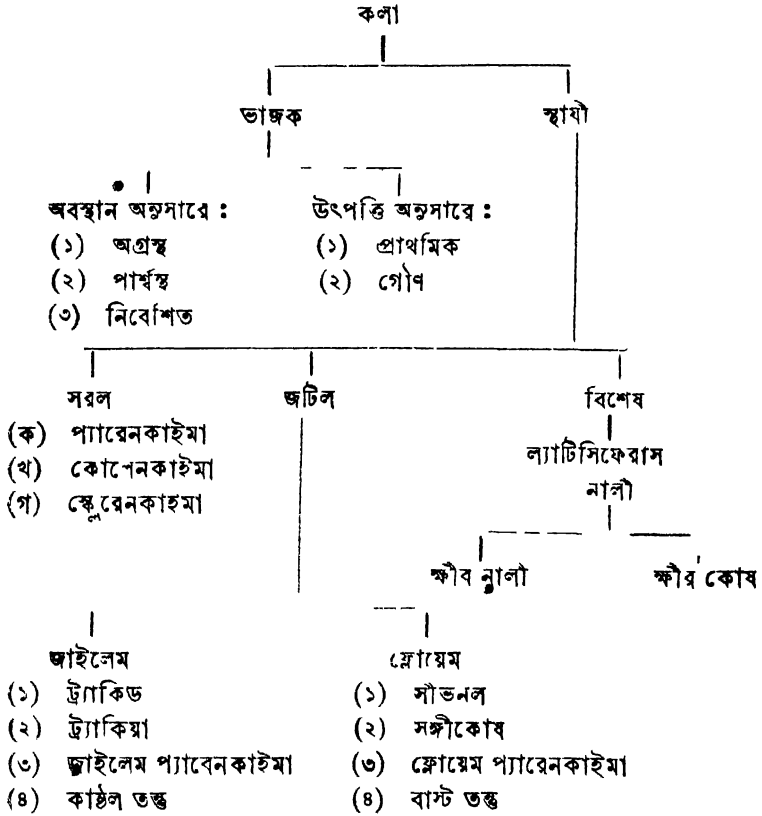
Exercise (অনুশীলনী)

1. Define Tissue. How does Meristematic tissue differ from the Permanent one ? Give an account of Meristematic tissue.

[কলার সংজ্ঞা দাও। ভাজক ও স্থায়ী কলার প্রভেদ কী ? ভাজক কলার একটি বিবরণ দাও।]

2. Describe different kinds of Permanent tissue with the functions they carry on.

[কার্যসহ বিভিন্ন প্রকার স্থায়ী কলা বর্ণনা কর।]

3. What are Complex tissues ? How do they differ from Simple tissues ? State the structures and functions of Complex tissues.

[জটিল কলা কাকে বলে ? এদের সাথে সরল কলার পার্থক্য কী ? জটিল কলার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।]

4. Write notes on :—(a) Laticiferous duct, (b) Trachea, (c) Sieve-plate, (d) Companion cell, (e) Mechanical tissue, (f) Latex.

[টীকা লেখ ঃ—(ক) ল্যাটিসিফেরাস নালী, (খ) ট্র্যাকিয়া, (গ) সীভ-প্লেট, (ঘ) সঙ্গীকোষ, (ঙ) যান্ত্রিক কলা, (চ) তরুক্ষীর।]

———

৬

কলা-তন্ত্র

(The Tissue System)

কলা নানান প্রকারের হয়। উদ্ভিদ-দেহের সমস্ত কলাকে মোটামুটি তিনটি তন্ত্রে বিভক্ত করা যায়—

(ক) **ত্বক কলা-তন্ত্র** (Epidermal Tissue System)

(খ) **আদিকলা-তন্ত্র** (Fundamental or Ground Tissue System)

(গ) **শিরাত্মক কলা-তন্ত্র** (Vascular Tissue System)

ত্বক কলা-তন্ত্র (Epidermal Tissue System)—এই কলা-তন্ত্রের মধ্যে একটি মাত্র কলাই আছে। তাকে ত্বক বা **এপিডারমিস** (Epidermis) বলে। সাধারণতঃ কাণ্ড ও পাতার ত্বককেই এপিডারমিস বলে। কিন্তু মূলের ত্বককে আবার **এপিব্লেমা** (Epiblema) বলে। এই কলা উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার সর্বাপেক্ষা বাইরের রক্ষণ-স্তর। স্তরটি একটি মাত্র কোষস্তর-বিশিষ্ট ও প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। কোন কোন গাছের পাতায় যেমন বট বা অর্কিডের মূলে ত্বক বহুস্তরবিশিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত হয়। এদের কোষগুলির মাঝে মাঝে কোন **কোষান্তর রন্ধ্র** (Intercellular space) নেই। কোষের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওল বিদ্যমান এবং এর চারপাশে সাইটোপ্লাজম **প্রাইমোরডিয়াল ইউট্রিকল** (Primordial utricle) আকারে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ত্বকের বাইরের দিকে **কিউটিকল** (Cuticle) থাকে। কাণ্ড ও পাতার ত্বক হতে কখনো কখনো **উপাঙ্গ** বের হয়। নানাবিধ উপাঙ্গের মধ্যে **দংশন রোম** (Stinging hair) এবং **গ্রন্থিরোম** (Glandular hair) প্রধান। কাণ্ডের ত্বক হতে বহুকোষী রোম এবং মূলের ত্বকের কোষ হতে এককোষী রোম উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদের কাণ্ডের ত্বক ও পত্রের ত্বকে বহু রন্ধ্র আছে। এইগুলিকে **পত্ররন্ধ্র** বা **স্টোমাটা** (Stomata) বলে। ত্বকের প্যারেনকাইমা কোষ পরিবর্তিত হয়েই পত্ররন্ধ্র উৎপন্ন করে। প্রতিটি স্টোমা (Stoma) বা পত্ররন্ধ্রের মাঝখানে

একটি ছিদ্র (Stomatal opening) থাকে ; তার দু'পাশে অর্ধচন্দ্রাকার দু'টি কোষ থাকে—তাদেরকে প্রহরী কোষ বা গার্ড সেল (Guard cell) বলে। এই প্রহরী কোষে নিউক্লিয়াস, প্লাসটিড ও শ্বেতসার কণা থাকে। একটি প্যারেন-কাইমা কোষ লম্বালম্বি-ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়েই পরিশেষে একজোড়া প্রহরী কোষে রূপান্তরিত হয়। অপত্য কোষ দু'টি প্রহরী কোষে রূপান্তরিত হবার ঠিক পূর্বে তাদের মধ্যপ্রাচীর লম্বালম্বি ভাবে চিরিয়া স্টোমাটাল ছিদ্র (Stomatal opening) সৃষ্টি করে। প্রায় প্রত্যেক পত্ররন্ধ্রের ঠিক ভেতরেই একটি বায়ুপূর্ণ স্থান বা বাতবকাশ (air cavity) থাকে, তাকে **পত্ররন্ধ্র গহ্বর** (Sub Stomatal Chamber) বা **শ্বাস গহ্বর** (Respiratory
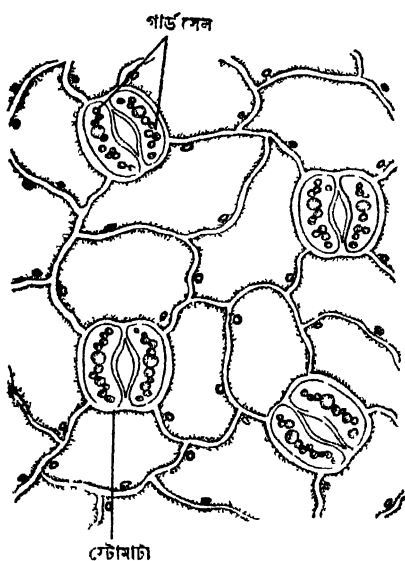
পুঁইপাতার নিম্নস্থ ত্বকের স্টোমাটা
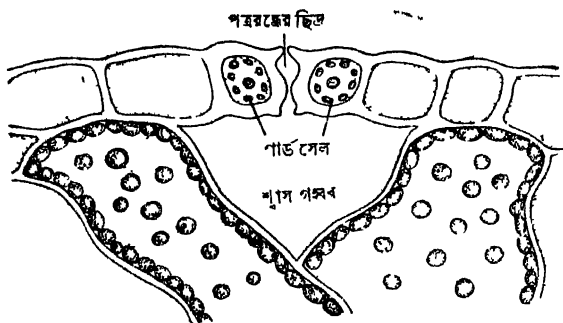
একটি ছেদিত স্টোমার চিত্ররূপ

cavity) বলে। প্রহরী কোষের প্রাচীর প্রসারণশীল সেলুলোজ দ্বারা তৈয়ারী। প্রহরী কোষের প্রাচীরের যে অংশটি রন্ধ্রের দিকে অবস্থিত তা স্থূল ও এর

বিপরীত অংশটি পাতলা ও প্রসারণশীল। প্রহরী কোষ রসের দ্বারা পূর্ণ হলে ছিদ্রের মুখ খুলে যায় তখন বাইরের গ্যাসের সাথে কলার মধ্যস্থিত গ্যাসের বিনিময় হয়। এর পর রসস্ফীতি ক'মে গেলে পত্ররন্ধ্রের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। বিষম পৃষ্ঠ পত্রের (Dorsiventral leaf) তলার দিকে পত্ররন্ধ্র বেশী পরিমাণে থাকে। আর সমাঙ্ক পৃষ্ঠ পত্রের (Isobilateral leaf) দুই তলে মোটামুটি সমান সংখ্যক পত্ররন্ধ্র থাকে। ত্বকের কোষপ্রাচীর কিউটিন্‌যুক্ত হলে বাষ্পমোচনের সময় জল-নিষ্কাশন প্রতিরোধ করে। সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) ও শ্বাসকার্যের (Respiration) সময় বায়ু ও উদ্ভিদের কলা-মধ্যস্থিত গ্যাসের বিনিময় করাই পত্ররন্ধ্রের প্রধান কাজ। এছাড়া প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন (Transpiration) প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-দেহের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বের করাও এর অন্যতম কাজ।

আদি কলা-তন্ত্র (Fundamental Tissue System) :—এই প্রকার কলা-তন্ত্র উদ্ভিদ-দেহের অধিকাংশ অংশে বিদ্যমান। এতে বিভিন্ন রকমের কলা দেখা যায়। এটি ত্বকের পর হতে উদ্ভিদ দেহের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কলা-তন্ত্র প্রধানতঃ প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। এছাড়া এতে কোলেন-কাইমা, স্ক্লেরেনকাইমা কলাও আছে। অধঃত্বক (Hypodermis), সাধারণ বহির্মজ্জা (General Cortex), অন্তস্ত্বক (Endodermis) বা শ্বেতসার স্তর (Starch Sheath), পরিচক্র (Pericycle), মজ্জারশ্মি (Medullary rays or Pith-rays) ও মজ্জা (Pith)—এই কলাগুলি আদি কলা-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

একবীজপত্রী মূলের কেন্দ্রে ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অন্তস্ত্বক পরিবেষ্টিত অংশকে **স্টেলি** (Stele) বা **কেন্দ্রস্তম্ভ** বলে। এই স্টেলির বাইরের অংশকে **বহিঃস্টেলীয়** (**Extra-stelar**) অংশ বলে। এতে অধস্ত্বক (শুধু কাণ্ডে), সাধারণ বহির্মজ্জা, অন্তস্ত্বক কলা অবস্থিত। পেরিসাইক্‌ল বা পরিচক্র (শুধু মূলে), মজ্জারশ্মি ও মজ্জা **অন্তঃস্টেলীয়** (**Intra-stelar**) অংশে অবস্থিত।

পত্রে আদি কলাকে মেসোফিল (Mesophyll) বলে। এতে দু'রকমের প্যারেনকাইমা কোষ আছে—

(১) **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা (Palisade Parenchyma)**

(২) **স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা (Spongy Parenchyma)**

উদ্ভিদের দেহ দৃঢ় করা, খাদ্য সঞ্চয় করা ও জল সঞ্চয় করা আদি কলাতন্ত্রের প্রধান কাজ।

শিরাত্মক কলাতন্ত্র (Vascular Tissue System)—**জাইলেম (Xylem)** ও **ফ্লোয়েম (Phloem)** কলাসমষ্টিকে একসঙ্গে **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundle) বলে। আর এই শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলিই গঠন করেছে **শিরাত্মক কলাতন্ত্র** (Vascular Tissue System)। আদি ভাজক কলার **প্রোক্যামবিয়ামের** সরু ও লম্বা জীবন্ত কোষগুলি বিভক্ত হ'য়ে ওপরে ফ্লোয়েম এবং নীচে জাইলেম কলা উৎপন্ন করে। দ্বিবীজপত্রী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কাণ্ডের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝখানে দু-তিন স্তর **ক্যামবিয়াম (Cambium)** নামক লম্বা লম্বা ও সরু সরু কোষ থাকে। এইজন্য এইপ্রকার শিরাত্মক কলাসমষ্টিকে **মুক্ত (Open)** বলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের শিরাত্মক কলাসমষ্টিতে ক্যামবিয়াম না থাকায় একে **বদ্ধ (Closed)** শিরাত্মক কলাসমষ্টি বলে।

উৎপত্তির দিক থেকে যে জাইলেম ও ফ্লোয়েম সব থেকে পুরাতন, তাদেরকে যথাক্রমে **প্রোটোজাইলেম (Protoxylem)** ও **প্রোটোফ্লোয়েম (Protophloem)** বলে। পরে যে জাইলেম ও ফ্লোয়েম প্রস্তুত হয়, তাদেরকে যথাক্রমে **মেটাজাইলেম (Metaxylem), মেটাফ্লোয়েম (Metaphloem)** বলে। প্রোটোজাইলেমের নলগুলি সরু ও লম্বা আর এদের প্রাচীরগুলি হয় বলয়াকার ও সর্পিলাকার। মেটাজাইলেমের নলগুলি স্থূল এবং প্রাচীরগুলি জালকাকার ও কূপযুক্ত। প্রোটোফ্লোয়েমের কোষগুলি সাধারণতঃ প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। মেটাফ্লোয়েমে কিন্তু সীভ্‌নল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও বাস্ট তন্তু থাকে।

শিরাত্মক কলাসমষ্টির মধ্যে ফ্লোয়েম ও জাইলেমের অবস্থান অনুসারে শিরাত্মক কলাসমষ্টিকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **সংযুক্ত (Conjoint)** ও (২) **অরীয় (Radial)**।

সংযুক্ত (Conjoint)—এতে ফ্লোয়েম ও জাইলেম কলা এক সাথে যুক্ত হয়ে **কলাসমষ্টি (bundle)** গঠন করে। সংযুক্ত শিরাত্মক কলাসমষ্টি আবার তিন প্রকার—

(ক) **সমপার্শ্বীয় (Collateral)**—যখন জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলাসমষ্টি একই রেখার ওপর থাকে এবং ফ্লোয়েম বাইরের দিকে আর জাইলেম

ভেতরের দিকে থাকে, তখন তাকে সমপার্শ্বীয় শিরাত্মক কলাসমষ্টি বলে। যখন ক্যামবিয়াম কলা জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলাকে পৃথক ক'রে রাখে তখন তাকে
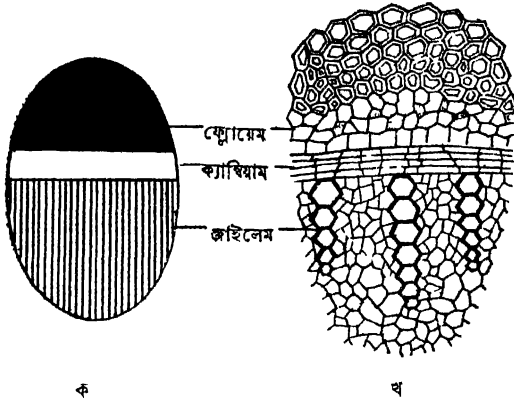
সমপার্শ্বীয় মুক্ত শিরাত্মক কলাসমষ্টি—(ক) রেখাচিত্র, (খ) প্রকৃত চিত্র

সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় মুক্ত (Conjoint Collateral open) শিরাত্মক কলাসমষ্টি বলে। যেমন ব্যক্তবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে দেখা যায়। যখন ফ্লোয়েম ও জাইলেম কলার মাঝখানে ক্যামবিয়াম কলা থাকে না তখন
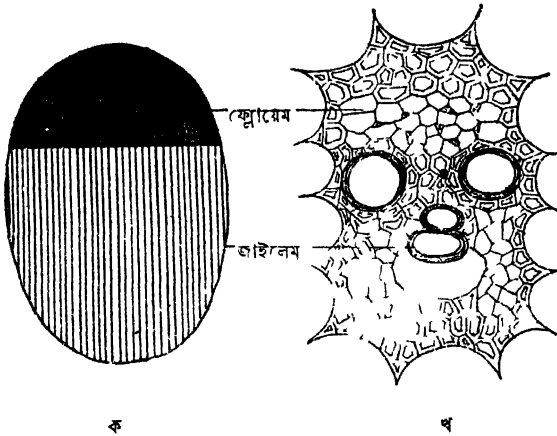
সমপার্শ্বীয় বদ্ধ শিরাত্মক কলাসমষ্টি—(ক) রেখাচিত্র, (খ) প্রকৃত চিত্র

তাকে **সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় বদ্ধ** (Conjoint Collateral closed) শিরাত্মক কলাসমষ্টি বলে। যেমন একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে দেখা যায়।

(খ) সমদ্বিপার্শ্বীয় (Bicollateral)—এইরূপ সংযুক্ত শিরাত্মক কলাসমষ্টির মাঝখানে থাকে জাইলেম এবং এর বাইরে ও ভেতরে উভয় পার্শ্বেই থাকে যথাক্রমে বাইরের ক্যামবিয়াম ও ভেতরের ক্যামবিয়াম আর তার পরে
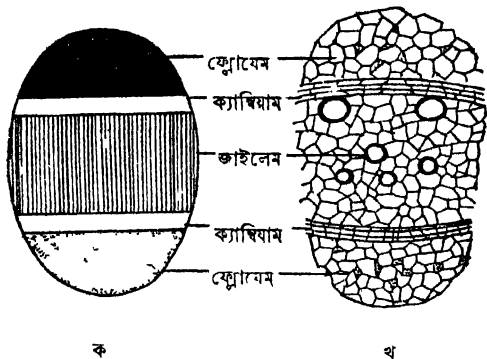
সমদ্বিপার্শ্বীয় শিরাত্মক কলাসমষ্টি (ক) রেখাচিত্র ; (খ) প্রকৃত চিত্র

উভয় পার্শ্বেই থাকে ফ্লোয়েম—বাইরের ফ্লোয়েম ও ভেতরের ফ্লোয়েম। কুমড়ো, লাউ ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ডে এইরূপ কলাসমষ্টি দেখা যায়।

(গ) সমকেন্দ্রীয় (Concentric)—এই প্রকার শিরাত্মক কলাসমষ্টিতে হয় ফ্লোয়েম কলা জাইলেম কলাকে বৃত্তাকারে ঘিরে থাকে অথবা ফ্লোয়েম কলা কেন্দ্রে থাকে আর জাইলেম কলা একে বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন ক'রে রাখে। যখন জাইলেম কলা কেন্দ্র মধ্যে ও ফ্লোয়েম কলা বৃত্তাকারে বাইরে থাকে, তাকে
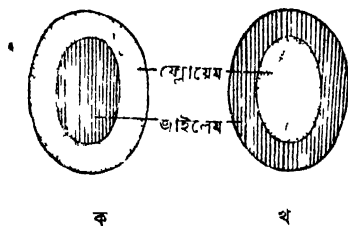
সমকেন্দ্রীয় শিরাত্মক কলাসমষ্টি—(ক) হ্যাড্রোকেন্দ্রীয়, (খ) লেপ্টোকেন্দ্রীয়

হ্যাড্রোকেন্দ্রীয় (Hadrocentric) বলে। ফার্ন গাছের কাণ্ডে এই রকমটি দেখা যায়। আবার যখন ফ্লোয়েম কেন্দ্রের ভেতর ও জাইলেম বৃত্তাকারে বাইরে থাকে, তাকে **লেপ্টোকেন্দ্রীয়** (Leptocentric) বলে। ড্রাসিনা নামক উদ্ভিদের কাণ্ডে এই রকমটি দেখা যায়।

অরীয় (Radial)—এই প্রকার কলাসমষ্টিতে জাইলেম ও ফ্লোয়েম একসঙ্গে যুক্তাকারে থাকে না। এখানে জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা পৃথক পৃথক ভাবে গঠিত হ'য়ে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ একটির পর অপরটি বলয়াকারে সজ্জিত

ক খ
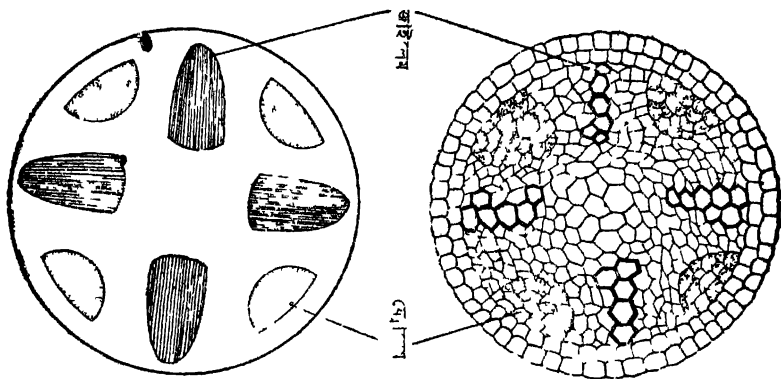
অরীয় শিবাত্মক কলাসমষ্টি—(ক) রেখাচিত্র, (খ) প্রকৃত চিত্র

থাকে। মূলের স্টেলের (Stele) মধ্যে এদেরকে পর্য্যায়ক্রমে সাজানো দেখা যায়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার প্রত্যেকটি সংখ্যায় সাধারণতঃ চারের বেশী হয় না, কিন্তু একবীজ পত্রী উদ্ভিদের মূলে এই সংখ্যা আরও বেশী হয়।

কলা তন্ত্রের ছক

Exercise (অনুশীলনী)

1. Put a definition to Tissue System. Describe various types of Tissue System in plants.
   [কলা-তন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। বিভিন্ন প্রকার কলা-তন্ত্রের বর্ণনা দাও।]

2. What are Stomata? State the Origin, Structure and Functions of Stomata.
   [পত্ররন্ধ্র কাকে বলে? পত্ররন্ধ্রের উৎপত্তি, গঠন ও কার্যসমূহের বিবরণ দাও।]

3. What is Vascular bundle? What are its functions? Describe different kinds of Vascular bundle.
   [শিরাত্মক কলাসমষ্টি কাকে বলে? এর কাজ কী? বিভিন্ন প্রকার শিরাত্মক কলাসমষ্টি বর্ণনা কর।]

৭

মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রাথমিক অন্তর্গঠন

(Primary Internal Structures of Root, Stem & Leaf)

মূল, কাণ্ড ও পাতার আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধীয় অংশ জীব-বিজ্ঞানের **হিষ্টোলজির** (Histology) অন্তর্ভুক্ত। যদি এই সকল অংশের সূক্ষ্ম ও পাতলা **প্রস্থচ্ছেদ** (Transverse section) নিয়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে নিরীক্ষণ করা যায়, তাহলে এদেব আভ্যন্তরীণ গঠন পরিষ্কার বোঝা যায়।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অন্তর্গঠন :

(Internal Structure of a Dicotyledonous Stem)

সূর্যমুখী গাছের একটি কচি কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেব সাহায্যে পরীক্ষা কবলে কাণ্ডের বাইরের দিক হ'তে ভেতর পর্যন্ত নিম্নলিখিত কলাগুলিকে সজ্জিত দেখা যায়—
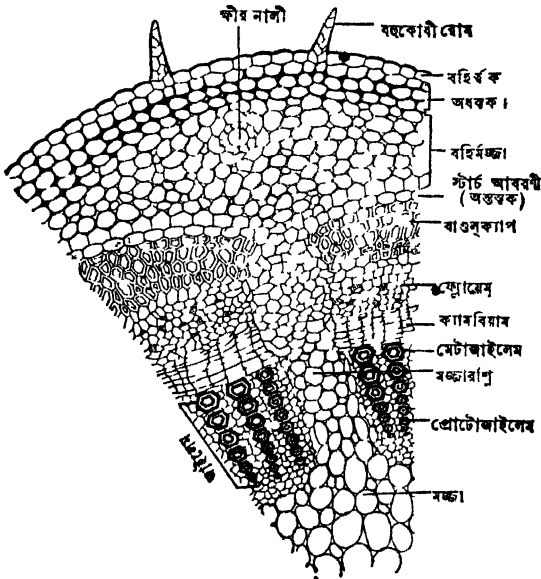
সূর্যমুখী কাণ্ডের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

১। **বহিত্বক বা এপিডারমিস** (Epidermis):—এটি সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তর ও একটি মাত্র কোষস্তর দ্বারা গঠিত। কোষগুলি পরস্পর পাশাপাশি সংবদ্ধ—সুতরাং কোন **কোষান্তর রন্ধ্র** (intercellular space) থাকে না। কোষগুলি পিপের ন্যায় ও প্যারেনকাইমাজাতীয় এবং ক্লোরোপ্লাষ্ট-যুক্ত। বহির্ত্বকটির একেবারে বাইরের দিকে একটি সুস্পষ্ট কিউটিকল (Cuticle) থাকে। বহির্ত্বকের স্থানে স্থানে বাইরের দিকে প্রসারিত বহুকোষী রোম দেখা যায়। কখনো কখনো পত্ররন্ধ্রও থাকে।

২। **বহির্মজ্জা বা কর্টেক্স** (Cortex):—বহিত্বকের পরেই এর অবস্থান ও এটি নিম্নলিখিত তিনটি কলাদ্বারা গঠিত—

(ক) **অধস্ত্বক বা হাইপোডারমিস** (Hypodermis)—এটি বহির্ত্বকের ঠিক ভেতরের দিকে অবস্থিত ও কয়েক সারি সজীব কোলেনকাইমা (Collenchyma) কোষদ্বারা গঠিত—এই কোষগুলিতেও ক্লোরোপ্লাসটিড দেখা যায়।

(খ) **সাধারণ বহির্মজ্জা বা জেনারেল কর্টেক্স** (General Cortex) —বহুস্তর বিশিষ্ট বড় ও গোলাকার প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা এই অঞ্চল গঠিত। এখানে অনেক কোষান্তর রন্ধ্র দেখা যায়। স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ক্ষীর নালীর (Latex vessel) প্রস্থচ্ছেদ দেখা যায়—প্রতিটি নালীকে ঘিরে কয়েকটি ছোট ছোট কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট সজীব কোষ থাকে।

(গ) **অন্তস্ত্বক বা এন্‌ডোডারমিস বা শ্বেতসারস্তর** (Endodermis or Starch Sheath)—এটি বহির্মজ্জার সবাপেক্ষা ভেতরের স্তর ও একটি কোষস্তর দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলিও পিপের মত ও একে অপরের সহিত পাশাপাশি সংবদ্ধ—সুতরাং এখানেও কোষান্তর রন্ধ্র নেই। কোষগুলিতে প্রচুর শ্বেতসার কণা থাকে ব'লে এই স্তরটিকে শ্বেতসার স্তর বলে।

৩। **কেন্দ্রস্তম্ভ বা স্টেলি** (Stele):—অন্তস্ত্বক দ্বারা পরিবেষ্টিত ভেতরের অংশকেই কেন্দ্রস্তম্ভ বা স্টেলি বলে। নিম্নলিখিত কলা এতে দেখা যায়—

(ক) **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundles)—স্টেলির পরিধিতে শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলি একটি বলয়াকারে সজ্জিত থাকে। প্রত্যেক শিরাত্মক কলাসমষ্টির মাথায় বা বাইরের দিকে স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু সমষ্টি আছে। একে **কলাসমষ্টির টুপি বা বাণ্ডল্ ক্যাপ** (bundle cap)

বা হার্ড বাস্ট (hard bast) বলে। এর নীচে সীভ্ নল, সঙ্গীকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত ফ্লোয়েম (phloem) কলা রয়েছে। ফ্লোয়েম কলার নীচে সরু সরু আয়তক্ষেত্রের মত কোষ আছে—এইগুলি ভাজক কলার অন্তর্গত **ক্যামবিয়াম** কলা। ক্যামবিয়াম কলার ভেতরদিকে **জাইলেম** (Xylem) কলা বিদ্যমান। প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের দিকে ও মেটাজাইলেম পরিধির দিকে অবস্থিত। জাইলেম কলা ট্র্যাকিয়া, ট্র্যাকিড, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও কাষ্ঠল তন্তু দ্বারা গঠিত।

(খ) **মজ্জারশ্মি** (Medullary rays)—শিরাত্মক কলাসমষ্টিগুলির অন্তর্বর্তী ফাঁকা সরু সরু জায়গাগুলিতে মজ্জারশ্মিগুলির অবস্থান। এইগুলি লম্বা লম্বা প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

(গ) **মজ্জা** (Pith or medulla)—এটি কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ স্টেলির ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই কলা সাধারণ পাতলা প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত—স্থানে স্থানে কোষান্তর রন্ধ্র দেখা যায়।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অন্তর্গঠন :

(Internal Structure of a Monocotyledonous Stem)

কচি ভুট্টাকাণ্ডের একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত কলাগুলি দেখা যায়—

১। **বহিস্ত্বক** (Epidermis) :—পাশাপাশি সংবদ্ধ একসারি পিপের ন্যায় কোষ দ্বারা এই স্তর গঠিত। কোষগুলি সজীব ও ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত। বহিস্ত্বকে পত্ররন্ধ্র, কিউটিকল প্রভৃতি দেখা যায়, কিন্তু রোম থাকে না।

২। **অধস্ত্বক** (Hypodermis) :—বহিস্ত্বকের ঠিক ভেতরের দিকেই এক বা দু' সারিতে সজ্জিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষ অধস্ত্বক গঠন করেছে। কাণ্ডকে দৃঢ়তা প্রদানে এটি সাহায্য করে।

৩। **আদি কলা** (Ground tissue) :—অধস্ত্বকের ঠিক ভেতরের দিক থেকে আরম্ভ করে কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত এই কলার বিস্তৃতি। এটি কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

৪। **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundles) :—এইগুলি সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় বদ্ধ শ্রেণীর কলাসমষ্টি। এরা সংখ্যায় অনেক ও আদি কলার স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত (Scattered) থাকে। পরিধির দিকে এদের সংখ্যা বেশী কিন্তু

আকার ছোট। কেন্দ্রের দিকে এদের সংখ্যা কম কিন্তু আকার বড়। প্রত্যেকটি শিরাত্মক কলাসমষ্টির চারপাশে স্ক্লেরেনকাইমা কোষের কলা দেখা যায়—একে কলাসমষ্টির আবরণী (bundle sheath) বলে। জাইলেম কলা ইংরাজীর 'Y' বর্ণের মত সাজানো থাকে। 'Y'-এর দু'বাহুতে দু'টি বড় মেটাজাইলেম নালিকা
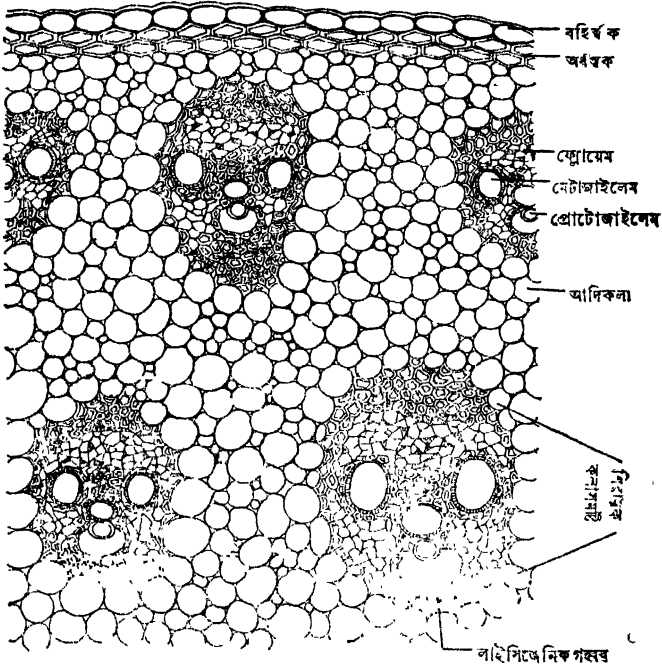
ভুট্টা কাণ্ডের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

ও এর দণ্ডের ওপর ছোট প্রোটোজাইলেম থাকে। প্রোটোজাইলেমের ঠিক নীচে একটি বড় সুস্পষ্ট কক্ষ থাকে তাকে লাইসিজেনিক গহ্বর (Lysigenic cavity) বলে। 'Y'এর দু'বাহুর মধ্যস্থলের ফাঁকা অংশে ফ্লোয়েম কলা অবস্থিত।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের অন্তর্গঠন :

(Internal Structure of a Dicotyledonous Root)

ছোলা গাছের কচি মূলের একটি পাতলা প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত কলাগুলি দেখা যায়—

১। **বহিস্ত্বক বা এপিব্লেমা (Epiblema)** :—সর্বাপেক্ষা বাইরের এক-কোষস্তরবিশিষ্ট অঞ্চলকেই এপিব্লেমা বলে। পাশাপাশি সংবদ্ধ পাতলা প্যারেন-

ছোলামূলের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ
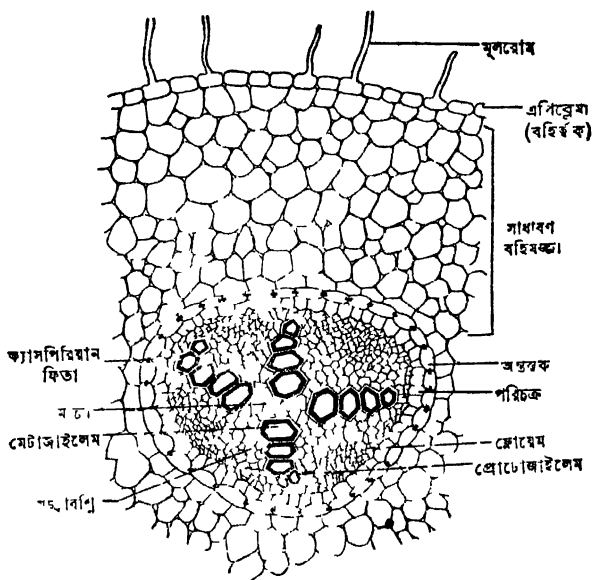
কাইমা কোষদ্বারা এই স্তর গঠিত। স্থানে স্থানে কয়েকটি কোষ লম্বা এককোষী রোমে রূপান্তরিত হয়েছে সেইজন্য একে রোমবহস্তরও (Piliferous layer) বলে

২। **বাহ্যমজ্জা (Cortex)** :—এটি বহুসংখ্যক কোষস্তর দ্বারা গঠিত। কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ এই কলা গঠন করেছে। কোষগুলিতে প্রচুর **লিউকোপ্লাসটিড** থাকে। এর সর্বাপেক্ষা ভেতরের স্তরটি কোষান্তর রন্ধ্রবিহীন একটি **অন্তস্ত্বক** (Endodermis) গঠন করেছে। অন্তস্ত্বকের কোষগুলির পার্শ্ব-প্রাচীরে ফিতের মত স্থূলীকরণ দেখা যায়। এই ফিতেকে **ক্যাসপেরিয়ান ফিতে** (**Casparian strips**) বলে।

দ্বিবীজপত্রী মূলের অন্তস্ত্বকের ক্যাসপেরিয়ান ষ্ট্রিপস
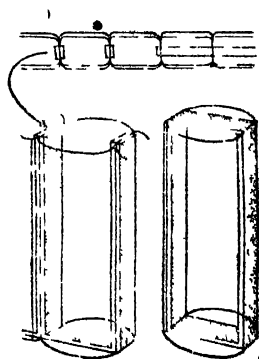
৩। **স্টেলি (Stele)** :—অন্তস্ত্বক দ্বারা পরিবেষ্টিত মূলের কেন্দ্রীয় অংশকে স্টেলি বলে। এতে নিম্নলিখিত কলাগুলি বিদ্যমান—

(ক) পেরিসাইক্ল বা পরিচক্র (Pericycle)—এটি স্টেলির সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তর ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত।

(খ) শিরাত্মক কলাসমষ্টি (Vascular bundles)—সংখ্যায় সাধারণতঃ চারের বেশী হয় না। জাইলেম ও ফ্লোয়েম পৃথক পৃথক ভাবে পর্য্যায়ক্রমে বলয়াকারে সজ্জিত থাকে। প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে ও মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত।

(গ) মজ্জা (Pith)—স্টেলির মধ্যস্থলের প্যারেনকাইমা কোষ গঠিত কলাকে মজ্জা বলে। উদ্ভিদের বয়োপ্রাপ্তির সংগে সংগে জাইলেম কলার বৃদ্ধির ফলে মজ্জা অদৃশ্য হয় অথবা এর পরিসর খুব ছোট হ'য়ে যায়।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের অন্তর্গঠন :

(Internal Structure of a Monocot Root)

একটি কচি ভুট্টামূলের সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় নিরীক্ষণ করলে নিম্নলিখিত কলাগুলি দেখা যায়—
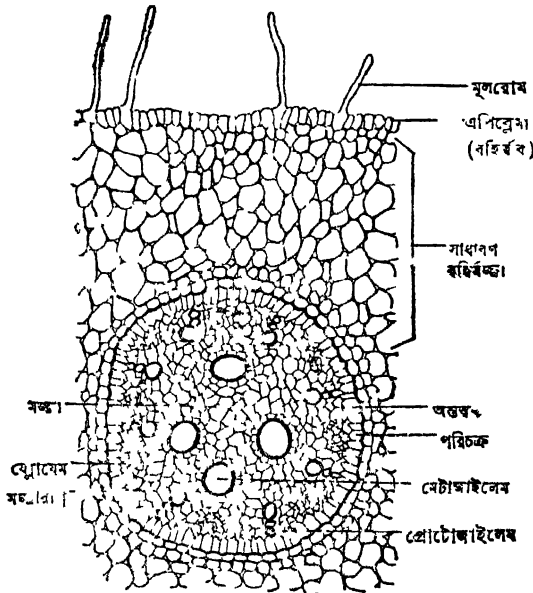
ভুট্টা মূলের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

১। **বহিস্ত্বক বা এপিব্লেমা (Epiblema)** :—এটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের ন্যায়।

২। **বহির্মজ্জা (Cortex)** :—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের ন্যায়। অন্তস্ত্বকের কোষগুলির পার্শ্বপ্রাচীরে ক্যাসপেরিয়ান ফিতে থাকে। তাছাড়া অন্তস্ত্বকের কিছু কিছু কোষের প্রাচীর পাতলা ও ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় তাদের ভেতর দিয়ে জল যাতায়াত করতে পারে। এই কোষগুলিকে পথ-কোষ বা প্যাসেজ সেল (Passage cell) বলে। এইগুলি প্রোটোজাইলেমের ঠিক বরাবর থাকে।

৩। **স্টেলি (Stele)**:—অন্তস্ত্বক দ্বারা পরিবেষ্টিত কেন্দ্রীয় অংশই স্টেলি। এটি তিন ভাগে বিভক্ত—

(ক) **পরিচক্র বা পেরিসাইক্ল** (Pericycle)—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পেরিসাইক্লের মত।

(খ) **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundles)—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মতই। কিন্তু শিরাত্মক কলাসমষ্টির সংখ্যা আরও বেশী হয়।

(গ) **মজ্জা** (Pith)—এই অংশটি একবীজপত্রী মূলে বেশ বড় ও কোষান্তর রন্ধ্রবিহীন পাতলা প্রাচীরযুক্ত বহুসংখ্যক প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। উদ্ভিদের জীবনকাল ধ'রে এই অংশ বিদ্যমান থাকে—বয়োপ্রাপ্তির সংগে সংগে অদৃশ্য হয় না।

বিষমপৃষ্ঠ পত্রের অন্তর্গঠন ঃ
(Internal Sturcture of a Dorsiventral leaf)

ভূপৃষ্ঠের সাথে সাধারণতঃ অনুভূমিকভাবে (Horizontally) বিদ্যমান থাকায় যে পাতার ওপরের (Dorsal) তল বা পৃষ্ঠ সূর্যালোক পায় ও নীচের (Ventral) তলটি সূর্যালোক পায় না এবং ফলে যে পাতার দুই তলের রঙে পার্থক্য থাকে, তাকে বিষমপৃষ্ঠ পত্র বলে। আম, কাঁঠাল, বট, করবী, কুমড়ো প্রভৃতি গাছের পাতা এই ধরণের। এইরূপ একটি পাতার সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত কলাগুলি সজ্জিত দেখা যায়—

১। **উপরিস্থ বহিস্ত্বক** (Upper epidermis) :—এটি একস্তর বিশিষ্ট সজীব পিপাকৃতি প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। স্তরটির বাইরের দিক কিউটিন (Cutin) নির্মিত কিউটিক্ল (Cuticle) যুক্ত। সাধারণতঃ এই স্তরে ক্লোরোপ্লাস্ট ও পত্ররন্ধ্র থাকে না। তবে অনেকক্ষেত্রে বহুকোষী রোম দেখা যায়।

২। **নিম্নস্থ বহিস্ত্বক (Lower epidermis)** :—এটিও একস্তর বিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং কিউটিন নির্মিত কিউটিকল যুক্ত। কিন্তু উপরিস্থ বহিস্ত্বকের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এতে প্রচুর পত্ররন্ধ্র (Stomata) থাকে। প্রতিটি পত্ররন্ধ্র (Stoma) দু'টি প্রহরী কোষ (Guard cell) দ্বারা সুরক্ষিত ও ভেতরের দিকে একটি শ্বাস-কক্ষে (Respiratory cavity) নীত হয়েছে। প্রহরী কোষগুলিতে ক্লোরোপ্লাস্ট ও শ্বেতসারকণা দেখা যায়।
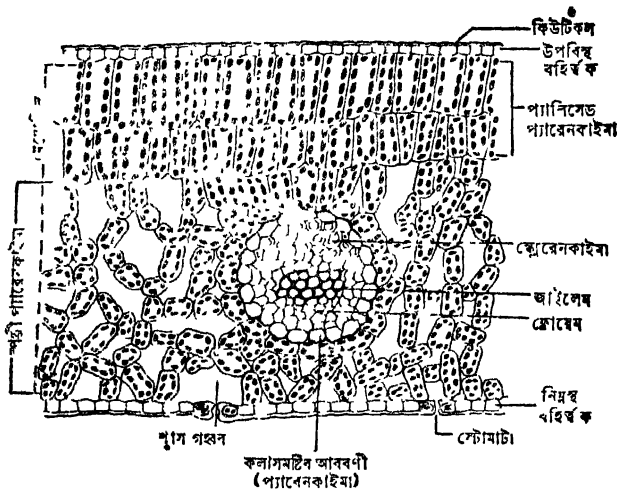
বিষমপৃষ্ঠ পত্রের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

৩। **মেসোফিল (Mesophyll)** :—এটি কয়েকটি কোষস্তরযুক্ত ও উপরিস্থ ও নিম্নস্থ বহিস্ত্বকের মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে এর অবস্থান। মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত সজীব প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। মেসোফিলের কোষগুলি দু'রকমের হওয়ায় এটি দুটি অঞ্চলে বিভক্ত।

(ক) **প্যালিসেড্ প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma)—এটি দুই অথবা ততোধিক কোষস্তরযুক্ত ও উপরিস্থ ত্বকের দিকে অবস্থিত। এই অঞ্চলের প্যারেনকাইমা কোষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট লম্বা ও স্তম্ভাকার (Columnar) এবং উপরিস্থ বহিস্ত্বকের সাথে সমকোণে অবস্থিত। কোষগুলির প্রাচীরের দিকে ক্লোরোপ্লাস্টগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে।

(খ) **স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma)—এই অঞ্চলটি নিম্নস্থ ত্বকের দিকে বিদ্যমান। কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট না হওয়ায় বহু

কোষান্তর রন্ধ্র দেখা যায়। কতকগুলি স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা কোষ প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোষের সাথে যুক্ত থাকে।

৪। **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (**Vascular bundles**):—এইগুলি সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় বদ্ধ শ্রেণীর ও মেসোফিলের কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রতিটি কলাসমষ্টির চারপাশে প্যারেনকাইমা কোষের একটি আচ্ছাদন দেখা যায়, একে **কলাসমষ্টির আবরণী** (**Bundle sheath**) বলে। প্রত্যেকটি কলাসমষ্টিতে জাইলেম কলা উপরিস্থ বহির্ত্বকের দিকে ও ফ্লোয়েম কলা এর বিপরীত দিকে অবস্থিত। জাইলেম ট্র্যাকিড, কাষ্ঠল তন্তু ও জাইলেম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত; পক্ষান্তরে ফ্লোয়েম সীভনল, সঙ্গীকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত।

সমাঙ্কপৃষ্ঠ পত্রের অন্তর্গঠন ঃ

Internal Structure of an Isobilateral Leaf)

ভূপৃষ্ঠের সাথে যে পাতা খাড়াভাবে বিদ্যমান থাকায় পাতার উভয় পৃষ্ঠই সমানভাবে সূর্যালোক পায় ও উভয় পৃষ্ঠের রঙ প্রায় একরকম হয়, তাকে সমাঙ্ক-পৃষ্ঠ পত্র বলে। খেজুর, ধান, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা এই প্রকার। মাইক্রোস্কোপে এই ধরণের পাতার একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত কলাগুলি দেখা যায়—
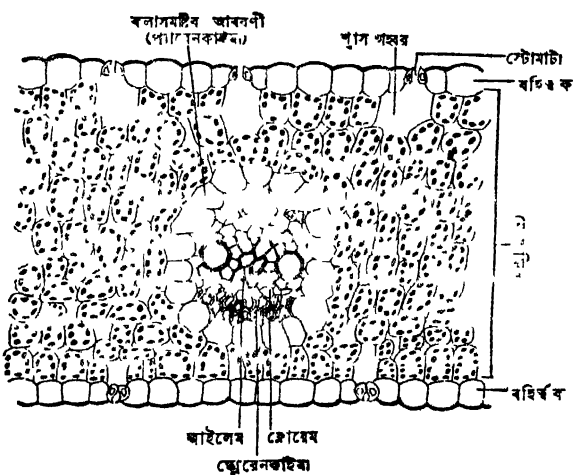
সমাংকপৃষ্ঠ পত্রের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

১। **বহিস্ত্বক** (Epidermis)—উভয়তলেই বহিস্ত্বক এক কোষস্তর বিশিষ্ট ও ক্লোরোফিলবিহীন প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। উভয় দিকের বহিস্ত্বকেই সমান সংখ্যক পত্ররন্ধ্র দেখা যায়।

২। **মেসোফিল** (Mesophyll)—দু'টি বহিস্ত্বকের মাঝখানে প্যারেনকাইমা কোষ গঠিত অঞ্চলই মেসোফিল। মেসোফিল অঞ্চলটি প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা অঞ্চলে বিভক্ত নয়। এই অঞ্চলের কোষগুলি প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত। শিরাত্মক কলাসমষ্টির দুই প্রান্তে অথবা মেসোফিলের এখানে-ওখানে কিছু স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দেখা যায়—এরা পাতাকে দৃঢ়তা প্রদানে সহায়তা করে।

৩। **শিরাত্মক কলাসমষ্টি** (Vascular bundles)—সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় বদ্ধ শ্রেণীর। গঠন ও আকারে বিষমপৃষ্ঠ পত্রের শিরাত্মক কলাসমষ্টির মতই।

Exercise (অনুশীলনী)

1. Describe the Internal structure of a Dicot stem.

[একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অন্তর্গঠনের বিবরণ দাও।]

2. How do you distinguish Transverse section of a Monocot stem from that of a Dicot stem? Describe the Internal structure of a Monocot stem.

[একবীজপত্রী উদ্ভিদ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ চিনবে কীভাবে? একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের অন্তর্গঠনের একটি বিবরণ দাও।]

3. Compare the Internal structures of Dorsiventral and Isobilateral leaves.

[বিষমপৃষ্ঠ ও সমাঙ্কপৃষ্ঠ পত্রের অন্তর্গঠনের তুলনা কর।]

4. Write notes on :—(a) Cortex, (b) Starch sheath, (c) Casparian strip, (d) Passage cell.

[টীকা লেখ :—(ক) কর্টেক্স, (খ) শ্বেতসার আবরণী, (গ) ক্যাসপেরিয়ান ফিতে, (ঘ) পথ কোষ।]

৮

ব্যবহারিক

(Practical)

ব্যবহারিক কার্য সম্বন্ধে কতিপয় নির্দেশঃ

(১) পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, এবং কার্য-পদ্ধতির ত্রুটিহীনতা সফল ব্যবহারিক কাজের প্রাথমিক প্রয়োজন।

(২) কাজ আরম্ভের পূর্বে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ধার ও উপযোগিতা পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

(৩) কাজ আরম্ভের পূর্বে সেই কাজটির কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান লাভ (অর্থাৎ কাটার পদ্ধতি, চাঁচার পদ্ধতি, রঙ্‌ করার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলি যত্নসহকারে পড়ে নেওয়া দরকার)।

(৪) কাজের শেষে যন্ত্রপাতিসমূহ ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং শুষ্ক বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা মুছে শুকিয়ে নিয়ে প্রয়োজনীয় অংশসমূহে ভেজ্‌লিন মেখে রাখা বিধেয়।

(৫) প্রতিটি ব্যবহারিক কার্যের শেষে তার ছবি এঁকে লেবেলিং (labelling) করা অবশ্য কর্তব্য—ল্যাবরেটরী নোট বুকের দৈনন্দিন প্রস্তুতি সম্পর্কে কোনপ্রকার অবহেলা অনুচিত।

প্রতিটি ছাত্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ

সমাবতল ক্ষুর (Plano-concave Razor)—১টি

ছুরি (Scalpel)—২টি (ছোট ও বড)

কাঁচি (Scissors)—২টি (ছোট ও বড়)

(বড় কাঁচিটির দুটি মুখের একটি সূচল, অপরটি ভোঁতা)

চিম্‌টে (Forceps)—২টি (ছোট ও বড)

সূচ (Needles)—২টি (একটি সোজা ; অপরটি বাঁকা)

ব্রুশ (Brush)—১টি

ওয়াচ গ্লাস (Watch glass)—২টি

স্লাইড (Slides)—৬ থেকে ১২টি

কভার স্লিপ (Cover slips)—৬ থেকে ১২টি
বস্ত্রখণ্ড—১টি
ভেজলিনের কৌটো—১টি

মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারের প্রণালী (Procedure of using a microscope)—একটি চক্চকে কাচের স্লাইডের ওপর জল বা গ্লিসারিন্ (৫%) নিয়ে উদ্ভিদ-দেহের কোন অংশের খুব পাতলা প্রস্থচ্ছেদ (Transverse section) বা দীর্ঘচ্ছেদ (Longitudinal section) তার ওপর রাখা হল। প্রয়োজনানুসারে চ্ছেদটিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যথোপযুক্ত রঙ্ (Staining) ক'রেও নেওয়া যেতে পারে। এবার একটি কভার স্লিপ্ (Cover slip) অতি সতর্কতার সঙ্গে চ্ছেদটির ওপর এমন ভাবে বসানো হল যাতে ভেতরে কোন বুদ্‌বুদ্ (Air-bubbles) না থাকে।

এখন স্লাইডটিকে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের স্টেজে বসিয়ে ক্লিপ দিয়ে এঁটে দেওয়া হল। এইবার দর্পণটিকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হল যাতে আলোক-রশ্মি স্টেজের ছিদ্রপথে স্লাইডের ওপর পড়ে। প্রয়োজনানুসারে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা দ্বারা আলোর পরিমাণ কমানো-বাড়ানো যায়।

এবার নোজপিস ঘুরিয়ে লো-পাওয়ার অবজেক্‌টিভ্‌টি দ্রষ্টব্য বস্তুর দিকে লম্বভাবে রাখা হল। এখন বাইরে থেকে দেখে স্থূল স্ক্রুর সাহায্যে বডি টিউবটি ধীরে ধীরে এমন ভাবে নামানো হল যাতে অবজেক্‌টিভ্‌টি দ্রষ্টব্য বস্তুর খুব সন্নিকট হল কিন্তু অবজেবটিভ্‌টি কভার স্লিপটি স্পর্শ করল না।

এবার আইপিসের ওপব চোখ রেখে স্থূল স্ক্রুর সাহায্যে বডি টিউবকে আস্তে আস্তে ওঠানো হ'তে থাকলো। কিছুক্ষণের মধ্যে দ্রষ্টব্য বস্তুকে বহুগুণ বিবর্ধিত আকারে দেখা যাবে। এখন সূক্ষ্ম স্ক্রুর সাহায্যে আরও যথার্থভাবে সন্নিবেশ করলে দ্রষ্টব্য বস্তুকে আরও পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে। দ্রষ্টব্য বস্তুকে আরও বর্ধিত আকারে দেখতে হ'লে নোজপিস ঘুরিয়ে হাই পাওয়ার অবজেক্‌টিভ্‌টি ঠিকমত বসাতে হবে ও সূক্ষ্ম স্ক্রুর দ্বারা অতি সতর্কতার সঙ্গে ফোকাস করতে হবে।

চ্ছেদ কর্তনের প্রণালী (Method of Cutting sections) :—কোন গাছের একখণ্ড কচি ডাঁটা নিয়ে বাম হাতে এমন ভাবে ধরা হল যাতে

বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ডাঁটাটির ভেতরের দিকে আগার কিছু নীচে ও প্রথম-দ্বিতীয় অঙ্গুলি ডাঁটাটির বাইরের দিকে ডাঁটার আগার দিকে থাকে। প্রথম অঙ্গুলির ওপরের তল যেন ডাঁটাটির ডগার প্রায় সমতলে (কিঞ্চিৎ নিম্নে) থাকে। এখন একটি তীক্ষ্ণ ধারালো সমাবতল (Plano-concave) ক্ষুরের অবতল দিকটিতে জল নিয়ে সমতল দিকটি প্রথম অঙ্গুলির ওপর সমান্তরাল ভাবে রাখা হল। ক্ষুরের ধারালো ধারটি রাখা হল ভেতরে অর্থাৎ ডাঁটার দিকে। এখন ক্ষুরটিকে অনুভূমিক ভাবে (Horizontally) চালনা ক'রে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ নেওয়া হল ও ওয়াচ্ গ্লাসের জলে রাখা হল। এবার একটি ভাল প্রস্থচ্ছেদ বেছে নিয়ে জল বা গ্লিসারিন সহযোগে স্লাইডে রেখে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে নিরীক্ষণ করলে কোষ ও কলার বিন্যাস দেখা যাবে।
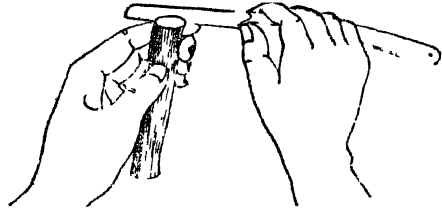
ছেদ কর্তনের প্রণালী

চাঁচার প্রণালী (Method of Scraping) :—একটি টাটকা আলু পরিষ্কার ভাবে ধুয়ে কেটে তা থেকে ছুরির (scalpel) ধারালো ধারের সাহায্যে কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করলে (চাঁচলে) একপ্রকার সাদা রস বের হবে। এক বিন্দু সাদা রস জলসহ স্লাইডের ওপর রেখে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলে বিভিন্ন মাপের ও বিভিন্ন প্রকার **শ্বেতসার কণা** (Starch grains) দেখা যাবে। জলীয় আয়োডিন দিলে কণিকাগুলি নীল বর্ণ ধারণ করবে।

(ছবি ৫০ পৃঃ)

ত্বক উন্মোচনের প্রণালী (Method of stripping off)—একটি পেঁয়াজের অন্তঃস্থিত একটি শল্কপত্র নিয়ে এর ভেতরের দিক হতে বহিস্ত্বকটি একটি ছুরির সাহায্যে উন্মোচিত করা হল। এর একাংশ ছোট ক'রে কেটে নিয়ে ওয়াচ্ গ্লাসের জলে রেখে তাতে কয়েক ফোঁটা জলীয় ইওসিন (Eosin) দেওয়া হল। দু'তিন মিনিট বাদে উন্মোচিত অংশটি একটি পরিষ্কার স্লাইডের ওপর গ্লিসারিন সহযোগে রেখে কভার স্লিপে ঢাকা হল। এক টুকরো ব্লটিং পেপারের সাহায্যে কভার স্লিপের বাইরের গ্লিসারিন শোষণ ক'রে নেওয়া হল। এইবার স্লাইডটি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করলে কোষান্তর

রন্ধ্র বিহীন বড় বড় আয়তাকার কোষ দেখা যাবে। প্রতিটি কোষে দানাদার প্রোটোপ্লাজম, অনেক ভ্যাকুওল ও একটি নিউক্লিয়াস দেখা যাবে। (ছবি ৩৮ পৃঃ)

এইভাবে কোন অনুভূমিক (Horizontal) পাতার (পুঁই পাতা) তলদেশ হতে বহিত্ব'ক উন্মোচিত করে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলে দুটি রক্ষীকোষের (Guard cells) মাঝে মাঝে পত্ররন্ধ্র (Stomata) দেখা যাবে। (ছবি ৭৮ পৃঃ)

প্রোটোপ্লাজমের গতি (Movements of Protoplasm) :

প্রবাহ গতি (Rotation)—পাতা শ্যাওলার (Vallisneria) একটি দীর্ঘচ্ছেদ নিয়ে জলসমেত মাইক্রোস্কোপে রেখে হাই পাওয়ার অবজেকটিভে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে একটি বড় ভ্যাকুওলকে কেন্দ্র ক'রে প্রতিটি কোষের কোষপ্রাচীর সংলগ্ন প্রোটোপ্লাজম একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রোটোপ্লাজমে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট ও একদিকে একটি বড় নিউক্লিয়াস দেখা যায়। (ছবি ৪৩ পৃঃ)

আবর্ত গতি (Circulation) :—ট্র্যাডেস্‌ক্যান্‌সিয়া (Tradescantia) অথবা জটাকানশিরা (Commelina obliqua) গাছের ফুলের কয়েকটি পুংকেশ দণ্ড নিয়ে একটি স্লাইডের ওপর যথাযথভাবে রেখে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এর প্রতিটি কোষের প্রোটোপ্লাজম অনেকগুলি ভ্যাকুওলকে কেন্দ্র ক'রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আবর্তিত হচ্ছে। (ছবি ৪৪ পৃঃ)

কোষের অন্তর্গত নির্জীব বস্তু (Non-living inclusions of cells.) :

শ্বেতসার কণা—পূর্বেই বলা হয়েছে।

শর্করা—একটি টেষ্টটিউবে কিছু পরিমাণ পাতিত জলে কিছু গ্লুকোজ নেওয়া হল। এখন এতে তরল কপার সালফেট (Copper sulphate) ও কষ্টিক পটাশ (Caustic potash) মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে দ্রবণটি নীল হতে প্রথমে সবুজ, পরে হলুদ ও পরিশেষে লোহিত বর্ণে রূপান্তরিত হবে।

অপরপক্ষে ইক্ষু শর্করা বা চিনি নিয়ে এই প্রকার পরীক্ষা করলে তা নীলাভ হবে।

প্রটিড অথবা অ্যালিউরোণ কণা—রেড়ি বীজের সস্যের একটি প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে ওয়াচ গ্লাসে ৯০% কোহলে প্রায় ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে নেবার পর মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলে বহু অ্যালিউরোণ কণিকা দেখা

যাবে। কণিকাগুলিতে জলীয় আয়োডিন দিলে ক্রিষ্টালয়েডগুলি পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করবে, কিন্তু গ্লোবয়েডগুলির বর্ণের কোন পরিবর্তন হবে না। (ছবি ৫২ পৃঃ)

স্নেহপদার্থ ও তৈল—একটি রেড়ি বীজের সস্য আগুনে ঝলসিয়ে কাগজে ঘস্‌লে কাগজটি তৈলাক্ত হয়ে অর্ধস্বচ্ছ হবে। এতে বোঝা যায় রেড়ি বীজের সস্যে স্নেহপদার্থ ও তৈল আছে।

সিষ্টোলিথ—একটি বটপাতার সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এর অধস্ত্বকের কোষ (Hypodermal cells) আকারে বেশ বড ও তাদের কোষ গহ্বরে আঙুরের থোকার ন্যায় সিষ্টোলিথ ঝুলছে। এইবার কভার স্লিপের ধার দিয়ে কয়েক ফোঁটা অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Acetic acid) অথবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric acid) দিলে দেখা যাবে বুদ্‌বুদ্‌ আকারে কার্বনডাই-অক্সাইড (Carbon-dioxide) গ্যাস বের হচ্ছে। পরিশেষে দেখা যাবে ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate) নির্মিত সিষ্টোলিথ দ্রবীভূত হয়েছে ও কেবলমাত্র কোষপ্রাচীর নির্মিত দণ্ডটি অবশিষ্ট রয়েছে। (ছবি ৫৫ পৃঃ)

র‍্যাফাইডস—একটি কচুবৃন্তের বা বড়পানার পত্রমূলের সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় পরীক্ষা করলে কোষান্তর রন্ধ্রের বাতবকাশের মধ্যে গুচ্ছ সূচের ন্যায় (Acicular raphides) ও তারকার ন্যায় (Sphaeraphides) ক্যালসিয়াম অকজালেট (Calcium oxalate) নির্মিত কেলাস (Crystals) রয়েছে। অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে কেলাসগুলি দ্রবীভূত হয না। (ছবি ৫৫ পৃঃ)

কোষ প্রাচীর (cell-wall) :

সেলুলোজ—পেঁয়াজের শল্কপত্রের একটি প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে তাতে জলীয় ক্লোরো-জিঙ্ক আয়োডাইড (Chloro-zinc-iodide) অথবা জলীয় আয়োডিন দিলে দেখা যাবে ক্লোরো-জিঙ্ক-আয়োডাইডে সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর সবুজ বর্ণ ও আয়োডিনে নীল বা বেগুনী বর্ণ ধারণ করেছে।

লিগ্‌নিন—পাইন গাছের শাখার সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে যথারীতি স্লাইডের ওপর রেখে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া হয তাহলে কোষপ্রাচীর লাল, যদি অ্যানিলিন সালফেট (Anilin sulphate) দেওয়া হয তাহলে সবুজ কিংবা যদি জলীয় আয়োডিন দেওয়া হয় তাহলে বাদামী বর্ণ ধারণ করবে। পাইন গাছের কোষপ্রাচীর লিগ্‌নিন নির্মিত বলেই এইরূপ হয়।

প্রাণিবিজ্ঞান

উপক্রমণিকা

বিশাল পৃথিবীর বুকে প্রাণিকুলের কী বিচিত্র সমাবেশ ! গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, স্বভাব, আবাস প্রভৃতিতে প্রাণিজগৎ বৈচিত্র্যময়। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের অন্তরালেও একটি ঐক্য আছে। শুধু প্রাণী নয়, প্রাণী, উদ্ভিদ—সমস্ত জীবই সেই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এই মিল এদের দেহ সংগঠনের মূল ভিত্তিতে—অর্থাৎ সমস্ত জীবের দেহই **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) নির্মিত এক বা একাধিক কোষের সমন্বয়ে গঠিত।

ডারুইনের (Darwin) **জৈব ক্রমবিবর্তনবাদ** (Theory of Organic Evolution) অনুসারে প্রাণী-সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত প্রাণীই ছিল **এককোষী** (Unicellular)। কিন্তু কালক্রমে সেই এককোষী প্রাণী থেকেই সৃষ্টি হল **বহুকোষী** (Multicellular) প্রাণীর। পৃথিবীর জলবায়ু, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সংগে সংগে বিভিন্ন **পরিবেশে** (Environment) বিভিন্নরকম **অভিযোজনের** (Adaptation) ফলে প্রাণিকুলের দেহবৈচিত্র্যেও নানা রকম **পরিবর্তন** (Mutation) এলো। ফলে সৃষ্টি হল বিভিন্ন রকম প্রাণীর। সুতরাং বিভিন্নতা সত্বেও প্রাণিকুলের মধ্যে উৎপত্তিগত যে একটি পারম্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

এককোষী অণুবীক্ষণিক অ্যামিবা হতে আরম্ভ ক'রে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ পর্যন্ত প্রায় নিরানব্বই লক্ষ **প্রজাতির** (Species) প্রাণী এই পৃথিবীর জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বাস করছে। এই প্রাণিকুল সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলও দুর্নিবার। যে বিজ্ঞান এই প্রাণিকুল সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল নিবৃত্তির সহায়ক, তাকেই বলে **প্রাণিবিজ্ঞান** (Zoology)। এটা জীববিজ্ঞানেরই (Biology) একটি অংশ।

১

প্রাণিজগতের সাধারণ পরিচিতি

(A General Survey of the Animal Kingdom)

অসংখ্য প্রাণিকুলের বিচিত্র তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে করা আবশ্যক। নতুবা প্রাণিকুলের অগণিত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানের খেই হারাবার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই সুবিধার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানীগণ (Zoologists) প্রাণীদের **বহির্গঠন** (External morphology) ও **অন্তর্গঠনের** (Internal morphology or Anatomy) সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে **ক্রমবিবর্তন** বা **অভিব্যক্তিক্রমানুসারে** (According to evolution) প্রাণিজগৎকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বিজ্ঞানসম্মত এই শ্রেণীবিভাগকে বলে—**ট্যাক্সোনমি** (Taxonomy)।

বিশ্বচরাচরের ছোট-বড় সমস্ত প্রাণী সম্মিলিতভাবে গঠন করেছে **প্রাণিজগৎ** (Kingdom-Animalia)। এই প্রাণিজগৎ প্রথমতঃ তিনটি উপজগতে (Subkingdom) বিভক্ত।

প্রথম উপজগৎ—আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া :
(Subkingdom—Protozoa)

এদের দেহ একটি মাত্র তথাকথিত কোষ দিয়ে গঠিত এবং সেই কোষটি দ্বারাই এদের দেহের যাবতীয় **দৈহিক** (Physical) ও **বিপাকীয়** (Metabolic) কার্য পরিচালিত হয়। এই উপজগতে একটিই মাত্র ফাইলাম বা পর্ব আছে, তার নামও প্রোটোজোয়া।

পর্ব ১—আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া (Phylum-Protozoa) :

(১) বিবর্তনের দিক হতে এরা অন্য সমস্ত প্রাণীর পূর্বসূরী।

(২) দেহ একটি মাত্র কোষদ্বারা গঠিত হওয়ায় পূর্বে এদের এককোষী (Unicellular) প্রাণী বলা হত। কিন্তু সাধারণ কোষের সংগে এদের দেহকোষের কার্যগত* পার্থক্য থাকায় এদেরকে বর্তমানে **কোষবিহীন** (Acellular or Non-cellular) প্রাণী বলে।

---

*সাধারণ কোষ একটি বিশেষ (partioular) কাজ করে, কিন্তু প্রোটোজোয়ার দেহকোষ জীবনের যাবতীয় কাজ করে।

(৩) খালি চোখে এদের দেখা যায় না। কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে এদের দেখা সম্ভব।

(৪) তথাকথিত একটি কোষদ্বারাই এদের যাবতীয় জৈবনিক কার্য সম্পন্ন হয়।
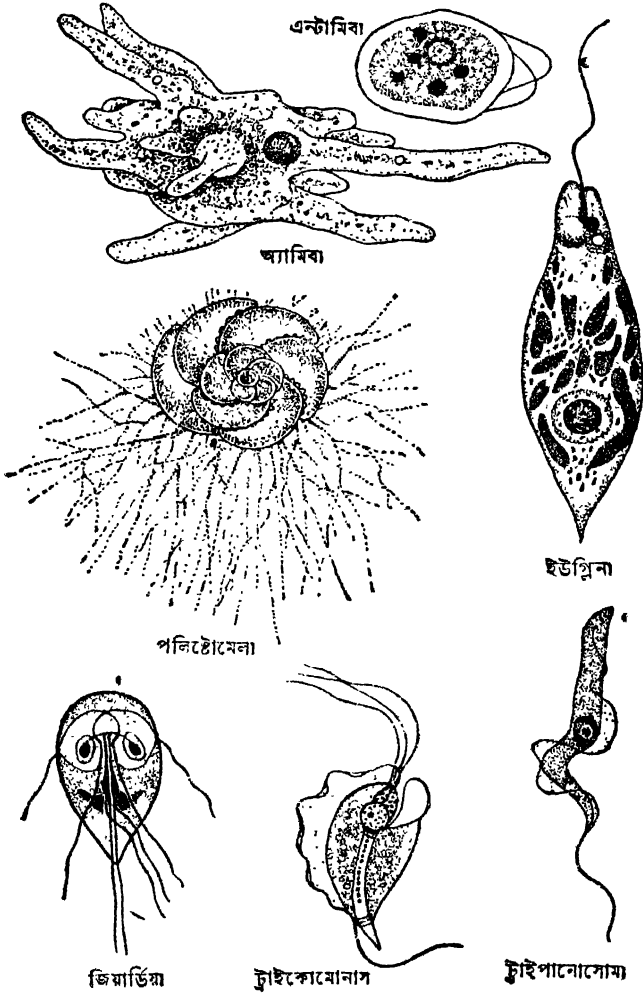
কতিপয় প্রোটোজোয়া অন্তর্ভুক্ত প্রাণী

৫। এরা ক্ষণপদ বা সিউডোপোডিয়া (Pseudopodia), ফ্ল্যাজিলা (flagella), সিলিয়া (cilia) ইত্যাদির সাহায্যে চলা-ফেরা করে।

৬। এরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পুষ্টি সাধন করে—

(ক) **হলোজোয়িক** (Holozoic) পদ্ধতি অর্থাৎ সূক্ষ্মাকৃতির জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ ধ'রে খায়।

(খ) **হলোফাইটিক** (Holophytic) পদ্ধতি বা উদ্ভিদের মত সালোক-সংশ্লেষ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় নিজেদের দেহেই খাদ্য প্রস্তুত করে।

(গ) **স্যাপ্রোজোয়িক** (Saprozoic) পদ্ধতি অর্থাৎ সমস্ত দেহ দিয়ে নিজের পরিবেশ হতে তরল খাদ্যরস শোষণ করে।

(৭) এদের কিছু সংখ্যক স্বাধীনজীবী (Free-living) আবার কিছুসংখ্যক পরজীবী (Parasitic)। পরজীবীরা বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

আরও কয়েকটি প্রোটোজোয়া
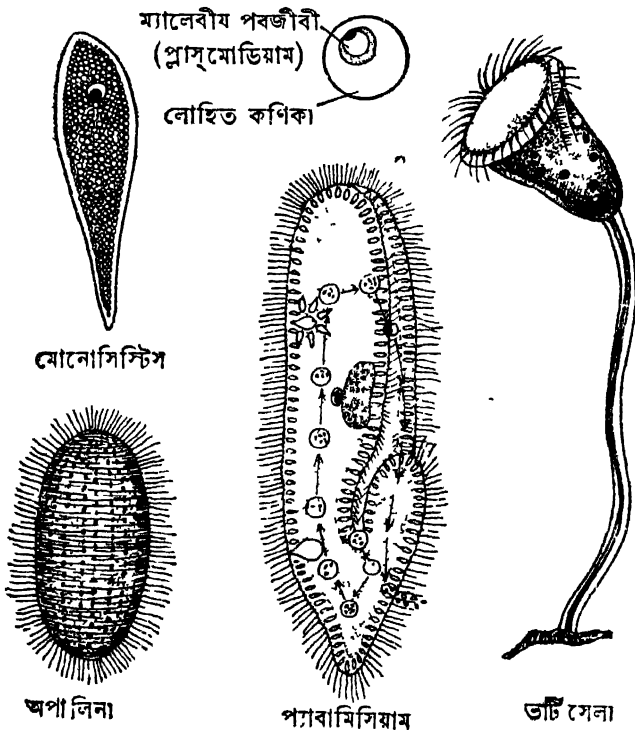
(৮) জলে, স্থলে, বায়ু, এমনকি কাদার ভেতর, প্রায় সর্বত্র এরা বিরাজমান।

উদাহরণ—সিউডোপোডিয়াযুক্ত অ্যামিবা (Amoeba), সিলিয়াযুক্ত প্যারামিসিয়াম (Paramoecium), অপালিনা (Opalina); ভর্টিসেলা (Vorticella); ফ্ল্যাজিলাযুক্ত ইউগ্লিনা (Euglena), ট্রাইকোমোনাস (Trichomonas); পরজীবী মোনোসিষ্টিস (Monocystis), আমাশয়ের কীটাণু বা জিয়াডিয়া (Giardia intestinalis), রক্তামাশয়ের কীটাণু বা এণ্টামিবা হিষ্টোলাইটিকা (Entamoeba histolytica), ম্যালেরিয়ার কীটাণু বা প্লাস্‌মোডিয়াম (Plasmodium), কালাজ্বরের কীটাণু বা লিস্‌মানিয়া ডোনোভানি (Leishmania donovani), আফ্রিকার নিদ্রারোগের কীটাণু বা ট্রাইপানোসোমা গ্যাম্বিয়েন্সি (Trypanosoma gambiense) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উপজগৎ—প্যারাজোয়া :
(Subkingdom—Parazoa)

প্রোটোজোয়া থেকে উৎপত্তি হবার সময় এরা ক্রমবিবর্তনের সোজা পথে না গিয়ে অন্য একটি পথে চলে গেছে। ফলে এদের থেকে আর অন্য প্রাণীর উদ্ভব হয়নি। এদের দেহ অনেকগুলি কোষের সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং এরা **কোষযুক্ত (Cellular)** প্রাণী। কিন্তু এদের কোষগুলির মধ্যে পুরোপুরি ও ভালভাবে **শ্রমবিভাগ** (Division of labour) হয় নি। ফলে এরা প্রকৃত **বহুকোষী প্রাণীর** (Metazoa) স্তরে উন্নীত হ'তে পারেনি। এদের দেহপ্রাচীর দু'টি কোষস্তরে গঠিত—**বহিস্ত্বক** (Ectoderm) ও **অন্তস্ত্বক** (Endoderm)। কিন্তু কোষস্তর দু'টি সুবিন্যস্ত নয়, ফলে বহিস্ত্বকের কোষ অন্তস্ত্বকে ও অন্তস্ত্বকের কোষ বহিস্ত্বকে দেখা যায়। এই উপজগতেও একটিমাত্র ফাইলাম বা পর্ব আছে।

পর্ব ২—ছিদ্রাল প্রাণী বা পরিফেরা (Phylum-Porifera)

(১) এরা উদ্ভিদের মত ভূমিসংলগ্ন (fixed) জলজ প্রাণী।

(২) দেহ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত ও কতকগুলি শাখায় বিভক্ত। ছিদ্রগুলি দু'রকমের—প্রত্যেকটি শাখার শীর্ষে অবস্থিত একটিমাত্র বড় ছিদ্র থাকে ও তার নাম **অসকিউলাম** (Osculum) আর সারা দেহে পরিব্যাপ্ত ছোট ছিদ্রগুলি সংখ্যায় বহুল ও তাদের বলে **অষ্টিয়া** (Ostia)।

(৩) দেহাভ্যন্তরে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি **নালীতন্ত্র** (Canal system)

আছে। জল ও খাদ্যবস্তু অষ্টিয়ার ভেতর দিয়ে নালীতন্ত্রে প্রবেশ করে ও পরে জল ও বর্জ্য বস্তু অসকিউলাম দ্বারা বহিষ্কৃত হয়।

(৪) দেহে সুনির্দিষ্ট কোন অংগ নেই।

(৫) দেহপ্রাচীরের **কোয়ানোসাইট** (Choanocyte) নামক এক বিশেষ ধরণের কোষ এই পর্বের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের সহায়ক।

(৬) এক হতে **বহু অক্ষবিশিষ্ট** (Monoaxon to multiaxon) **স্পিকিউলস** (Spicules) এদের দেহকে ধ'রে রাখতে সাহায্য করে।

(৭) একটি ফ্যামিলি **স্পঞ্জিলিডি** (Spongillidae) ব্যতীত এরা সবাই সামুদ্রিক।
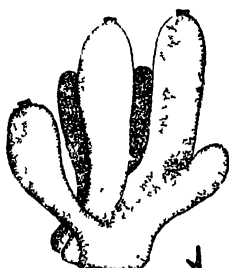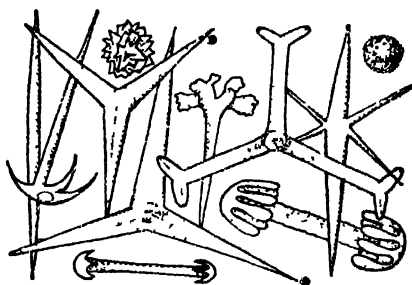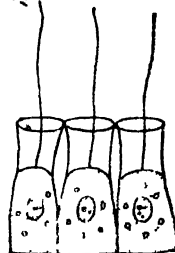
কতিপয় 'পরিফেরার' অন্তর্ভুক্ত প্রাণী ও তাদের দেহস্থ স্পিকিউলস ও কোয়ানোসাইটস

উদাহরণ—সাইকন (Sycon gelatinosum), ক্ল্যাথরিনা (Clathrina), ইউস্পঞ্জিয়া (Euspongia), নেপচুনের কাপ বা পোটেরিয়ন (Neptunes's cup or Poterion), শুক্রের ফুল বা ইউপ্লেকটেলা (Venus's flower basket or Euplectella), পরিষ্কার পুকুরের স্পঞ্জ বা স্পঞ্জিলা (spongilla) ইত্যাদি।

তৃতীয় উপজগৎ—মেটাজোয়া ঃ
(Subkingdom—Metazoa)

এরা প্রকৃত কোষযুক্ত (Cellular) প্রাণী। পূর্বে এদের 'বহুকোষী (Multicellular) প্রাণী বলা হত। এদের দেহপ্রাচীরের কোষস্তরগুলি
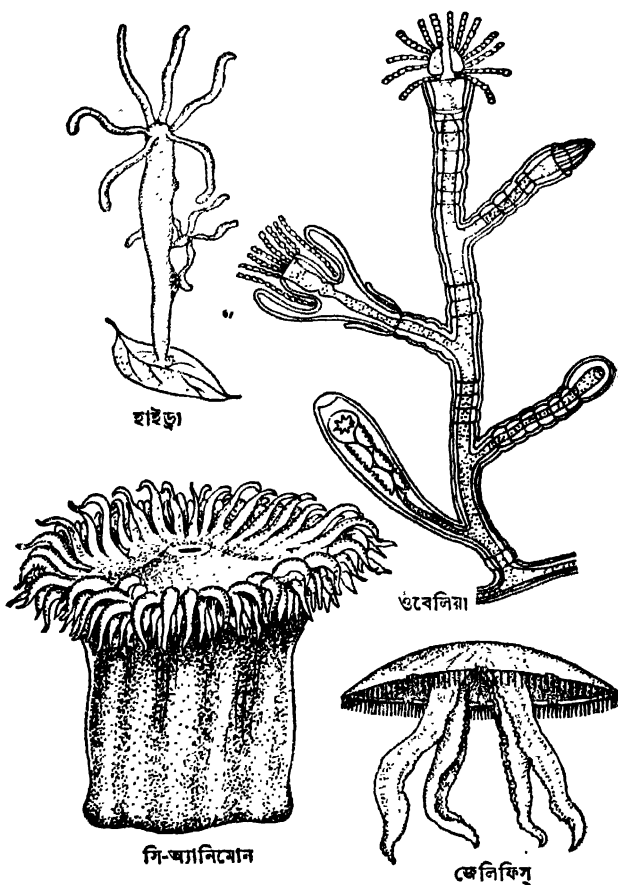
সিলেন্টারেটার অন্তর্ভুক্ত কতিপয় প্রাণী

সুবিন্যস্ত। দেহকোষগুলিতে সুনির্দিষ্ট শ্রমবিভাগ (division of labour) দেখা যায় ও কোষগুলি বিশেষ বিশেষ কার্যসাধন করার জন্য বিশিষ্টতা (specialization) অর্জন করেছে। এই উপজগতে মোট আটটি ফাইলাম বা পর্ব আছে।

পর্ব ৩—একনালী দেহী প্রাণী বা সিলেন্টারেটা (Phylum-Cœlenterata) :

(১) এদের দেহ **অরীয় সুষম** (Radial symmetry) অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অংশ বৃত্তাকারে কেন্দ্রস্থ মধ্যরেখাকে সুসমঞ্জসভাবে পরিবেষ্টন করে থাকে।

(২) দেহগহ্বর বা সিলোম (Coelom) ও খাদ্যনালী (Enteron) আলাদা আলাদা নয়। একটিমাত্র নালীই এদের প্রতিভূ। এই নালীটির নাম **সিলেনটেরন** (Cœlenteron)।
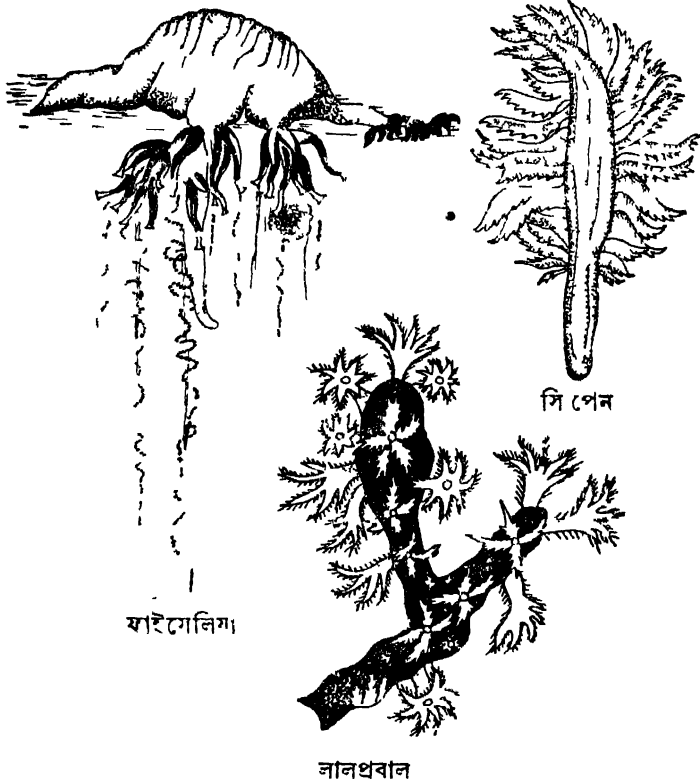
আরও কয়েকটি সিলেন্টারেটস

(৩) দেহপ্রাচীরের কোষগুলি দু'টো স্তরে বিভক্ত—**বহিস্ত্বক** (**Ectoderm**) ও **অন্তস্ত্বক** (**Endoderm**)। এই দুই স্তরের মাঝখানে কোষবিহীন স্বচ্ছ অর্ধতরল পদার্থের একটি স্তর আছে, একে বলে **মেসোগ্লিয়া** (**Mesoglea**)।

(৪) বহিস্ত্বকে দংশন কোষ (stinging cells) বা নিমাটোসিস্টের (Nematocysts) উপস্থিতি এদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৫) কোন **পায়ুছিদ্র** (Anus) না থাকায় **মুখটিই** (Mouth) প্রয়োজনে পায়ুর কাজ করে।

(৬) মুখছিদ্রের চারপাশে লম্বা ও সরু সরু সূত্রের ন্যায় কতকগুলি **কর্ষিকা** (**Tentacles**) দেখা যায়।

(৭) এদের দেহকে নলাকৃতি হলে পলিপ (Polyp) এবং ছত্রাকৃতি হলে **মেডুসা** (**Medusa**) বলে। যেমন, হাইড্রা একটি পলিপ ও জেলিফিস একটি মেডুসা।

(৮) প্রাণীগুলি হয় **একক ভাবে** (Solitary) অথবা **দলবদ্ধ উপনিবেশে** (**Colony**) থাকে।

(৯) দেহের বিনষ্ট অংশের **পুনরুৎপাদন ক্ষমতা** (**power of regeneration**) এদের আছে।

(১০) এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ প্রাণীই সামুদ্রিক, কিছু সংখ্যক পরিষ্কার জলের নিবাসী।

উদাহরণ—হাইড্রা (Hydra), ওবেলিয়া (Obelia), পর্তুগীজ যুদ্ধজাহাজ (Portuguese Man of War) বা ফাইসেলিয়া (Physalia), প্রবাল (Coral), সাগরকুসুম বা সি-অ্যানিমোন (Sea-flower or Sea-anemone), সাগর কলম বা সি-পেন (Sea-pen), অরেলিয়া (Aurelia) ইত্যাদি।

পর্ব ৪—চ্যাপ্টাকৃমি বা প্ল্যাটিহেলমিন্থিস (**phylum-platyhelminthes**):

(১) এদের দেহ **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম** (**Bilaterally symmetrical**), অর্থাৎ দেহের কেবল দু'পাশ সমান অংশ নিয়ে গঠিত ও সুসমঞ্জস।

(২) দেহ পিঠ ও পেটের দিক হতে চ্যাপ্টা।

(৩) ক্রমবিবর্তন অনুসারে এরাই প্রথম তিন কোষস্তর বিশিষ্ট (Triploblastic) প্রাণী অর্থাৎ এদের দেহ-প্রাচীর তিনটি কোষস্তরে গঠিত—**বহিস্ত্বক** (Ectoderm), মধ্যত্বক (Mesoderm) ও অন্তস্ত্বক (Endoderm)।

(৪) এদের দেহে দেহপ্রাচীর ও খাদ্যনালীর মাঝখানে কোন ফাঁকা অংশ বা **দেহগহ্বর** (Body cavity) বা **সিলোম** (Coelom) থাকে না।

(৫) এদের **পৌষ্টিক নালী** (Alimentary canal) অসম্পূর্ণ **অথবা অনুপস্থিত**।

(৬) পায়ুছিদ্র (Anus) এদের দেহে মোটেই থাকে না।

(৭) এরা উভলিঙ্গ—অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ জনন অংগ একই প্রাণীতে দেখা যায়।

(৮) এদের অনেকের দেহ বহু **খণ্ড** বা **প্রগ্লটিড্‌স** (Proglottids) যুক্ত লম্বা ফিতের মত। প্রতিটি খণ্ডই একটি সম্পূর্ণ প্রাণীর প্রতিভূ।

(৯) দেহটি সম্মুখ দিক (Anterior region) ও পশ্চাৎ দিকে (Posterior region) বিভক্ত।
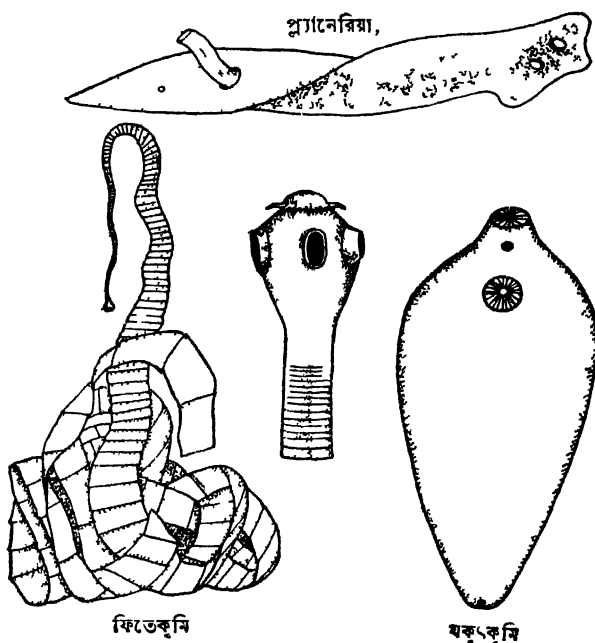
প্ল্যাটিহেল্‌মিন্‌থিস্‌ভুক্ত কয়েকটি প্রাণী

(১০) এরা বেশীর ভাগই **পরজীবী** (parasitic) ও কিছু সংখ্যক **স্বাধীনজীবী** (Free-living)। পরজীবীরা মানুষ অথবা অন্যান্য প্রাণিদেহে বাস ক'রে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

উদাহরণ—স্বাধীনজীবীদের মধ্যে প্ল্যানেরিয়া (planaria) ও পরজীবীদের মধ্যে ফিতেকৃমি (Tape-worm) বা টিনিয়া সোলিয়াম (Tenia solium), যকৃৎকৃমি (Liver fluke) বা ফ্যাসিওলা হেপাটিকা (Fasciola hepatica) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পর্ব ৫—গোলকৃমি বা নিমাট্‌হেলমিন্‌থিস (Phylum-Nemathelminthes) :

(১) এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম (Bilaterally symmetrical)।

(২) দেহ লম্বা গোলাকার নলের মত ও তার দু'দিকই সরু হয়ে শেষ হয়েছে।

(৩) একটি স্বচ্ছ কৃত্তিকাবরণী (Transparent cuticle) দ্বারা সমস্ত দেহটি আবৃত। কৃত্তিকাবরণীটিতে লম্বালম্বি চারটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দাগ আছে।

(৪) দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয়।

(৫) বহির্ত্বক, মধ্যত্বক ও অন্তর্ত্বক দ্বারা গঠিত এদের দেহপ্রাচীর।

(৬) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৌষ্টিক তন্ত্র (Alimentary system) আছে; মুখছিদ্রটি অগ্রপ্রান্তে ও পায়ুছিদ্রটি পশ্চাৎপ্রান্তের সন্নিকটে অঙ্কীয় দেশে বিদ্যমান।

(৭) দেহে রক্তসংবহনতন্ত্র (Circulatory system) থাকে না।

(৮) এরা একলিঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

(৯) এদের কিছু সংখ্যক স্বাধীনজীবী ও কিছু সংখ্যক পরজীবী। পরজীবীরা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে বাস ক'রে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

উদাহরণ—অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডস্ (Ascaris lumbricoides), হুককৃমি বা অ্যানকাইলোষ্টোমা ডিউওডিনেল (Ancylostoma duodenale), কুচোকৃমি বা এন্টেরোবায়াস্ ভার্মিকিউলারিস (Enterobious vermicularis), চাবুক কৃমি বা ট্রাইকোসেফালাস ডিস্পার (Trichocephalus dispar), গোদ (Filaria) সৃষ্টিকারী কৃমি বা ভুচেরেরিয়া ব্যানক্রফ্‌টি (Wuchreria bancrofti) ইত্যাদি।

ভুচেরেরিয়া ব্যান্‌ক্রফটি (গোদের কৃমি)
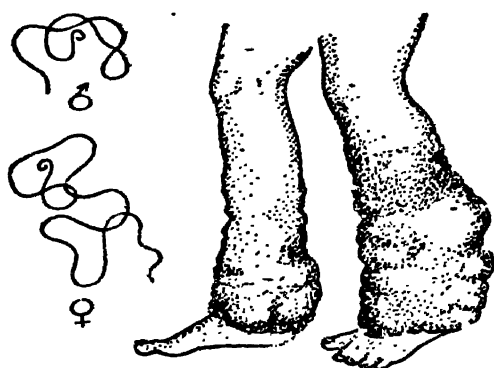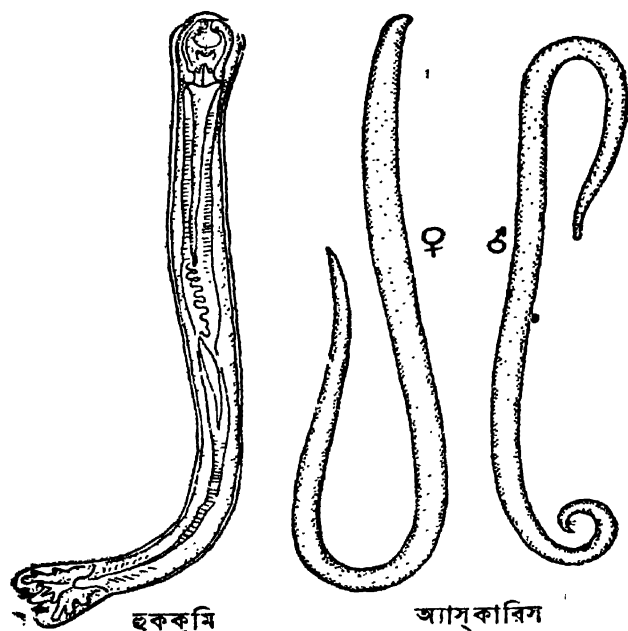
নিমাটহেল্‌মিনথিস্‌ভুক্ত কয়েকটি প্রাণী

পর্ব—৬ অঙ্গুরীমালপ্রাণী বা অ্যানিলিডা (Phylum-Annelida) :

(১) এদের দেহ লম্বা ও কতকগুলি দেহখণ্ডে খণ্ডিত। অনেকক্ষেত্রে খণ্ডগুলি বাইরের দিকে কতকগুলি আংটির মত গোলাকার দাগ (Annular rings) দ্বারা চিহ্নিত।

(২) এদের দেহের ক্লিকাবরণীটি পাতলা ও নরম।
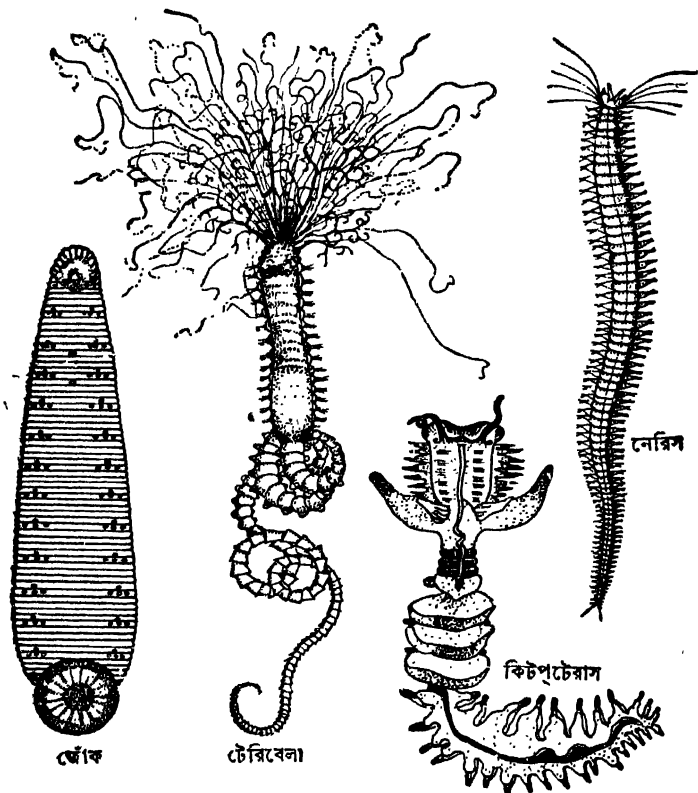
অ্যানিলিডার অন্তর্ভুক্ত কতিপয় প্রাণী

(৩) দেহাভ্যন্তরে একটি সুস্পষ্ট **দেহগহ্বর** (Body cavity) বা **সিলোম** (Coelom) আছে।

(৪) এদের লম্বা পৌষ্টিক নালীটি মুখছিদ্র হতে আরম্ভ হ'য়ে সোজা পায়ুছিদ্রে এসে শেষ হয়েছে।

(৫) সাধারণতঃ প্রত্যেক দেহখণ্ডে একজোড়া প্যাঁচানো সিলিয়াযুক্ত রেচননালী বা নেফ্রিডিয়া (Ciliated nephridia) থাকে।

(৬) এদের রক্তসংবহনতন্ত্র (Circulatory System) গঠিত হয়েছে কয়েকটি লম্বা রক্তনালী ও তাদের যোজক কয়েকটি প্রস্থনালী দ্বারা।

(৭) একজোড়া মস্তিষ্কের স্নায়ুগ্রন্থি বা সেরিব্রাল স্নায়ুগ্রন্থি (Cerebral ganglia) ও একটি গ্রন্থিযুক্ত নিরেট অঙ্কীয় স্নায়ুসূত্র (Ganglionated solid ventral nerve cord) দ্বারা গঠিত এদের স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)।

(৮) বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে জীবন চক্রে (Life cycle) ট্রোকোফোর লার্ভা দশা (Trochophre larval stage) দেখা যায়।

উদাহরণ—কেঁচো (Earthworm), নেরিস্ (Nereis), জোঁক (Leech), পলিগর্ডিয়াস (Polygordius) ইত্যাদি।

পর্ব ৭—সন্ধিপদ প্রাণী বা আর্থ্রোপোডা (phylum-Arthropoda) :

(১) এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম (Bilaterally symmetrical)।

(২) সমস্ত দেহটি একটি **শক্ত কৃত্তিকাবরণী** (Chitinous cuticle) দ্বারা আবৃত। কৃত্তিকাবরণীটি দেহকে যথাযথ ধ'রে রাখতে সাহায্য করে ব'লে একে **বহিঃকঙ্কাল**ও (Exoskeleton) বলে।

(৩) এদের পদ ও উপাঙ্গগুলি সন্ধিত বা জোড়া জোড়া (Appendages jointed)।

(৪) দেহটি বাইরের দিকে কতকগুলি খণ্ডে খণ্ডিত (Segmented)। কিন্তু খণ্ডগুলি দেহাভ্যন্তরে প্রসারিত নয়।

(৫) এদের চোখ সাধারণতঃ **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eye) অর্থাৎ কতকগুলি চোখ একত্র হয়ে একটি মিলিত চোখ গঠন করে। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার সরল চোখও (Simple eye) দেখা যায়।

(৬) হৃদয়যন্ত্রটি (Heart) পৌষ্টিক নালীর পিঠের দিকে অবস্থিত। রক্তনালীগুলি মুক্ত (Open)।

(৭) পেশী অথবা ফ্যাটবডি বৃদ্ধির ফলে এদের দেহগহ্বর বা সিলোমটি (Coelom) অসংখ্য খোলানালীতে পরিণত হয়েছে। এই নালীগুলি রক্তবাহী ও দেহনালী নামে পরিচিত। এই প্রকার রক্তবাহী দেহগহ্বরকে হিমোসিল (Haemocoel) বলে।

(৮) বৃদ্ধির সময় এরা কয়েকবার খোলস পরিত্যাগ করে ও নতুন খোলস গঠন করে। এই প্রক্রিয়াকে এক্‌ডাইসিস (Ecdysis) বলে।

(৯) পৃষ্ঠদেশীয় মস্তিষ্ক (Brain) ও অঙ্কদেশীয় গ্রন্থিযুক্ত একজোড়া স্নায়ুসূত্রদ্বারা এদের স্নায়ুতন্ত্র গঠিত।

(১০) ফুলকো (Gills), বায়ুনালী বা ট্র্যাকিয়া (Trachea), ফুসফুস্ থলি (Pulmonary sac), ফুসফুস্ বই (Lung book), বই-ফুলকো (Book-gills) ইত্যাদি দ্বারা এদের শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

(১১) এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। সুতরাং এরা একলিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী।

(১২) জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে এদের দেখা যায়।
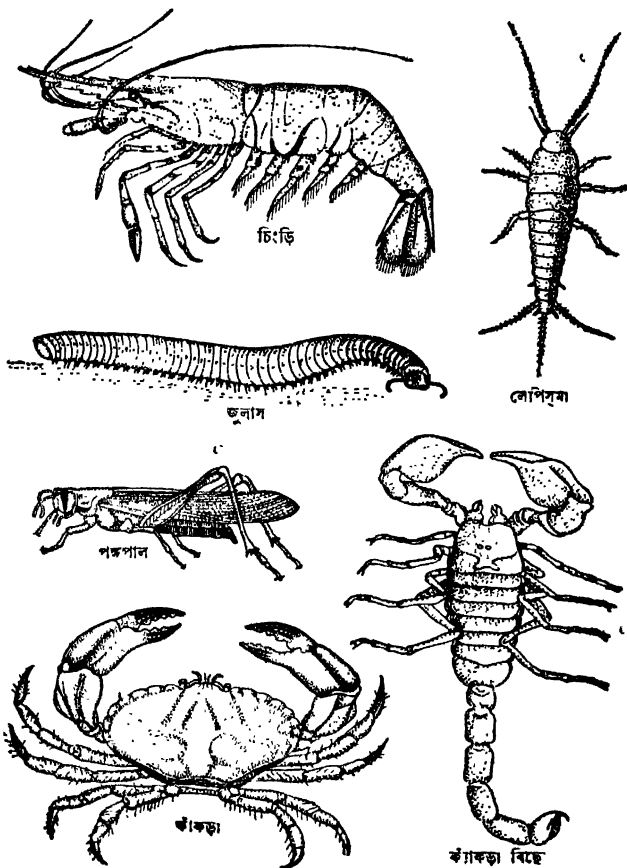
কয়েকটি আর্থ্রোপোডাভুক্ত প্রাণী

উদাহরণ—চিংড়ি (Prawn), কাঁকড়া (Crab), লেপিসমা (Lepisma), আরশোলা (Cockroach), ফড়িং (Dragon fly), মশা (Mosquito), প্রজাপতি (Butterfly), জুলাস (Julus), মাকড়সা

(Spider), কাঁকড়া বিছে (Scorpion), কিং ক্র্যাব বা লিমুলাস্ (King crab or Limulus), পেরিপেটাস (Peripatus) ইত্যাদি।
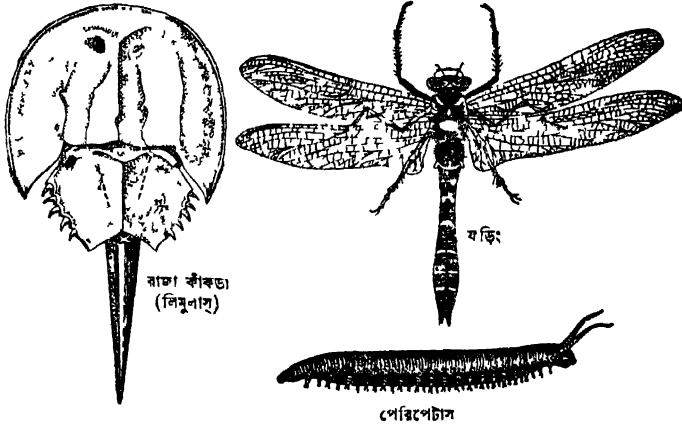
আরও কয়েকটি আর্থ্রোপোডাভুক্ত প্রাণী

পর্ব ৮—শম্বুক বা মোলাস্কা (Phylum-Mollusca):

(১) এদের দেহ নরম ও দেহখণ্ডে খণ্ডিত নয়।

(২) অন্ততঃ জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম।

(৩) দেহটি একটি নরম আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে, একে **ম্যাণ্টেল** (**Mantle**) বলে। ম্যাণ্টেলটি একপ্রকার রস নিঃসৃত ক'রে দেহের চারপাশে একটি শক্ত **খোলক** (Shell) সৃষ্টি করে। খোলকটি অনেক সময় দেহের ভেতরে থাকে অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ (Internal)।

(৪) সাধারণতঃ এদের অঙ্কদেশে একটি **মাংসল পদ** (**Muscular foot**) থাকে।

(৫) এদের দেহগহ্বরটি (Coelom) খুব সংকীর্ণ এবং সাধারণতঃ হৃদযন্ত্র (Heart), ফুলকো (Gills) প্রভৃতি অংশে সীমাবদ্ধ।

(৬) ফুলকো (Gills) বা ফুসফুস্ (Lung) অথবা উভয়ের সাহায্যেই সম্পন্ন হয় এদের **শ্বাসকার্য** (**Respiration**)।

(৭) এদের পৌষ্টিক নালীটি বেশ প্যাঁচানো।

(৮) কয়েক জোড়া স্নায়ুগ্রন্থি (Nerve ganglia) ও কয়েকটি স্নায়ুসূত্র (nerve cords) দ্বারা এদের স্নায়ুতন্ত্র গঠিত।
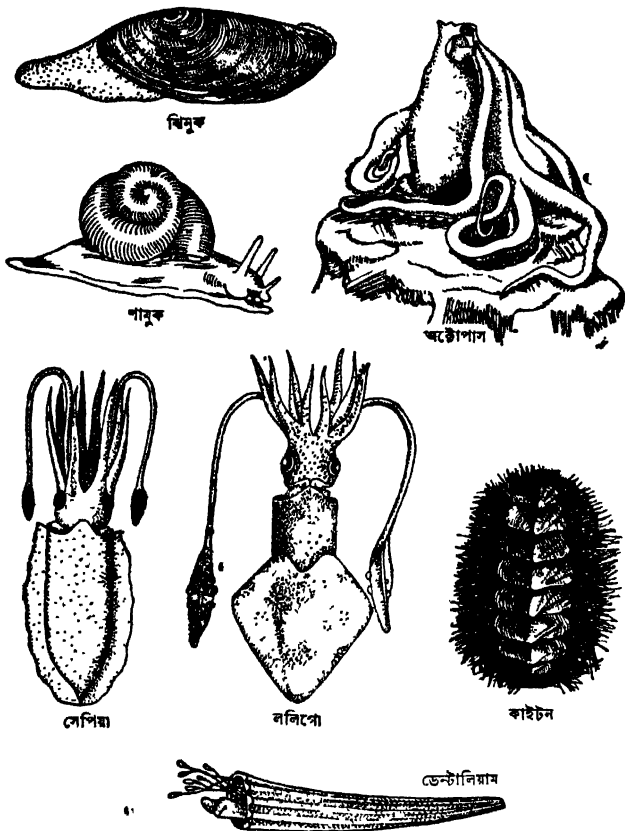
কতিপয় মোলাস্কাভুক্ত প্রাণী

উদাহরণ—কাইটন (Chiton), শামুক (Snail), ঝিনুক (Unio), ডেণ্টালিয়াম (Dentalium), সেপিয়া (Sepia), ললিগো (Loligo), অক্টোপাস (Octopus) ইত্যাদি।

পর্ব ৯—কণ্টকত্বক প্রাণী বা একাইনোডার্মাটা :
(Phylum-Echinodermata)

(১) এদের দেহটি শক্ত অথবা সঞ্চরণশীল চূর্ণকনির্মিত কর্কশ ও কণ্টকপূর্ণ বহিঃকঙ্কাল (exoskeleton) দ্বারা আবৃত থাকে।

(২) **জীবনের** প্রাথমিক দশায় এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম (Bilateral symmetry) কিন্তু কালক্রমে দেহটি অরীয় সুষম (Radial symmetry)।

(৩) এদের দেহগহ্বরটি সুস্পষ্ট ও বেশ বড।

(৪) এদের দেহ খণ্ডিত নয়, কিন্তু পাঁচটি **অরীয়** (Radial) ও **পাঁচটি অন্তর অরীয়** (Inter radial) অঞ্চলে বিভক্ত।

(৫) মুখের নিকট খাদ্যনালীকে ঘিরে একটি **অঙ্গুরী নালী** (Ring vessel) আছে। সেখান থেকে পাঁচটি **অরীয় নালী** (Radial canals) বের হয়েছে।
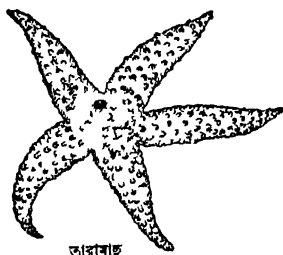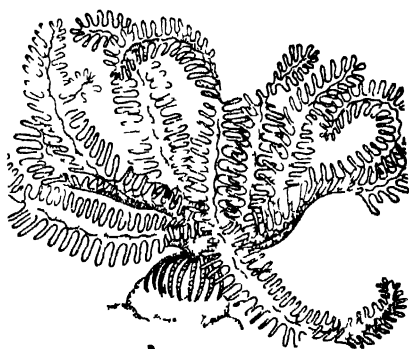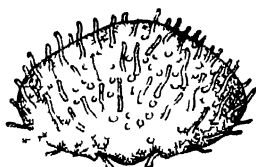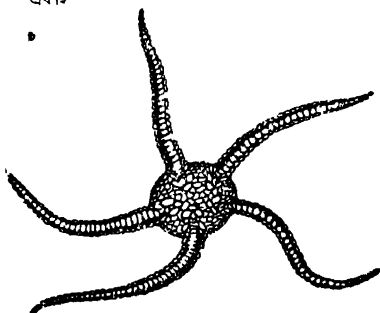
কতিপয় একাইনোডার্মাটাভুক্ত প্রাণী

এই নালীগুলি সম্মিলিত ভাবে একটি **জল নালীতন্ত্র** (Water vascular system) গঠন করেছে।

(৬) বৃদ্ধির সময় এরা লার্ভাদশার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয়।

(৭) এরা সকলেই সামুদ্রিক।

উদাহরণ—তারামাছ (Star fish), ব্রিট্‌ল স্টার (Brittle star), সি-আরচিন (Sea-urchin) বা একাইনাস (Echinus), সমুদ্র-শশা (Sea-cucumber), সামুদ্রিক লিলি (Antedon) ইত্যাদি।

পর্ব ১০—কর্ডাটা (Phylum-Chordata):

(১) এরা **দেহগহ্বর (Coelom)** যুক্ত তিন কোষস্তর (বহিস্ত্বক, মধ্যত্বক ও অন্তস্ত্বক) বিশিষ্ট দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম (Bilaterally symmetrical) প্রাণী।
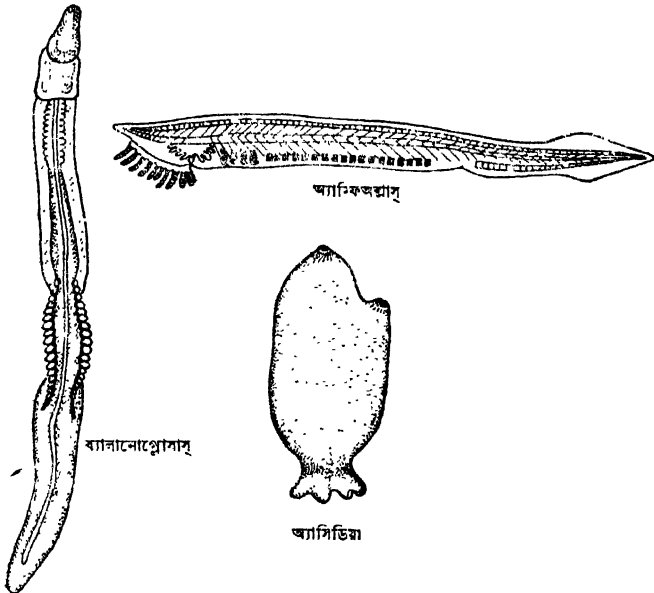
কতিপয় প্রোটোকর্ডেটস্

(২) দেহকে ধ'রে রাখার জন্য এদের পিঠের দিকে লম্বা কাঠির মত নরম অথচ মজবুত একটি বস্তু বা **নোটোকর্ড (Notochord)** জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থায় অথবা সারা জীবন ধ'রেই দেখা যায়। উচ্চস্তরের কর্ডাটার ক্ষেত্রে এটা অপসৃত হয় ও **মেরুদণ্ড (Vertebral Column)** এর স্থান দখল করে।

(৩) জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থায় অথবা সারা জীবন ধ'রে **গলবিলের (Pharynx)** দু'পাশে কয়েক জোড়া **ফুলকোছিদ্র (Gill-slits)** থাকে।

(৪) এদের দেহে একটি **পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ুসূত্র** (Dorsal hollow

nerve cord) দেখা যায়। ফাঁপা অংশটি **স্নায়ুরস** (Spinal fluid) দ্বারা ভরা থাকে।

(৫) এদের প্রধান প্রধান **রক্তনালী** (Blood vessels) ও **হৃদয়যন্ত্রটি** (Heart) অঙ্কদেশে বিদ্যমান।

(৬) **জোড়া পদ থাকলে তাদের সংখ্যা কখনোই দু'জোড়ার বেশী হয় না।**

উদাহরণ—অ্যাম্ফিঅক্সাস (Amphioxus), ব্যালানোগ্লোসাস (Balanoglossus),অ্যাসিডিয়া (Ascidia)—এরা নিম্নস্তরের কর্ডাটা বা **প্রোটোকর্ডাটা** (Protochordata)। এগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত উচ্চস্তরের কর্ডাটা বা **ভার্টিব্রাটার** (vertebrata) অন্তর্ভুক্ত প্রাণিসকলও এই পর্বের অন্তর্গত।

সাইক্লোস্টোম্ (Cyclostome) :—এরা **চোয়াল** (Jaw) **বিহীন** মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের মুখ গোল ও শোষণক্ষম। জোড়া পাখনা বা আঁশ এদের থাকে না। হ্যাগফিস (Hagfish), ল্যামপ্রে (Lamprey) প্রভৃতি এই জাতীয় প্রাণী।
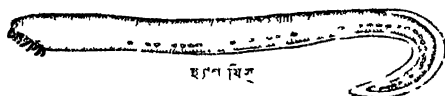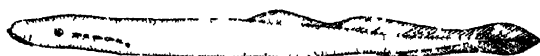
সাইক্লোস্টোমস্

মৎস্য বা পিসেস (Pisces) :—এরা চোয়ালবিশিষ্ট **অনুষ্ণ-শোণিত**
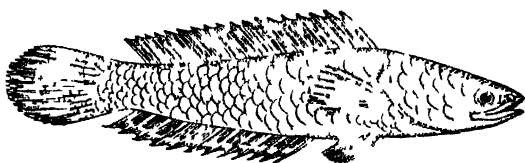
কয়েকটি মৎস্য—(ক) ল্যাটা, (খ) উড়ুক্কু মাছ (এক্সোসিটাস), (গ) ডিপনয়

(Cold-blooded)* মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের ফিন্‌-রে যুক্ত জোড়া পাখনা (Paired fins with fin-rays) ও দেহের দু'পাশে স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা (Lateral line sense organs) থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেহ আঁশ (Scale) দ্বারা আবৃত থাকে। হাঙর (Shark), ইলেকট্রিক রে (Electric

আরও কয়েকটি মৎস্য—(ক) হাতুড়ীমুখো হাঙর, (খ) ইলেকট্রিক রে, (গ) সমুদ্র ঘোটক (হিপ্পোকাম্পাস), (ঘ) স্টার জন
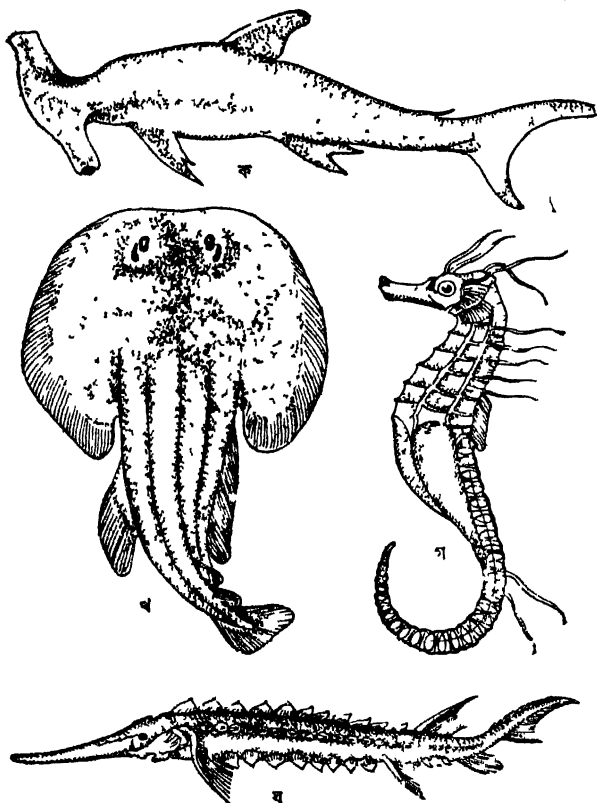
Ray), সমুদ্র-ঘোটক বা হিপ্পোকাম্পাস (Sea-horse or Hippocampous), কৈ (Koi), শিঙি (Singi), মাগুর (Magur), রুই (Rohu) ফুসফুসযুক্ত ডিপ্‌নয় (Dipnoi), উড়ুক্কু মাছ বা এক্সোসিটাস (Flying fish or Exocoetus) ইত্যাদি মাছ এই জাতীয় প্রাণী।

* আবহমণ্ডলের তাপের তারতম্যের ফলে যাদের দেহ-তাপেরও পরিবর্তন হয়, তাদের অস্থির শোণিত (Cold blooded) প্রাণী বলে।

উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া (Amphibia) :—এরাও চোয়ালযুক্ত অসুষ্ণ-শোণিত মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের ত্বক (Skin) নগ্ন (Naked) ও সাধারণতঃ
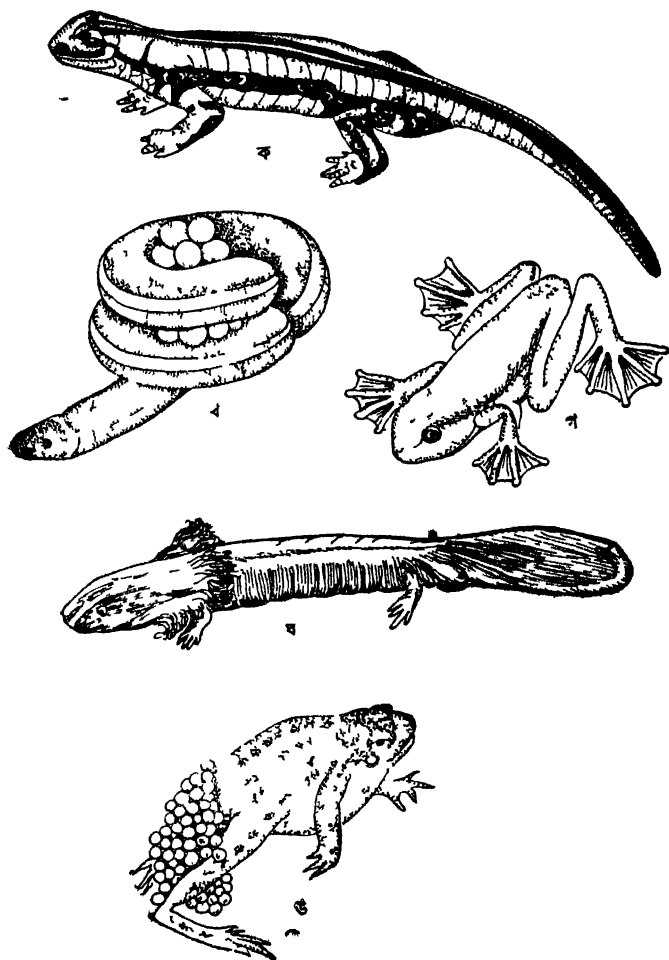
কতিপয় উভচর প্রাণী—(ক) স্যালামেণ্ডার, (খ) ইকথিওফিস, (গ) র‍্যাকোফোরাস (উড়ুক্কু ব্যাঙ), (ঘ) নেকচুরাস, (ঙ) পুরুষধাত্রী ব্যাঙ অ্যালাইটিস্

গ্রন্থিবহুল (Glandular) ও স্যাঁৎসেঁতে। সাধারণতঃ এদের শিশু অবস্থা জলে এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থা স্থলে অতিবাহিত হয়। কুনো ব্যাঙ (Toad), সোনা

ব্যাঙ (Frog), স্যালামেণ্ডার (Salamender), উড়ুক্কু ব্যাঙ র‍্যাকোফোরাস (Rachophorous) প্রভৃতি এই জাতীয় প্রাণী।

সরীসৃপ বা রেপ্টাইল (Reptiles) :—এরাও চোয়ালযুক্ত অনুষ্ণ-শোণিত মেরুদণ্ডী প্রাণী। সমস্ত দেহটি **বহিস্ত্বকীয় আঁশ** (Epidermal

কতিপয় সরীসৃপ—(ক) গিরগিটি, (খ) ক্যামেলিয়ন, (গ) ড্রাকো ভোলান্স (উড়ুক্কু টিকটিকি), (ঘ) সাপ

scales) দ্বারা আবৃত। সাপ (Snake), টিকটিকি (Lizard), গিরগিটি (Calotes), ক্যামেলিয়ন (Cameleon), কচ্ছপ (Turtle), কুমীর (Crocodile), অ্যালিগেটর (Allegator), হর্ন-টোড (Horn-toad), উড়ুক্কু টিকটিকি ড্রাকো ভোলান্স (Draco volans) প্রভৃতি এই জাতীয় প্রাণী।

পক্ষী বা আভিস (Aves) :—এরা চোয়ালবিশিষ্ট উষ্ণ-শোণিত (Warm-

blooded)* মেরুদণ্ডী প্রাণী। সমস্ত দেহটি পালক দ্বারা আবৃত। অগ্রপদ (Fore-limbs) ডানায় (Wings) ও চোয়াল দুটি চঞ্চুতে (Beaks) রূপান্তরিত হয়েছে। পায়রা (Pigeon), চড়াই (Sparrow), পেলিকান (Pelican), পেঙ্গুইন (Penguin), কিউই (kiwi), উটপাখী (Ostrich), এমু (Emu) ইত্যাদি পাখী এই জাতীয় প্রাণী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য উটপাখী, এমু প্রভৃতি কতিপয় পাখী উড়তে পারে না ; কিন্তু দ্রুত দৌড়োতে পারে।
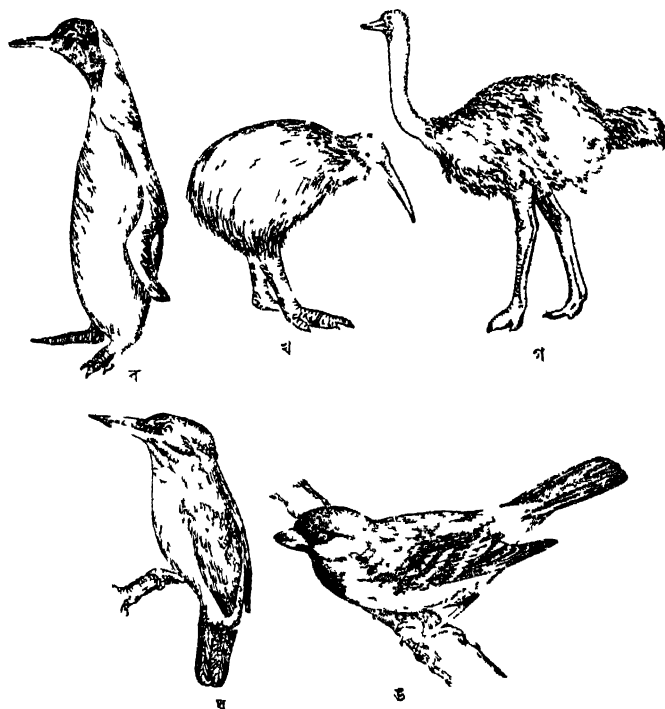
কতিপয় পাখী—(ক) পেঙ্গুইন, (খ) কিউই, (গ) উটপাখী, (ঘ) মাছরাঙা, (ঙ) চড়াই

স্তন্যপায়ী বা ম্যামেল (**Mammals**) :—এরাও চোয়াল বশিষ্ট উষ্ণ শোণিত মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের দেহে **লোম** (**Hairs**), **স্তন** (**Mammary glands**) ও **বহিঃকর্ণ** (**External ear**) বা **পিনা** (**Pinna**) আছে। এরা সন্তান প্রসব করে। হংসচঞ্চু বা প্লাটিপাস (Platypus), ক্যাঙারু (Kangaroo), গিনিপিগ (Guinea Pig), বাদুড় (Bat), তিমি (Whale),

* আবহমণ্ডলের তাপের তারতম্যের ফলে যাদের দেহের তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না তারা উষ্ণশোণিত প্রাণী।

হাতী (Elephant), উড়ুক্কু স্তন্যপায়ী গ্যালিওপিথেকাস (Galeopithecus), মানুষ (Man) ইত্যাদি এইজাতীয় প্রাণী।

কতিপয় স্তন্যপায়ী প্রাণী—(ক) প্লাটিপাস (হংসচঞ্চু), (খ) বাদুড়, (গ) ক্যাঙারু, (ঘ) তিমি, (ঙ) উড়ুক্কু স্তন্যপায়ী গ্যালিওপিথেকাস্

জৈব ক্রমবিবর্তন (Organic evolution) অনুসারে ওপরে প্রাণিজগতের একটি সাধারণ পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেইভাবে পরপৃষ্ঠায় প্রাণী-জগতের বিভাগের একটি ছক দেওয়া হল—

প্রাণিজগৎ (Kingdom-Animalia)

[তিনটি উপজগতে (Subkingdoms) বিভক্ত]

প্রোটোজোয়া (Protoza) [এরা কোষবিহীন (acellular) প্রাণী।] এতে একটি পর্ব (Phylum)।

- পর্ব ১—প্রোটোজোয়া (অ্যামিবা, মোনোসিস্টিস ইত্যাদি)

প্যারাজোয়া (Parazoa) [এরা প্রোটোজোয়া ও মেটাজোয়ার মধ্যবর্তী কোষযুক্ত প্রাণী। কিন্তু কোষগুলিতে পুরোপুরি শ্রম বিভাগ (Division of labour) হয়নি] এতেও একটি পর্ব।

- পর্ব ২—পরিফেরা (Porifera) (সাইকন, স্পঞ্জিলা ইত্যাদি)

মেটাজোয়া (Metazoa) [এরা প্রকৃত কোষযুক্ত প্রাণী, এদের কোষগুলিতে শ্রমবিভাগ (Division of labour) আছে। বাকী আটটি পর্ব এতে অন্তর্ভুক্ত।

- পর্ব ৩—সিলেন্টারেটা (Coelenterata) (হাইড্রা, জেলিফিস ইত্যাদি)
- পর্ব ৪—প্ল্যাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes) (ফিতাকৃমি, যকৃৎকৃমি ইত্যাদি)
- পর্ব ৫—নিমাট্টহেলমিনথিস (Nemathelminthes) (অ্যাসকারিস, হুককৃমি ইত্যাদি)
- পর্ব ৬—অ্যানিলিডা (Annelida) (কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি)
- পর্ব ৭—আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) (চিংড়ি, আরশোলা ইত্যাদি)
- পর্ব ৮—মোলাস্কা (Mollusca) (শামুক, সেপিয়া ইত্যাদি)
- পর্ব ৯—একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) তারামাছ, একাইনাস ইত্যাদি)
- পর্ব ১০—কর্ডাটা (Chordata) (অ্যাম্ফিঅক্সাস, সাইক্লোস্টোম, মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি, পায়রা, গিনিপিগ, মানুষ ইত্যাদি)

প্রাণিকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter-relations) ঃ—প্রাণিজগতের সাধারণ পরিচিতির মধ্যে প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক জানা আবশ্যক। পারস্পরিক সম্পর্ক অনুযায়ী প্রাণীদেরকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **স্বাধীনজীবী** (Free-living) ঃ—এই সকল প্রাণীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলা ফেরা করতে পারে। খাদ্য সংগ্রহের দিক থেকেও এরা আত্মনির্ভরশীল। এদেরকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(ক) **মাংসাশী বা শিকারী** (Carnivorous or Predatory)—এরা অন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে। যেমন—বাঘ, সিংহ ইত্যাদি।

(খ) **উদ্ভিদভোজী** (Herbivorous)—এরা খাদ্যের দিক থেকে সরাসরি উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। যেমন—গরু, ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি।

হাতী
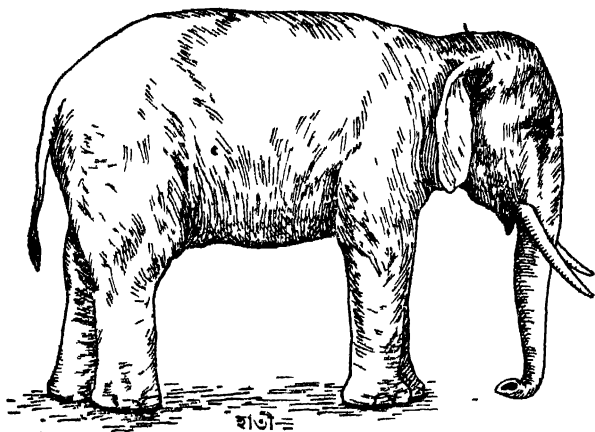
(গ) **সর্বভুক** (Omnivorous)—এরা প্রাণী-উদ্ভিদ সবরকম খাদ্যই গ্রহণ করে। যেমন—চিংড়ি, আরশোলা, মানুষ ইত্যাদি।

(২) **পরজীবী** (Parasitic) ঃ—পরজীবীত্ব (Parasitism) হচ্ছে দু'টি প্রাণীর জৈবিক সংযোগে (in organic connection) পরস্পর সহাবস্থান (Association) এবং যার ফলে একটি প্রাণী অপরটি হতে খাদ্যরস শোষণ ক'রে বেঁচে থাকে। যে প্রাণীটি আশ্রয় ও খাদ্য দেয়, তাকে বলা হয় পোষক প্রাণী বা হোষ্ট (Host) আর অপরটিকে বলে পরজীবী বা প্যারাসাইট

(Parasite)। এই সহবাসে পোষক প্রাণীর হয় ক্ষতি আর পরজীবীর হয় লাভ। অনেক ক্ষেত্রে পরজীবীর আধিক্য হেতু পোষক প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। মানুষের অন্ত্রে এন্টামিবা হিষ্টোলাইটিকা (Entamoeba histolytica), জিয়ার্ডিয়া ইন্টেষ্টিনালিস (Giardia intestinalis), কেঁচোর শুক্রসংক্রান্ত থলিতে (Seminal vesicle) মোনোসিষ্টিস্ (Monocystis) পরজীবী হিসাবে বাস করে।

(৩) সহজীবী (Commensal) ঃ—সহজীবীত্ব (Commensalism) হচ্ছে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে একত্র সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতা। কিন্তু পরজীবীত্বে ও মিথোজীবীত্বে যেমন প্রাণীদের মধ্যে জৈবিক যোগাযোগ আছে, এদের ক্ষেত্রে সেরূপ কোন জৈবিক সংযোগ (Organic connection) থাকে না। যেমন যোগী কাঁকড়ার (Hermit crab) খোলকের ওপর সাগর কুসুমের (Sea-anemone) বাস। এখানে যোগী কাঁকড়া সাগর কুসুমকে আশ্রয় দেয় ও স্থানান্তরে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাগরকুসুম শত্রুর আক্রমণ হতে যোগী কাঁকড়াকে রক্ষা করে।
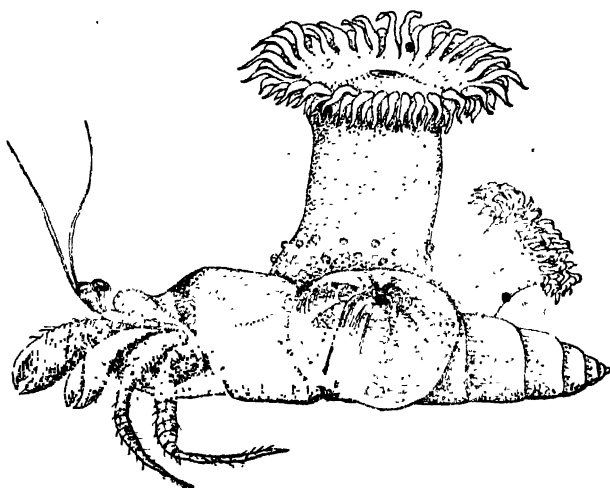
যোগী কাঁকড়ার ওপর কয়েকটি সাগর কুসুম

(৪) অনন্যজীবী বা মিথোজীবী (Symbiotic) ঃ—মিথোজীবীত্ব (Symbiosis) হচ্ছে দু'টি প্রাণীর জৈবিক সংযোগে এমন সহাবস্থান, যেখানে একটির দেহাভ্যন্তরে অপরটি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বসবাস করে।

মিথোজীবীত্বের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছে উই পোকা (Termite) ও ট্রাইকোনিম্ফা (Trichonympha) নামে একটি প্রোটোজোয়ার সহাবস্থান। উইপোকা কাঠের গুঁড়ো ভক্ষণ করে কিন্তু পরিপাক করতে পারে না। আর উইপোকার দেহের ভেতর বসবাসকারী প্রোটোজোয়াটি (ট্রাইকোনিম্ফা) উৎসেচক (Enzymes) নিঃসৃত ক'রে কাঠের সেলুলোজকে হজম করে এবং পরিপাক করা খাদ্য উভয় প্রাণীরই পুষ্টি সাধন করে।

Exercise (অনুশীলনী)

1. Give a reasoned classification of the Animal kingdom upto the phylum-status citing suitable examples.

[যুক্তি ও উদাহরণসহ পর্ব পর্যন্ত প্রাণিজগতের শ্রেণী বিভাগ কর।]

2. What are the Phyla, the Hydra, the Earthworm, the Cockroach and the Toad belong to ? Give reasons in support of your answers.

[হাইড্রা, কেঁচো, আরশোলা ও ব্যাঙ কোন্ কোন্ পর্বের অন্তর্ভুক্ত ? তোমার উত্তরের সমর্থনে কারণ দর্শাও।]

3. Are the Prawn and the Whale fish ? Is the Bat a bird ? Justify their lotus standi in the animal kingdom.

[চিংড়ি ও তিমি কি মাছ ? বাদুড় কি পাখী ? প্রাণিজগতে তাদের স্থান সম্বন্ধে ন্যায়সংগত প্রমাণ দাও।]

4. What do you mean by "Acellular animals" ? Give the salient features of the Phylum to which they belong and mention the names of some disease-producing acellular animals and the diseases they cause.

["কোষ-বিহীন প্রাণী" বলতে কী বোঝ ? তারা যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত তার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা ক'রে রোগসৃষ্টিকারী কতকগুলি কোষ-বিহীন প্রাণীর নাম ও রোগগুলির নাম উল্লেখ কর।]

5. Write notes on :—(a) Parazoa, (b) Coelenterata, (c) Echinodermata, (d) Cold-blooded animal, (e) Parasitism, (f) Symbiosis.

[টীকা লেখ :—(ক) প্যারাজোয়া, (খ) সিলেন্টারেটা, (গ) একাইনোডার্মাটা, (ঘ) অনুষ্ণ-শোণিত প্রাণী, (ঙ) পরজীবীত্ব, (চ) মিথোজীবীত্ব।]

২

কতিপয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্যমূলক বহিরাকৃতি

(Distinctive External Features of Some Animals)

হাইড্রা (Hydra)

ভারতবর্ষের পুকুরে-নদীতে ধূসর বাদামী রঙের **হাইড্রা ভালগারিস** (Hydra vulgaris), সাদা রঙের **পেলমাটোহাইড্রা অলিগ্যাক্টিস** (Pelmatohydra oligactis) প্রভৃতি নামের হাইড্রা দেখা যায়। আমাদের দেশে যে হাইড্রা বহুল পরিমাণে দেখা যায়, তার নাম **হাইড্রা ভিরিডিস** (Hydra viridis)। এদের গায়ের রঙ সবুজ হওয়ায় এদেরকে এখন **ক্লোরোহাইড্রা ভিরিডিসিমা** (Chlorohydra viridissima) বলে। হাইড্রা **সিলেন্টারেটা** (Coelenterata) পর্বের **হাইড্রোজোয়া** (Hydrozoa) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

বহিরাকৃতি :

(External Features)

দেহাকৃতি (Shape) :—এদের দেহ নলাকৃতি (Polypoid form) ও অরীয় সুষম (Radially symmetrical)।

আয়তন (Size) :—দেহ লম্বায় $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি হতে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

হাইপোষ্টোম (Hypostome) :—দেহের অগ্রভাগের অগ্রতম অংশে একটি পিরামিডের মত উঁচু স্থান দেখা যায়, একে হাইপোষ্টোম্ বলে।

মুখছিদ্র (Mouth) :—হাইপোষ্টোমের শীর্ষে একটি ছোট গোলাকার ছিদ্র দেখা যায়—এইটিই এর মুখ। এদের স্বতন্ত্র কোন পায়ুছিদ্র না থাকায় মুখটি পায়ুর কাজও করে।

কর্ষিকা (Tentacles) :—হাইপোষ্টোমের তলদেশ থেকে ও একে বৃত্তাকারে পরিবেষ্টন ক'রে ছয় থেকে আটটি সরু সুতোর ন্যায় কর্ষিকা দেখা যায়। কর্ষিকাগুলি খুব সংকোচী (contractile) ও এদের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু ঢিবি দেখা যায়। এগুলিকে নিমাটোসিষ্টের ব্যাটারি (Batteries of nematocysts) বলে। এদের সাহায্যে এরা আত্মরক্ষা করে ও শিকার ধরে।

পদ বা বেসাল ডিস্ক (Bassal disc) :—এদের দেহের পশ্চাৎ প্রান্তে একটি পুরু পদ বা বেসাল ডিস্ক থাকে। এর সাহায্যে হাইড্রা জলজ উদ্ভিদের পাতায় বা জলের তলাকার অন্য কোন বস্তুর গায়ে আটকে থাকে।

হাইড্রা
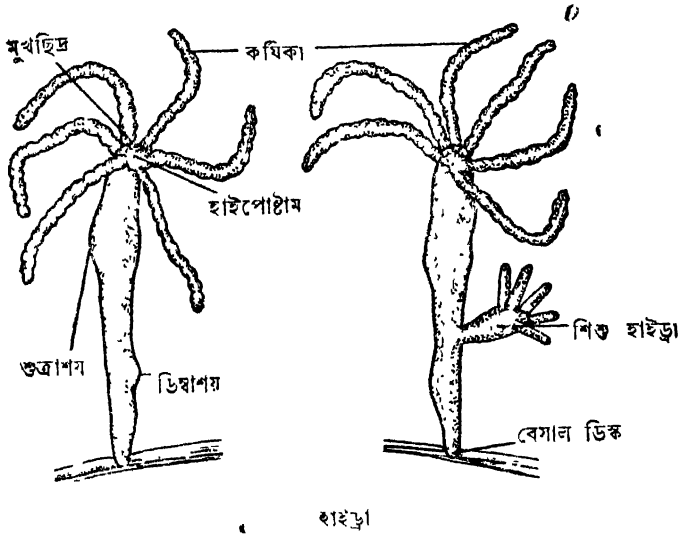
জননাংগ (Reproductive organs):—এদের দেহে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জননাংগই আছে, সেইজন্য এদেরকে উভলিংগ প্রাণী বা হার্মাফ্রোডাইট্ (Hermaphrodite) বলে।

শুক্রাশয় (Testes) :—দেহের অগ্রভাগে হাইপোষ্টোমের নিচে একাধিক ফোলা অংশ দেখা যায়। এগুলি পুরুষ জননাংগ বা শুক্রাশয়।

ডিম্বাশয় (Ovary) :—দেহের পশ্চাৎদিকে ও বেসাল ডিস্কের কিঞ্চিৎ ওপরে একটি স্ফীত অংশ দেখা যায়। একে স্ত্রী জননাংগ বা ডিম্বাশয় বলে।

কুঁড়ি (Bud) :—শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় ব্যতীত হাইড্রার দেহে অনেক সময় এক বা একাধিক উঁচু স্থান দেখা যায়। এই উঁচু স্থানগুলিকে কুঁড়ি (Bud) বলে। প্রতিটি কুঁড়ি ক্রমে ক্রমে হাইপোষ্টোম, কর্ষিকা প্রভৃতি গজিয়ে একটি শিশু হাইড্রায় রূপান্তরিত হয় ও জনিতৃ হাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। অনেক সময় জনিতৃ (Parent) হাইড্রার গায়ে শিশু (Daughter) হাইড্রাকে লেগে থাকতে দেখা যায় (Hydra with Bud)।

কেঁচো (Earthworm)

সাধারণতঃ এরা ভেজা মাটির অভ্যন্তরে থেকে ক্রমাগত মাটি খায় ও পায়ু-ছিদ্র দিয়ে মাটির ওপর বিষ্ঠাকুণ্ডলী নিক্ষেপ করে। যে মাটিতে কেঁচো বাস করে, তার ওপর অনেক বিষ্ঠাকুণ্ডলী দেখা যায়—এইগুলি প্রচুর সারযুক্ত। নীচের মাটি এইভাবে ওপরে এনে ও তা সার যুক্ত ক'রে কেঁচো চাষীদের খুব উপকার করে। এইজন্য **চার্লস ডারুইনের** ভাষায় কেঁচোকে **মাটির স্বাভাবিক কর্ষক** (Natural tillers of the soil) বলে। আমাদের দেশে নানাজাতের কেঁচো দেখা যায়, তাদের মধ্যে **ফেরিটিমা পোস্থুমার** (**Pheretima posthuma**) নাম উল্লেখযোগ্য। এদের দেখতে বেশ বড় সড় ও মোটা সোটা। পেটের দিক অপেক্ষা পিঠের রঙ গাঢ় ও কিঞ্চিৎ কালচে। কেঁচো পর্ব—অ্যানিলিডা (Annelida), শ্রেণী—কিটোপোডা (Chaetopoda) ও বর্গ—অলিগোকিটাব (Oligochaeta) অন্তর্গত প্রাণী।

বহিরাকৃতি ঃ

(External Features)

দেহাকৃতি (Shape) ঃ—এদের দেহ লম্বা, সরু ও গোল এবং দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম (Bilaterally symmetrical)। সমস্ত দেহটি সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১৫০ আংটির মত দেহখণ্ড (Segments or metameres) দ্বারা গঠিত—খণ্ডগুলি একটি সারিতে সারিবদ্ধ। প্রতিটি দেহখণ্ড পরের দেহখণ্ডটি হতে একটি গোলাকার গভীর রেখা (groove) দ্বারা পৃথক করা থাকে। দেহের সম্মুখভাগ স্থচল, কিন্তু পশ্চাৎভাগ ভোঁতা।

দেহায়তন (Size) ঃ—পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এদের দেহ প্রায় সাত-আট ইঞ্চি লম্বা।

কৃত্তিকাবরণী (Cuticle) ঃ—এদের সমস্ত দেহটিকে আবৃত ক'রে একটি পাতলা ও নরম কৃত্তিকাবরণী থাকে।

মুখছিদ্র (Mouth) ঃ—অগ্রভাগের অগ্রপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র অর্ধচন্দ্রাকার ছিদ্র দেখা যায়—এইটিই এর মুখ।

প্রোস্টোমিয়াম (**Prostomium**) **বা ওষ্ঠ** ঃ—দেহের প্রথম দেহখণ্ডের অগ্রভাগে পিঠের দিক থেকে একটি ক্ষুদ্র মাংস-পিণ্ড মুখছিদ্রের ওপর ঝুলে পড়েছে, একে প্রোস্টোমিয়াম বা ওষ্ঠ বলে।

পায়ুছিদ্র (Anus) :—দেহের পশ্চাৎপ্রান্তে একটি গোলাকার ছিদ্র থাকে, সেইটিই পায়ুছিদ্র।

ক্লাইটেলাম্ (Clitellum) :—চতুর্দশ দেহখণ্ড হতে আরম্ভ ক'রে ষোড়শ দেহখণ্ড পর্যন্ত গ্রন্থিযুক্ত কলার এক বিশেষ ফিতের মত আবরণ দেখা যায়, একে ক্লাইটেলাম্ বলে।
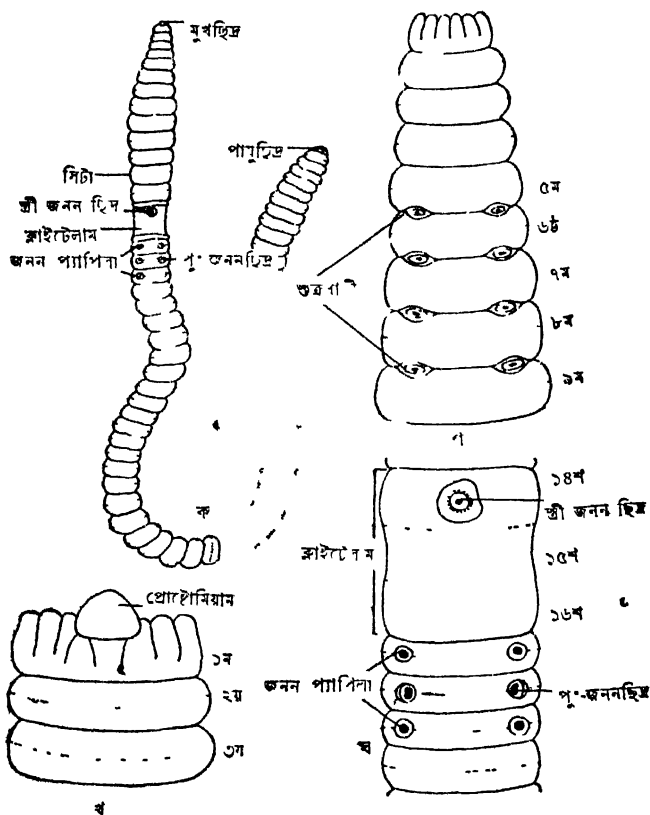
(ক) কেঁচোর অঙ্কীয় দিক, (খ) কেঁচোর অগ্রভাগের কয়েকটি খণ্ডের পৃষ্ঠ দেশ, (গ) কেঁচোর অঙ্ক দেশে শুক্রধানী ছিদ্র, (ঘ) কেঁচোর অঙ্ক দেশে ক্লাইটেলাম ও জননছিদ্র

সিটা (Seta) :—প্রথম, শেষ ও ক্লাইটেলামের দেহখণ্ডগুলি ব্যতীত প্রত্যেক দেহখণ্ডের মাঝে একটি বৃত্তাকারে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত বস্তু দেখা যায়—এদেরকে বলে সিটি (Setae)।

জননছিদ্র (**Genital aperture**) :—কেঁচো উভলিংগ প্রাণী (Hermaphrodite)। চতুর্দশ দেহখণ্ডের অঙ্কদেশের মধ্যরেখায় এদের **স্ত্রী জননছিদ্রটি** (**Female gonopore**) অবস্থিত। **পুরুষ জননছিদ্র** (**Male gonopore**) একজোড়া ও এইগুলি অষ্টাদশ দেখণ্ডের অঙ্কদেশের দু'পাশে অবস্থিত। পুংজননছিদ্রের সামনে ও পেছনে অর্থাৎ সপ্তদশ ও উনবিংশ দেহখণ্ডের প্রত্যেকটিতে এক জোড়া ক'রে আরও মোট চারটি ছিদ্র আছে—ছিদ্রগুলি ছোট ছোট উঁচু স্থান বা জনন প্যাপিলার (Genital papilla) মধ্যে অবস্থিত।

শুক্রধানী ছিদ্র (**Spermathecal pores**) :—অঙ্ক দেশের দু'পাশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তম, সপ্তম ও অষ্টম, অষ্টম ও নবম দেহ খণ্ডগুলির অন্তর্বর্তী রেখায় মোট চারজোড়া শুক্রধানী ছিদ্র থাকে।

পৃষ্ঠছিদ্র (**Dorsal Pores**) :—পিঠের দিকে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ দেহখণ্ডের অন্তবর্তী রেখা হতে আরম্ভ ক'রে কেবল সর্বশেষ অন্তর্বর্তী রেখাটি বাদে দেহের শেষভাগ পর্যন্ত দুটি দেহখণ্ডের অন্তর্বর্তী রেখায় একটি ক'রে পৃষ্ঠছিদ্র দেখা যায়।

রেচনছিদ্র (**Nephridiopores**) :—প্রথম দুটি দেহখণ্ড ব্যতীত সমস্ত দেহে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বর্তমান। এদেরকে রেচনছিদ্র বা নেফ্রিডিয়োপোর বলে।

চিংড়ি (Prawn)

গলদা, বাগদা, কুচো প্রভৃতি নানা জাতের চিংড়ি আমাদের দেশের পুকুর, হ্রদ ও নদীতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গলদা চিংড়ি বা **প্যালিমন কারসিনাস** (**Palaemon carcinus**) আকারে হয় সর্বাপেক্ষা বড়। গলদা চিংড়ি আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের ক্রাসটেসিয়া (Crustacea) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

বহিরাকৃতি :

(External Features)

দেহাকৃতি (Shape) :—এদের দেহ বেশ লম্বা, সম্মুখভাগ স্থূল ও পশ্চাৎভাগ ক্রমশঃ সরু হতে হতে পরিশেষে সূচল হ'য়ে শেষ হয়েছে। দেহটি দ্বিপার্শ্বীয়রূপে প্রতিসম। দেহের দু'পাশ চাপা, পিঠের দিক উত্তল (Convex) ও পেটের

চিংড়ির বহিরাকৃতি

দিক অবতল (Concave)। সমস্ত দেহটি দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত: (১) সামনের দিকে অবস্থিত **শিরোবক্ষ** (Cephalothorax) ও (২) পশ্চাৎদিকে অবস্থিত **উদর** (Abdomen)।

দেহায়তন (Size) :—সাধারণতঃ লম্বায় এরা সাত-আট ইঞ্চি হয়। একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ি অপেক্ষা বড় হয়।

কৃত্তিকাবরণী (Cuticle) :—এদের সমস্ত দেহটি একটি **কঠিন কৃত্তিকাবরণী** (Chitinous cuticle) দ্বারা আবৃত। কৃত্তিকাবরণীটি সমস্ত দেহটিকে ধ'রে রাখে ব'লে একে **বহিঃকঙ্কাল**-ও (Exoskeleton) বলে।

শিরোবক্ষের বর্ণনা :—চিংড়ির দেহের সম্মুখভাগের তেরটি দেহখণ্ড একত্র মিশে গিয়ে শিরোবক্ষ গঠন করেছে। প্রকৃতপক্ষে শিরোবক্ষটি মাথা ও বুকের সমন্বয়—কিন্তু একটিকে অপরটি হতে আলাদা ক'রে চেনা মুস্কিল।

কৃত্তিকাবর্ম বা ক্যারাপেস (Carapace)—শিরোবক্ষে একটি বেশ বড় খোলস দেখা যায়। একে ক্যারাপেস বলে। এটি শিরোবক্ষকে পিঠ ও দু'পাশ থেকে আবৃত ক'রে রাখে। এর অগ্রভাগের প্রতিপাশে একজোড়া কাঁটা (Spines) দেখা যায়। সামনের কাঁটাটি অপেক্ষাকৃত বড় ও একে বলা হয় **শুঁড় কাঁটা** (Antennal spine) এবং পেছনের কাঁটাটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও একে বলে **যকৃৎ কাঁটা** (Hepatic spine)।

রসট্রাম (Rostrum)—ক্যারাপেসের অগ্রভাগটি ক্রমশঃ সরু হ'য়ে নীচে-ওপরে করাতের দাঁতের মত শ্রেণীবদ্ধ কাঁটাযুক্ত একটি শক্ত সূচল অংশে পরিণত হয়েছে, একে রসট্রাম বলে।

পুঞ্জাক্ষি (Compound eye)—শিরোবক্ষের সামনের দিকে রসট্রামের গোড়ার দু'ধারে এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি দেখা যায়। অসংখ্য সরলাক্ষি (Simple eyes) একত্র মিলিত হয়ে একটি পুঞ্জাক্ষি গঠন করে। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি দু'টি খণ্ডবিশিষ্ট একটি **নড়নশীল বৃন্তের** (Movable Stalk) ওপর অবস্থিত।

মুখছিদ্র (Mouth)—এদের মুখছিদ্রটি শিরোবক্ষের অঙ্কদেশে অবস্থিত ও সাধারণতঃ কয়েকটি মাথার উপাঙ্গ দিয়ে ঢাকা থাকে।

উদরের বর্ণনা :—শিরোবক্ষের পশ্চাৎভাগ হতে আরম্ভ ক'রে দেহের শেষ প্রান্ত অবধি উদরটি অবস্থিত। উদরটি মোট ছয়টি দেহখণ্ড নিয়ে গঠিত। উদরের কৃত্তিকাবরণীটি ছয়টি সঞ্চরণশীল (Flexible) খণ্ডে বিভক্ত—খণ্ডগুলি

একটির ওপর একটি ক'রে পর পর সাজানো। কৃত্তিকাবরণীর এই খণ্ডগুলিকে স্ক্লেরাইট (Sclerite) বলে। ষষ্ঠ বা সর্বশেষ স্ক্লেরাইটটি লম্বা কোণাকৃতি হ'য়ে সূচল অবস্থায় শেষ হয়েছে ; একে **টেলসন** (Telson) বলে।

চিংড়ির দেহের উপাঙ্গসমূহ
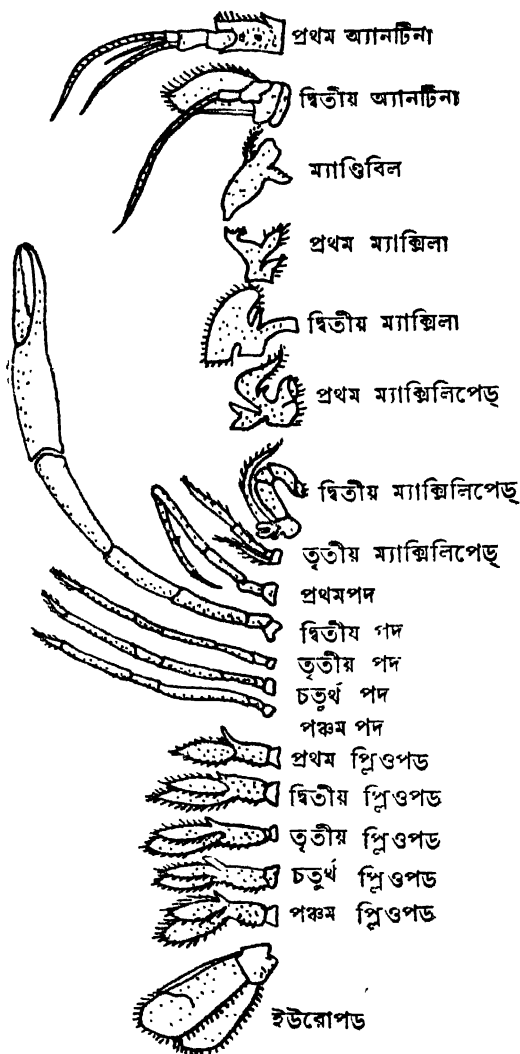
পায়ুছিদ্র (Anus)—উদরের শেষ দেহখণ্ডের অঙ্কদেশে (ventral side) পায়ুছিদ্রটি অবস্থিত।

উপাঙ্গ (Appendages) :—চিংড়ির দেহে মোট উনিশ জোড়া উপাঙ্গ আছে। তার মধ্যে প্রথম শুঁড় বা অ্যান্টিনা (First antenna), দ্বিতীয় অ্যান্টিনা (Second antenna) দাঁতালো চোয়াল বা ম্যাণ্ডিবিল (mandible), প্রথম ম্যাক্সিলা (First maxilla) ও দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা (Second maxilla) এই পাঁচজোড়া **শির উপাঙ্গ** (Cephalic appendages) বলে পরিচিত। আর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড্ (Maxillipeds) ও পাঁচজোড়া পদ (Walking legs) এই আট জোড়াই **বক্ষ উপাঙ্গ** (Thoracic appendages) এবং আর বাকী পাঁচজোড়া প্লিওপড্ (Pleopods or swimmerets) ও একজোড়া ইউরোপড্ (Uropods) হচ্ছে **উদরের উপাঙ্গ** (Abdominal appendages)।

জননছিদ্র (Genital opening) :—চিংড়ি একলিংগবিশিষ্ট (Unisexual) প্রাণী অর্থাৎ এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। এক জোড়া স্ত্রী জননছিদ্র (Female genital opening) স্ত্রী চিংড়ির তৃতীয় পদের গোড়ায় অবস্থিত। পুরুষ জননছিদ্রও (Male genital opening) একজোড়া এবং এগুলি পুরুষ চিংড়ির পঞ্চম পদের গোড়ায় অবস্থিত।

রেচনছিদ্র (Renal opening) :—দ্বিতীয় অ্যানটিনার প্রতিটির গোড়ায় একটি ক'রে মোট দু'টি ছিদ্র দেখা যায়—এইগুলি রেচনছিদ্র (Excretory pore)।

পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ির বহিরাকৃতির পার্থক্য
(Sexual Dimorphism in Prawn)

পুরুষ	স্ত্রী
১। একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ি অপেক্ষা আকারে বড় হয়।	১। একই বয়সের স্ত্রী চিংড়ি পুরুষ চিংড়ি অপেক্ষা আকারে ছোট হয়।
২। বক্ষ উপাঙ্গ বা পদগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থিত।	২। বক্ষ উপাঙ্গগুলি কিছু দূরে দূরে অবস্থিত।
৩। রসট্রামটি অপেক্ষাকৃত বড় ও বেশী সংখ্যক শক্ত কাঁটাযুক্ত।	৩। রসট্রামটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম কাঁটাযুক্ত।

পুরুষ	স্ত্রী
৪। দ্বিতীয় জোড়া পদটি আকারে বেশ বড়, মোটা ও অধিক সংখ্যক কাঁটাযুক্ত হয়।	৪। দ্বিতীয় জোড়া পদটি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, সরু ও অল্প সংখ্যক কাঁটাযুক্ত থাকে।
৫। দ্বিতীয় জোড়া উদর উপাঙ্গ বা প্লিওপডের প্রত্যেকটিতে **অ্যাপেন-ডিক্স ম্যাসকিউলিনা** (**Appendix masculina**) নামে একটি অতিরিক্ত অংশ থাকে।	৫। দ্বিতীয় প্লিওপডে কোন অতিরিক্ত অংশ বা অ্যাপেনডিক্স ম্যাসকিউলিনা থাকে না।
৬। জননছিদ্র পঞ্চম পদের গোড়ায় অবস্থিত।	৬। জনন ছিদ্র তৃতীয় পদের গোড়ায় অবস্থিত।

আরশোলা (Cockroach)

আরশোলা নানা জাতের। আমাদের দেশে যে সমস্ত আরশোলা দেখা যায় তাদের মধ্যে **পেরিপ্লানেটা অ্যামেরিকানা** (**Periplaneta americana**) ও **ব্লাটা অরিয়েণ্টালিসের** (**Blatta orientalis**) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেরিপ্লানেটা অপেক্ষাকৃত লম্বা ও এর ডানা বেশ বড়—উদরকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত ক'রেও পশ্চাৎভাগে কিঞ্চিৎ বের হয়ে থাকে ; আর ব্লাটা অপেক্ষাকৃত বেঁটে ও এর ডানা ছোট হওয়ায় উদরটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে না। আরশোলা আর্থ্রোপোডা পর্বের ইনসেক্টা (Insecta) বা পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

বহিরাকৃতি ঃ
(External Features)

দেহাকৃতি (Shape) :—এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়রূপে প্রতিসম এবং পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্কদেশ হ'তে চাপা। সমস্ত দেহটি তিনটি অংশে বিভক্ত—মাথা, বক্ষ ও উদর। মাথা ও বক্ষ একটি সরু ও ছোট গলা (neck) দ্বারা সংযোজিত থাকে—একে **সারভিকাম** (**Cervicum**) বলে।

দেহায়তন (Size) :—এদের দেহ সাধারণতঃ দেড় থেকে দু' ইঞ্চির মত লম্বা হয়।

কৃত্তিকাবরণী (Cuticle) :—সমস্ত দেহটি একটি শক্ত কৃত্তিকাবরণী (Chitinous cuticle) বা বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton) দ্বারা আবৃত থাকে। কৃত্তিকাবরণীটি কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত। কৃত্তিকাবরণীর এই খণ্ডগুলিকে স্ক্লেরাইট (Sclerites) বলে। প্রতিটি পিঠের স্ক্লেরাইটকে (Dorsal sclerite) বলে **টারগাম** (Tergum), প্রতিটি অঙ্কীয়
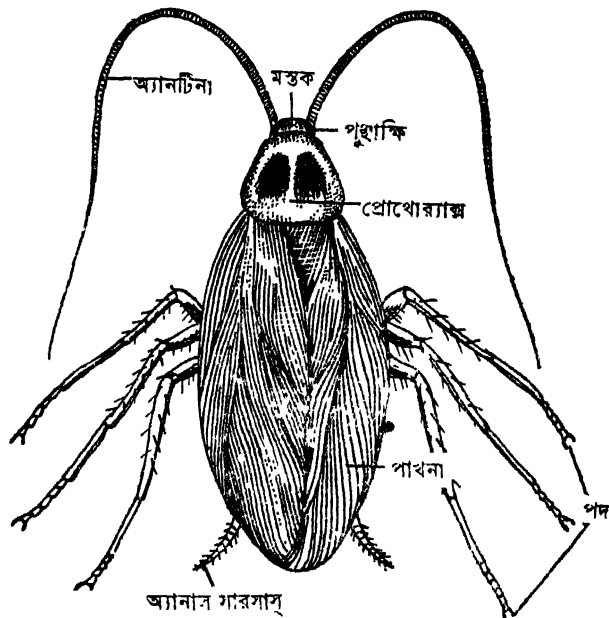
আরশোলার পিঠের দিক

স্ক্লেরাইটকে (Ventral sclerite) বলে **স্টারনাম** (Sternum)। টারগাম ও স্টারনামের সংযোগস্থলে অবস্থিত পার্শ্বীয় স্ক্লেরাইটগুলিকে (Lateral sclerites) বলে **প্লুরা** (Pleura)।

মাথার (Head) বর্ণনা :—আরশোলার মাথাটি খুব ছোট ও এর স্ফীত দিকটি ওপরে এবং সরু দিকটি নিচের দিকে অবস্থিত।

এপিক্র্যানিয়াম (Epicranium)—মাথার ওপরের স্থূল অংশটিকে এপিক্র্যানিয়াম বলে। একটি ইংরাজী 'Y' বর্ণের মত রেখা (Sutures) এপিক্র্যানিয়ামটিকে দু'টি সমান ভাগে বিভক্ত ক'রে রাখে।

ফ্রন্‌স (Frons)—এপিক্র্যানিয়ামের সম্মুখে অবস্থিত খালি জায়গাটিকে ফ্রন্‌স বলে।

ক্লাইপিয়াস (Clypeus)—এটি ফ্রন্‌সের সামনের আয়তাকার অংশ।

জিনা (Gena)—মাথার দু'পাশের অংশকে গণ্ডদেশ বা জিনা বলে।

পুঞ্জাক্ষি (Compound eye)—মাথার দু'পাশে একজোড়া বৃন্তহীন (Sessile or unstalked) পুঞ্জাক্ষি দেখা যায়।

শুঁড় বা অ্যানটিনা (Antenna)—মাথার অগ্রভাগের দু'পাশে একটি ক'রে মোট দু'টি সরু সুতোর মত বহু গাঁটযুক্ত শুঁড় আছে।
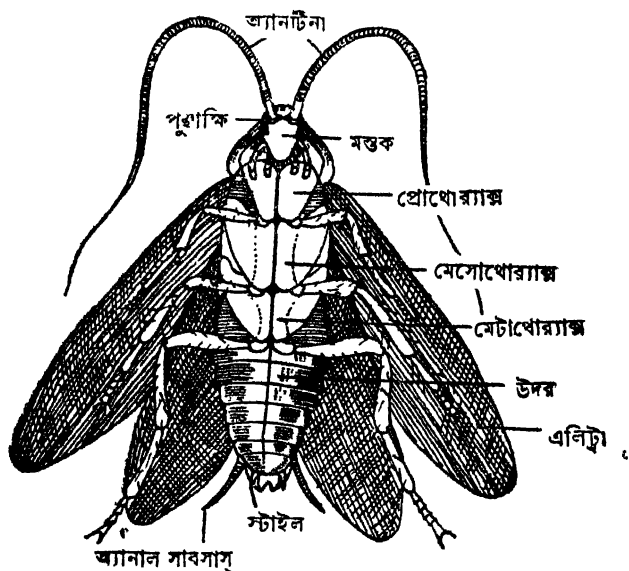
আরশোলার অঙ্কীয় দিক

ফেনেস্ট্রা (Fenestra)—মাথার ওপর প্রতিটি শুঁড়ের গোড়ার একপাশে একটি সাদা গোলাকার চকচকে দাগ দেখা যায়, একে ফেনেস্ট্রা বলে।

মুখছিদ্র (Mouth)—মাথার অঙ্কদেশের সরু অংশটির মধ্যস্থলে মুখছিদ্রটি অবস্থিত। মুখছিদ্রটিকে ঘিরে কতকগুলি উপাঙ্গ রয়েছে, এদেরকে মুখ-উপাঙ্গ (Mouth parts) বলে। একটি **উপরোষ্ঠ বা ল্যাব্রাম** (Labrum), একটি **অধরোষ্ঠ বা লেবিয়াম** (Labium), একজোড়া দাঁতালো **চোয়াল বা**

ম্যাণ্ডিবিল (Mandible) ও একজোড়া **ম্যাক্সিলা** (Maxilla) মুখ-উপাঙ্গের অন্তর্গত।

বক্ষের (Thorax) বর্ণনা :—এদের বক্ষটি তিনটি অংশে বিভক্ত—সামনেরটি **অগ্রবক্ষ** বা **প্রোথোর্যাক্স** (Prothorax), মাঝেরটি **মধ্যবক্ষ** বা **মেসোথোর্যাক্স** (Mesothorax) ও পেছনেরটি **পশ্চাৎবক্ষ** বা **মেটাথোর্যাক্স** (Metathorax)। অগ্রবক্ষটি বেশ বড় ও দেখতে ঢালের মত। পর্যায়ক্রমে মধ্য ও পশ্চাৎ বক্ষদ্বয় ছোট ও পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ।
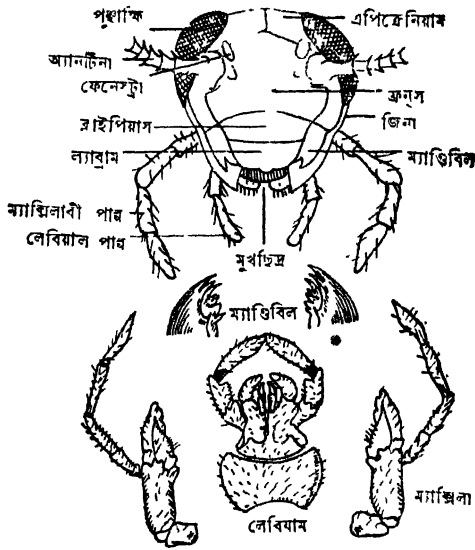
আরশোলার মাথা ও বিভিন্ন মুখ-উপাঙ্গ

পদ (Legs)—প্রতিটি বক্ষাংশের অঙ্কদেশ হ'তে একজোড়া ক'রে পদ বের হওয়ায়, এদের মোট পদ সংখ্যা তিন জোড়া। পদগুলি গাঁটযুক্ত।

ডানা (Wings)—মধ্য ও পশ্চাৎ বক্ষের প্রতিটি থেকে একজোড়া ক'রে মোট দু'জোড়া ডানা বা পাখনা বের হয়েছে। ডানাগুলি কৃত্তিকাবরণী নির্মিত। সামনের দিকের ডানাজোড়াটি বড় ও তাদের **এলিট্রা** (Elytra) বলে। কারণ এরা ওড়ায় সাহায্য করে না কেবল পশ্চাৎভাগের ডানা জোড়াটিকে ঢেকে রাখে। পেছনের ডানাজোড়াটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও ঝিল্লী মত (Membranous)। এরাই আরশোলাকে উড়তে সাহায্য করে।

উদরের (Abdomen) বর্ণনা ঃ—উদরটি মোট দশটি দেহখণ্ড নিয়ে গঠিত। দৃশ্যতঃ সাতটি খণ্ড সুস্পষ্ট। পেছনের দেহখণ্ডগুলি এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে অষ্টম ও নবম খণ্ড সপ্তম দেহখণ্ডের তলায় ঢাকা প'ড়ে গেছে। দশম দেহখণ্ডের টারগামটি মাঝখানে একটি খাঁজযুক্ত হ'য়ে উদরের পশ্চাৎ প্রান্তের বাইরে কিঞ্চিৎ বেরিয়ে থাকে। স্ত্রী আরশোলার উদরের পশ্চাৎভাগটি স্থূল ও বিস্তৃত হয়।

অ্যানাল সারসি (Anal cerci)—উদরের শেষভাগের দু'পাশে বহু গাঁটযুক্ত একজোড়া উপাঙ্গ দেখা যায়—এদেরকে অ্যানাল সারসি বলে।

স্টাইল (Style)—পুরুষ আরশোলার উদরের নবম দেহখণ্ডের দু'ধারে দু'টি গাঁটবিহীন উপাঙ্গ দেখা যায়, এদেরকে স্টাইল বলে। স্ত্রী আরশোলায় এদের দেখা যায় না।

আরশোলার দেহের বিভিন্ন ছিদ্র ঃ

মুখছিদ্র (Mouth)—এর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

পায়ুছিদ্র (Anus)—উদরের দশম দেহখণ্ডের টারগামের তলায় এর অবস্থান।

জননছিদ্র (Gonopore)—স্ত্রী জননছিদ্র স্ত্রী আরশোলার উদরের অষ্টম দেহখণ্ডের স্টারনামে অবস্থিত। পুং জননছিদ্র পুরুষ আরশোলার উদরের দশম টারগাম ও নবম স্টারনামের মাঝখানে অবস্থিত।

শ্বাসছিদ্র (Spiracles or Stigmata)—আরশোলার দেহের পিঠের দিকে দু'পাশে দেহখণ্ডের অন্তর্বর্তী রেখাগুলির মধ্যে মোট দশজোড়া শ্বাসছিদ্র আছে। প্রথম দু'জোড়া বক্ষে ও বাকী আট জোড়া উদরে অবস্থিত।

শতপদী প্রাণী (Centiped)

তেঁতুলে বিছেকেই শতপদী প্রাণী বলে। এরা নানা জাতের হয়। সাধারণতঃ বাক্স, বিছানার তলায়, দেয়ালের ফাঁকে প্রভৃতি জায়গায় এদের দেখা যায়। তেঁতুলে বিছের বৈজ্ঞানিক নাম **স্কলোপেনড্রা** (**Scolopendra**)। এরা পর্ব-আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) ও শ্রেণী-কিলোপোডার (Chilopoda) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

বহিরাকৃতি :

(External Features)

দেহাকৃতি :—এদের দেহ লম্বা, পিঠ ও পেটের দিক থেকে চাপা (Dorso- ventrally flattened) ও দ্বিপার্শ্বীয়রূপে প্রতিসম। সমস্ত দেহটি দু'টি ভাগে বিভক্ত—(১) মাথা (Head) ও (২) ধড় (Trunk)।

দেহআয়তন :—পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা লম্বায় প্রায় সাত-আট ইঞ্চি হয়।

কৃত্তিকাবরণী :—সমস্ত দেহটি একটি শক্ত কৃত্তিকাবরণী (Chitinous cuticle) দ্বারা আবৃত। কৃত্তিকাবরণীটি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড দৃশ্যত: তেঁতুল বীচির মত।

মাথার বর্ণনা :—দেহের অগ্র ভাগে অবস্থিত মাথাটি স্পষ্ট ও ধড় অপেক্ষা অনেক ছোট। মাথাটি একটি কৃত্তিকাবরণীর প্লেট দ্বারা আবৃত থাকে, তাকে **সেফালাইট** (cephalite) বলে।

শুঁড় বা অ্যানটিনা :—বার অথবা ততোধিক গাঁটযুক্ত একজোড়া শুঁড় মাথার অগ্রভাগের দু'পাশে বিদ্যমান।

তেঁতুলে বিছের বহিরাকৃতি

সরলাক্ষির গুচ্ছ (Aggregate or composite eyes or ocelli) :—

শুঁড়ের তলদেশে মাথার দু'পাশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলাক্ষি থাকে, এদেরকে সরলাক্ষির গুচ্ছ বলে, কেননা এরা মিলিত হয়ে পুঞ্জাক্ষি গঠন করেনি।

মুখছিদ্র :—মাথার অগ্রপ্রান্তের কিঞ্চিৎ তলদেশে মুখছিদ্রটি অবস্থিত।

চোয়াল বা ম্যাণ্ডিবিল (Mandible) :—এক জোড়া শক্ত দাঁতালো চোয়াল মুখছিদ্রের দু'পাশে অবস্থিত।
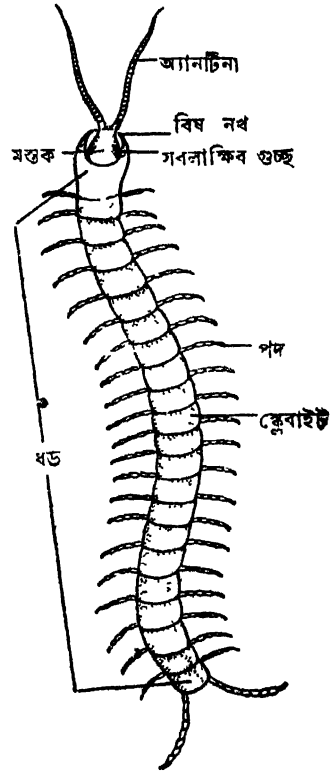
ম্যাক্সিলা (Maxilla) :—এদের সর্বসমেত দু'জোড়া ম্যাক্সিলা চোয়ালের পরেই মুখছিদ্রকে ঘিরে সজ্জিত থাকে। ম্যাক্সিলার প্রথম জোড়ার পরে দ্বিতীয় জোড়াটি অবস্থিত। দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলার তলার দিকটা একত্র মিশে অধঃরোষ্ঠ বা লেবিয়াম (labium) গঠন করেছে।

ওপরোষ্ঠ বা ল্যাব্রাম (Labrum) :—মুখছিদ্রের ঠিক ওপরে ক্ষুদ্র অথচ বিস্তৃত একটি উপাঙ্গ দেখা যায়—একে ওপরোষ্ঠ বলে।
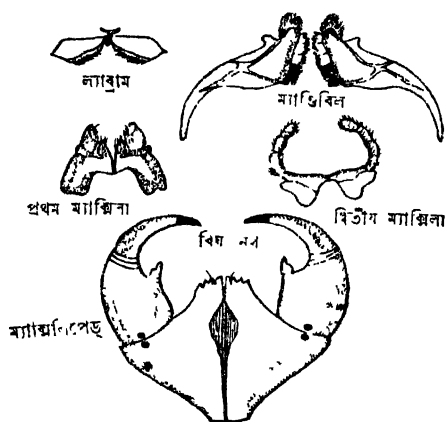
তেঁতুলে বিছের মুখ-উপাঙ্গ

ম্যাক্সিলিপেড (Maxillipeds) বা বিষাক্ত নখর (Poison claws) :—যদিও এটি মাথার দিকে মুখছিদ্রের দু'পাশে অবস্থিত এটি প্রকৃত পক্ষে ধরের উপাঙ্গ। ধড়ের প্রথম দেহখণ্ডের পদজোড়া রূপান্তরিত হয়েই ম্যাক্সিলিপেড বা বিষাক্ত নখরের সৃষ্টি করেছে। এর ডগাটি বিষগ্রন্থির ছিদ্রযুক্ত বাঁকা কাঁটার ন্যায় একটি তীক্ষ্ণ নখরে পরিণত হয়েছে।

ধরের (Trunk) বর্ণনা :—ধড়ের দেহখণ্ডগুলি সংখ্যায় সাধারণতঃ কুড়িটি ও একেকটিকে দেখতে তেঁতুলের বীচির মত, আগেই বলা হয়েছে। প্রথম দেহখণ্ডের পদজোড়াটি ম্যাক্সিলিপেডে রূপান্তরিত হয়েছে। আর বাকী দেহখণ্ডের প্রত্যেকটির অঙ্কদেশের পাশ হতে এক জোড়া ক'রে পদ বের হয়েছে। প্রতিটি পা সাতটি খণ্ড নিয়ে গঠিত। শেষ-পদ-জোড়াটি সর্বাপেক্ষা বড়। নাম শতপদী হলেও এদের যে একশ'টি পা থাকবে এমন কোন কথা নয়।

পায়ুছিদ্র—ধড়ের শেষ দেহখণ্ডের প্রান্তদেশে পায়ুছিদ্রটি অবস্থিত।

জননছিদ্র—ধড়ের শেষ দেহখণ্ডের আগের দেহখণ্ডটির অঙ্কদেশের মধ্য-স্থলে এদের জননছিদ্র অবস্থিত।

শ্বাসছিদ্র (Stigmata)—উদরের প্রতিটি দেহখণ্ডের দু'পাশে একজোড়া ক'রে শ্বাসছিদ্র থাকে।

উর্ণনাভ বা মাকড়সা (Spider)

বিশ হাজার প্রজাতিরও বেশী মাকড়সার সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রপিঠ থেকে আরম্ভ ক'রে উচ্চতম পর্বত পর্যন্ত, সমুদ্র সৈকত ও মিষ্টিজলের জলা থেকে আরম্ভ ক'রে শুষ্ক মরুভূমি পর্যন্ত, পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে, মাটির ওপর বা মাটির ভেতরে, বাড়ী-ঘরের আনাচে-কানাচে প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় এদের বাস। এরা স্বাধীনজীবী (Free-living) ও শিকারী (Predaceous) প্রাণী—সাধারণতঃ এদের জালের সাহায্যে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ ধ'রে জীবন ধারণ করে। এরা পর্ব আর্থ্রোপোডা ও আট পদবিশিষ্ট হওয়ায় শ্রেণী অ্যারাকনিডার (Arachnida) অন্তর্গত প্রাণী।

বহিরাকৃতি ঃ

(External Features)

দেহাকৃতি :—এদের দেহটি দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম ও দুটি অংশে বিভক্ত—(১) শিরোবক্ষ (Cephalothorax) ও (২) উদর (Abdomen)।
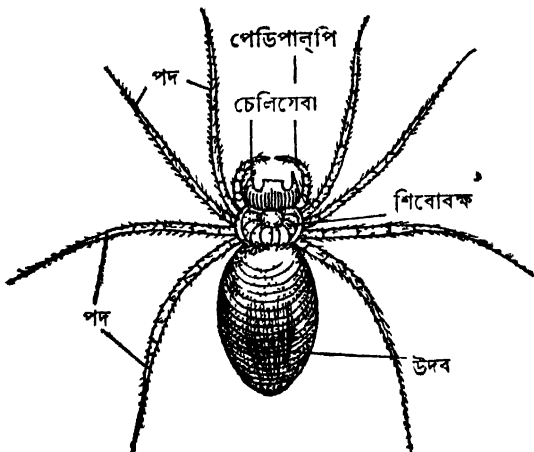
মাকড়সার বহিরাকৃতি

এদের কোন গ্রীবা (Neck) নেই, কিন্তু ক্ষুদ্র কটিবন্ধ (Waist) আছে। কটিবন্ধটি শিরোবক্ষ ও উদরকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছে। একে পেডাঙ্কলও (Peduncle) বলে।

দেহায়তন :—ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন রকম মাকড়সা দেখা যায়। সুতরাং এদের দেহায়তনও বিভিন্ন। তবে পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সা অপেক্ষা আয়তনে খুব ছোট হয়।

কৃত্তিকাবরণী :—সমস্ত দেহটি লোমযুক্ত একটি শক্ত কৃত্তিকাবরণী দ্বারা আবৃত। বিভিন্ন প্রজাতিতে, কৃত্তিকাবরণীর কাঠিন্য, রঙ্‌ ও লোমের তারতম্য দেখা যায়।

শিরোবক্ষের বর্ণনা :—উদর অপেক্ষা শিরোবক্ষ আকারে ছোট ও এতে নিম্নলিখিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়—

চক্ষু—সাধারণতঃ শিরোবক্ষের অগ্রভাগের পৃষ্ঠদেশের দুই বা ততোধিক সারিতে মোট আটটি **সরলাক্ষি** (Simple eyes) দেখা যায়।

মুখছিদ্র—শিরোবক্ষের অগ্রপ্রান্তের কিঞ্চিৎ নিম্নদেশে মুখছিদ্রটি অবস্থিত।

চেলিসেরা (Chelicera)—মুখছিদ্রের দু'পাশে বিষগ্রন্থিযুক্ত চোয়াল আছে এগুলিকে চেলিসেরি (Chelicerae) বলে। প্রত্যেকটি চেলিসেরা একটি তীক্ষ্ণ নখরে শেষ হয়েছে। নখরের ডগায় বিষ নিঃসরণের জন্য একটি ছিদ্র আছে।

পেডিপাল্পি (Pedipalpi)—প্রত্যেকটি চেলিসেরার পাশে একটি ক'রে ছয়টি গাঁটযুক্ত উপাঙ্গ আছে—এদেরকে পেডিপাল্পি বলে। স্ত্রী মাকড়সার পেডি-পাল্পিগুলিকে দেখতে অনেকটা পায়ের মত। কিন্তু পুরুষ প্রাণীতে এগুলি ছোট ও ডগার দিকটা স্ফীত হয়ে শেষ হয়েছে। পেডিপাল্পির প্রশস্ত গোড়া-দ্বয় খাদ্যবস্তুকে পেষণ ও চর্বণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাকড়সার মাথার সম্মুখ ভাগ

পদ—শিরোবক্ষের অঙ্কদেশ হতে আরও চারজোড়া উপাঙ্গ বের হয়েছে। এদেরকে পদ বলে। প্রতিটি পা সাতটি ভাগ যুক্ত যথা—কক্সা (Coxa), ট্রোকেণ্টার (Trochanter), ফিমার (Femur), প্যাটেলা (Patella), টিবিয়া (Tibia), মেটাটারসাস (Metatarsus) ও টারসাস্ (Tarsus)।

উদরের বর্ণনা :—উদরটি শিরোবক্ষ অপেক্ষা বড় ও ডিম্বাকার। উদর নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত—

পায়ুছিদ্র—উদরের পশ্চাভাগের শেষপ্রান্তে পায়ুছিদ্রটি অবস্থিত।

জালবুননাংগ (Spinnerets)—পায়ুছিদ্রের সম্মুখভাগে উদরের তলদেশে দুই থেকে তিনজোড়া গ্রন্থিযুক্ত জালবুননাংগ থাকে—এগুলি নড়নক্ষম ও প্রচুর ছিদ্রযুক্ত।

জননছিদ্র—উদরের অগ্রভাগের তলদেশে জননছিদ্রটি অবস্থিত।

বই ফুসফুসের ছিদ্র—(Stigmata of the book-lungs)—সাধারণতঃ একজোড়া বই ফুসফুসের ছিদ্র জননছিদ্রের অগ্রভাগে দেখা যায়।

শ্বাসছিদ্র (Spiracle)—উদরের তলদেশে পায়ুছিদ্রের অগ্রভাগে দেহাভ্যন্তরের ছোট শ্বাসনালীর সাথে যুক্ত একটি শ্বাসছিদ্র দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এরা **বই ফুস ফুস** (Book lungs) ও **শ্বাসনালী** (Trachea) উভয়ের সাহায্যেই শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে।

শামুক (Snail)

প্রধানতঃ শামুক দু'রকমের—জলের শামুক (Pond snail) আর ডাঙার শামুক (Land snail)। জলেতে যেমন বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন নামের শামুক আছে ডাঙাতেও তেমনি নানা ধরণের নানান নামের শামুক আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুকুরে, ডোবায়, খালে-বিলে, ধানক্ষেতে যে শামুক দেখা যায়, তার নাম **পাইলা গ্লোবোসা** (Pila globosa) বা **অ্যাম্পুলারিয়া গ্লোবোসা** (Ampullaria globosa)। একে আপেল শামুকও (apple snail) বলে। মাঝে মাঝে জল ছেড়ে এরা ডাঙায়ও উঠে আসে। আর ডাঙায় যে শামুক আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখা যায়, তার নাম **অ্যাকাটিনা ফিউলিকা** (Achatina fulica)। এরা পর্ব-মোলাস্কার (Mollusca) অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী গ্যাস্ট্রোপোডার (Gastropoda) অন্তর্গত প্রাণী।

জলের শামুকের বহিরাকৃতি :

(External features of Pila globosa)

দেহাকৃতি :—এদের দেহের মাথার দিকটি ও অঙ্কদেশে অবস্থিত প্রশস্ত পদটি দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। কিন্তু, দেহের বাকী অংশ একটি প্যাঁচানো খোলকে আবৃত হওয়ায় অসম (asymmetrical)।

খোলক (Shell)—খোলকটি মোটামুটি গোলাকার ও কয়েকটি পাকে প্যাচানো। এটি চূর্ণকনির্মিত ও এর বাইরের দিকে একটি কঠিন পদার্থের পাতলা আস্তরণ আছে। প্যাচগুলি দক্ষিণাবর্ত (Dextral) ও প্যাচের প্রথম পাকটি ক্ষুদ্রতম ও শেষের পাকটি বৃহত্তম। খোলকের শেষ পাকের মুখে একটি প্রশস্ত ছিদ্র দেখা যায়, একে খোলকের মুখ বলে। ছিদ্রটি একটি শক্ত
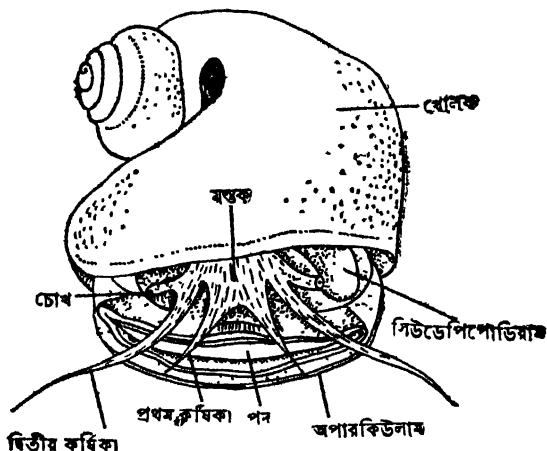
জলের শামুকের (পাইলা গ্লোবোসা) পৃষ্ঠদেশীয় চিত্র

চাকৃতি দ্বারা ঢাকা থাকে। চাকৃতিটিকে **ঢাকনা** বা **অপারকিউলাম** (Operculum) বলে। প্রয়োজনমত ঢাকনাটি খুলে যায় এবং মাথা ও পদ সেই প্রশস্ত ছিদ্রপথে বের হ'য়ে আসে। বিশ্রামকালে শামুক মাথা ও পদ খোলকের ভেতর গুটিয়ে নিলে, ঢাকনাটির সাহায্যে খোলকের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

মাথা :—প্রশস্ত পদটির ঠিক ওপরেই এদের মাথাটি অবস্থিত। মাথাটি একটি তুণ্ড (Snout) যুক্ত।

মুখছিদ্র :—মাথার অগ্রভাগের কিঞ্চিৎ তলদেশে এদের মুখছিদ্রটি দেখা যায়।

কর্ষিকা (Tentacle) :—এদের মাথার অগ্রভাগের দু'ধারে মোট দু'জোড়া কর্ষিকা দেখা যায়। কর্ষিকার সামনের জোড়াটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও

মুখছিদ্রের দুইকোণ সম্প্রসারিত হয়েই এদের গঠন করেছে ; সেইজন্য এদেরকে **অধরোষ্ঠীয় পাল্প** বা **লেবিয়াল পাল্প**ও (Labial palps) বলে। কর্ষিকার দ্বিতীয় জোড়াটি বেশ বড় ও প্রথম জোড়াটির ঠিক পশ্চাতে অবস্থিত।

চোখ :—প্রতিটি দ্বিতীয় কর্ষিকার ঠিক গোড়ায় একটি ক'রে বৃন্তযুক্ত (Stalked) সরলাক্ষি দেখা যায়।

নিউকাল লোব (Nuchal lobes) :—মাথার দু'পাশ থেকে পায়ের ওপর দু'টি স্ফীত মাংসল অংশ ঝুলে পড়েছে, এদেরকে নিউকাল লোব বা **সিউডেপিপোডিয়াম** (Pseudepipodium) বলে।
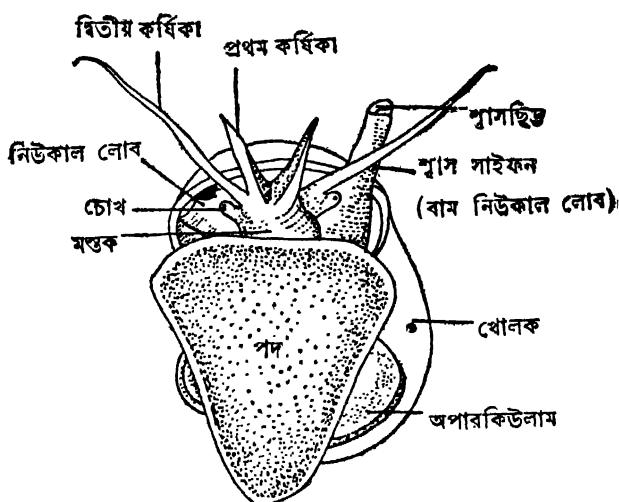
পাইলা গ্লোবোসার অঙ্কদেশীয় চিত্র

শ্বাসছিদ্র (Respiratory opening) :—বাঁ দিকের নিউকাল লোবটি লম্বা টিউবের মত ও এর অগ্রভাগের মুখে শ্বাসছিদ্রটি অবস্থিত। সেইজন্য এই নিউকাল লোবটিকে **শ্বাস-সাইফন** (Respiratory siphon) বলে।

পায়ুছিদ্র :—দেহের ডান পাশে একটি গোলাকার পায়ুছিদ্র দেখা যায়।

জননছিদ্র :—দেহের ডানদিকে পায়ুছিদ্রের ঠিক পেছনেই আরেকটি ছিদ্র দেখা যায়, একে জননছিদ্র বলে।

পদ (Foot) :—পদটি **অঙ্কীয়** (Ventral) ও **মাংসল** (Muscular) ও মোটামুটি ত্রিভুজাকার। পদটি খুব প্রশস্ত ও প্রসারণশীল। শামুকের খোলকের মুখের ঢাকনাটি পায়ের পিঠের দিকে লেগে থাকে।

ডাঙার শামুকের বহিরাকৃতি :
(External features of Achatina fulica)

দেহাকৃতি :—মাথা ও পদ দ্বিপার্শ্বীয়রূপে প্রতিসম। দেহের বাকী অংশ প্যাঁচানো খোলকে আবৃত থাকায় অসম।
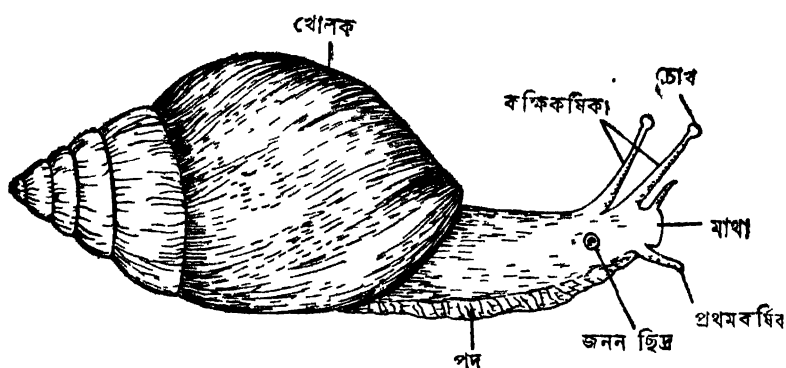
ডাঙার শামুক (অ্যাকাটিনা ফিউলিকা)

খোলক :—এদের খোলকটি অনেকটা শঙ্কুর ন্যায়, লম্বাকার ও জলের শামুকের খোলক অপেক্ষা বেশী সংখ্যক পাকে প্যাঁচানো। খোলকের মুখটিতে কোন **ঢাকনা** বা **অপারকিউলাম** (Operculum) থাকে না।

মাথা :—মাথাটি একটি লম্বা **তুণ্ড** (Snout) যুক্ত ও এর অগ্রপ্রান্তের কিঞ্চিৎ তলদেশে **মুখছিদ্রটি** অবস্থিত। মাথার অগ্রভাগের দু'পাশে মোট দু'জোড়া কর্ষিকা দেখা যায়। প্রথম জোড়াটি ছোট ও যেহেতু এটি মুখছিদ্রের দুই কোণের সম্প্রসারিত অংশ সেইজন্য এদেরকে **লেবিয়াল পাল্প** (Labial palps) বলে। প্রথম জোড়ার পেছনে অপেক্ষাকৃত বড় আরও এক জোড়া কর্ষিকা দেখা যায়। এই দ্বিতীয় জোড়া কর্ষিকাগুলির ডগায় একটি ক'রে সরলাক্ষি বিদ্যমান। এদেরকে **কক্ষিকর্ষিকা** (Tentacular) বলে।

গ্রীবা (Neck) :—মাথার ঠিক পশ্চাতে একটি সুস্পষ্ট গ্রীবা দেখা যায়। গ্রীবার দক্ষিণ পাশে মাথার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায়, একে **জনন ছিদ্র** বলে।

পদ (Foot) :—এদের প্রশস্ত পদটি বেশ মাংসল ও চ্যাপ্টা। পদটি মাথা ও গ্রীবার অঙ্কদেশে অবস্থিত।

রুই মাছ (Rohu fish)

রুই মাছ আমাদের সুপরিচিত। এরা মিষ্টি জলের অধিবাসী। সাধারণতঃ পুষ্করিণী, খাল, ও ছোট ছোট নদীতে এদের দেখা যায়। রুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম **লেবিয়ো রোহিটা** (Labeo rohita)। রুই মাছ পর্ব—কর্ডাটা (Chordata), বিভাগ—ভার্টিব্রাটা (Vertebrata), উপপর্ব—ন্যাথোস্টোমাটা (Gnathostomata) ও শ্রেণী—পিসেস (Pisces) বা মৎস্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

বহিরাকৃতিঃ

(External Features)

দেহাকৃতি :—এদের দেহ দু'পাশ থেকে চাপা ও দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। দেহটি তিনটি অংশে বিভক্ত—(১) **মাথা** (Head)—সম্মুখভাগ হতে কান্‌কো পর্যন্ত, (২) **ধড়** (Trunk)—কান্‌কোর পশ্চাৎভাগ হতে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত ও (৩) **লেজ** (Tail)—পায়ুছিদ্রের পর থেকে দেহের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।
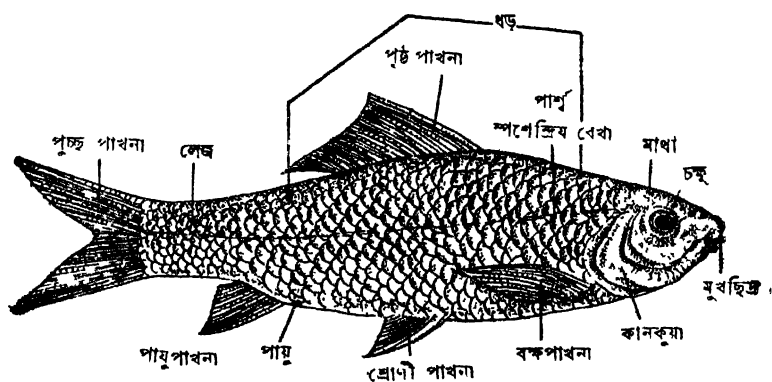
রুই মাছের বহিরাকৃতি

দেহায়তন :—পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা লম্বায় দু'-তিন হাতেরও বেশী হয়।

আঁশ (Scales) :—মাথার সম্মুখভাগের কিয়দংশ বাদে সমস্ত দেহটি গোলাকার আঁশ দ্বারা আবৃত। আঁশগুলি সুবিন্যস্তভাবে একটির ওপর একটি ক'রে সজ্জিত। একটি আঁশ খুলে এনে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করলে প্রতিটি আঁশের মধ্যে কতকগুলি সমকেন্দ্রিক দাগ দেখা যায়। এইরূপ আঁশকে **সাইক্লয়েড আঁশ** (Cycloid scale) বলে।
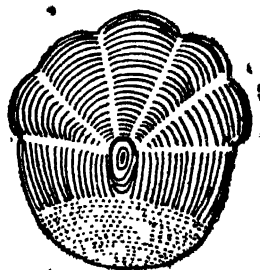
সাইক্লয়েড আঁশ

মুখছিদ্র :—ত্রিকোণাকার মাথাটির অগ্রপ্রান্তের কিঞ্চিৎ তলদেশে মুখ-ছিদ্রটি অবস্থিত। মুখছিদ্রটি দাঁতবিহীন **ওপরের চোয়াল** (Upper jaw) ও **নীচের চোয়াল** (Lower jaw) দ্বারা সংবদ্ধ।

বারবেল (Barbel) :—এদের চিবুকে দু'টি চোয়ালের সংযোগস্থলের নিকট প্রতি পাশে একটি ক'রে খুব ছোট মাংসল শুঁড় বা বারবেল দেখা যায়। এগুলি খুব **সংবেদনশীল** (Sensitive)।

নাসারন্ধ্র (Nostrils) :—মুখের ঠিক ওপরেই মাথার অগ্রাংশের দু'পাশে একটি ক'রে মোট দু'টি নাসারন্ধ্র আছে। এই নাসারন্ধ্রগুলি মুখ-বিবরের সাথে যুক্ত নয় ও এরা শ্বাসকার্যেও অংশ গ্রহণ করে না। ঘ্রাণ গ্রহণ করাই এদের কাজ।

চোখ (Eye) :—নাসারন্ধ্রের পেছনে মাথার দু'পাশে একটি ক'রে গোলাকার চোখ দেখা যায়। চোখগুলি বেশ বড় ও এগুলি সরলাক্ষি। চোখের ওপরে ও নীচে কোন পাতা নেই, কিন্তু সমস্ত চোখটি একটি স্বচ্ছ ও পাতলা তৃতীয় পাতা দ্বারা আবৃত থাকে। এই তৃতীয় পাতাটিকে **নিকৃটিটেটিং মেমব্রেন** (Nictitating membrane) বলে।

কান্‌কো (Operculum) :—মাথার শেষাংশের দু'পাশে বেশ চওড়া অর্ধচন্দ্রাকার দু'টি কান্‌কো বা অপারকিউলাম থাকে। এদের পশ্চাৎভাগ মুক্ত। এই মুক্ত ধারে একটি পাতলা ঝিল্লী দেখা যায়। ঝিল্লীটিকে বলে **ব্র্যাঙ্কিওষ্টিগাল মেমব্রেন** (Branchiostegal membrane)। প্রতি পাশে কান্‌কো ও তার ব্র্যাঙ্কিওষ্টিগাল মেমব্রেন একটি প্রকোষ্ঠকে ঢেকে রাখে—একে **ফুলকো-কক্ষ** বা **গিল-চেম্বার** (Gill-chamber) বলে। প্রতি পাশে **ফুলকো-কক্ষ** ও **মুখবিবরের** (Buccal cavity) সংযোগস্থলে চারটি করে টকটকে লাল রঙের বাঁকানো চিরুণীর মত নরম **ফুলকো** (Gills) সজ্জিত থাকে।

পার্শ্ব স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা (Lateral line sense organs) :—কান্‌কোর পেছন থেকে দেহের দু'পাশ দিয়ে লেজ পর্যন্ত যে লম্বালম্বি রেখা দেখা যায়, তাদেরকে পার্শ্ব স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা বলে। এগুলি খুব সংবেদী (Sensitive)।

পায়ুছিদ্র (Auus) ঃ—ধড়ের ও লেজের সংযোগস্থলের অঙ্কদেশে গোলাকার পায়ুছিদ্রটি অবস্থিত।

বিভিন্ন পাখনা (Fins) :—রুই মাছের দেহে মোট সাতটি পাখনা দেখা যায়। কতকগুলি কাঁটার ন্যায় হাড় প্রতিটি পাখনাকে ধ'রে রাখে। হাড়-গুলিকে **ফিন-রে** (Fin-rays) বলে।

জোড়া পাখনা (Paired fins) :

বক্ষ পাখনা (Pectoral fins)—কান্‌কোর ঠিক পেছনে ধড়ের দু'পাশে এরা অবস্থিত।

শ্রোণী পাখনা (Pelvic fins)—বক্ষপাখনার বেশ কিছু পেছনে অঙ্ক-দেশের দু'পাশে একজোড়া শ্রোণী পাখনা দেখা যায়।

বেজোড় পাখনা (Unpaired fins) :

পৃষ্ঠ পাখনা (Dorsal fin)—পিঠের মধ্যরেখার ওপর একটি পালের ন্যায় বেশ বড় পাখনা দেখা যায়। একে পৃষ্ঠ পাখনা বলে।

পায়ু পাখনা (Anal fin)—এটি পায়ুছিদ্রের ঠিক পেছনে অঙ্কদেশের মধ্য-রেখায় অবস্থিত। তবে এটি অপেক্ষাকৃত ছোট।

পুচ্ছ পাখনা (Caudal fin)—লেজের শেষ অংশে অবস্থিত এটি বৃহত্তম পাখনা। এর মাঝখানে খাঁজ থাকায় এটি ওপরে ও নীচে দু'টি সমান অংশে বিভক্ত।

কতিপয় জিয়ল মাছের (Jeol fish) বহিরাকৃতি

অগভীর ও পাঁকভরা পুকুর, জলাশয়, খাল-বিল প্রভৃতিতে শিঙি, মাগুর, কই প্রভৃতি মাছ বাস করে। যদিও এরা জলে বসবাস করে তবু বেঁচে থাকার জন্য এদের মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন হয়। তাই এরা মাঝে মাঝে জল থেকে মাথা উঠিয়ে কিছু পরিমাণ বায়ু গ্রহণ ক'রে আবার ডুবে যায়। বায়ু হ'তে এদের অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয় ব'লে ফুল্‌কো ছাড়াও এদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। এই অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকার ফলে জিয়ল মাছেরা ডাঙায়ও বেশ কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। এরা সবগুলিই রুই মাছের মত পর্ব কর্ডাটার অন্তর্ভুক্ত মৎস্যজাতীয় চোয়ালবিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণী।

শিঙি মাছ (Singi Fish)

এর বৈজ্ঞানিক নাম **হেটারপনিউষ্টিস্ ফসিলিস্** (Heteropneustes fossilis)।

বহিরাকৃতি :

(External Features)

দেহাকৃতি :—এদের লম্বা দেহটি দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম ও তিনটি অংশে বিভক্ত—(১) **মাথা**, (২) **ধড়** ও (৩) **লেজ**। মাথাটি ওপর ও নীচের দিক থেকে চ্যাপ্টা, ধড় ও লেজ দু'পাশ থেকে চাপা।

দেহায়তন :—এরা লম্বায় প্রায় দশ ইঞ্চি হয়ে থাকে।

ত্বক (Skin) :—এদের ত্বক মসৃণ, তৈলাক্ত ও খুব পিচ্ছিল। ত্বকের কোথাও কোন আঁশ নেই।
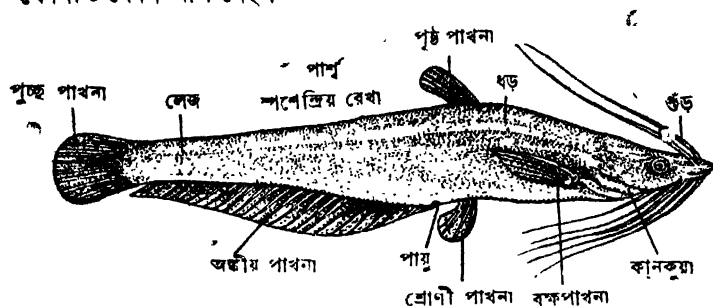
শিঙি মাছের বহিরাকৃতি

মুখছিদ্র :—মাথার অগ্রপ্রান্তের কিঞ্চিৎ অঙ্কীয়দেশে এদের মুখছিদ্রটি অবস্থিত। মুখছিদ্রটি বেশ চওড়া এবং ওপরের ও নীচের চোয়ালধারা সুসংবদ্ধ।

বারবেল (Barbels) :—মুখের ওপরে ও নীচে মোট আটটি সরু লিক্‌লিকে শুঁড় আছে, এদেরকে বারবেল বলে। এইগুলি অত্যন্ত সংবেদী (Sensitive)।

নাসারন্ধ্র :—মাথার শীর্ষস্থানে মধ্যরেখার দু'পাশে একটি ক'রে নাসারন্ধ্র থাকে। প্রতিটি নাসারন্ধ্র একটি ক্ষুদ্র মাংসল পর্দাদ্বারা আবৃত থাকে।

চোখ :—নাসারন্ধ্রের পেছনে বেশ খানিকটা ব্যবধানে এদের গোলাকার চোখ দু'টি অবস্থিত। এদের চোখে পাতা থাকে না।

কান্‌কো :—মাথার শেষাংশের দু'পাশে এদের এক জোড়া কান্‌কো থাকে।

পার্শ্ব স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা :—কান্‌কোর পেছন থেকে আরম্ভ ক'রে দেহের দু'পাশ দিয়ে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত যে লম্বা রেখা দেখা যায়, তাদেরকে পার্শ্ব-স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা বলে। এগুলি খুব সংবেদী।

পায়ুছিদ্র ও জননছিদ্র :—ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে দু'টি শ্রোণী পাখনার ঠিক মাঝখানে একটি গোলাকার চাপা স্থলে দু'টি ছিদ্র দেখা যায়। প্রথমটি পায়ুছিদ্র ও দ্বিতীয়টি জননছিদ্র।

বিভিন্ন পাখনা :

জোড়া পাখনা :—এদের মোট দু'জোড়া জোড়া-পাখনা থাকে।

বক্ষ পাখনা (Pectotal fins)—এক জোড়া বক্ষ পাখনা কান্‌কোর ঠিক পেছনেই অবস্থিত। প্রতিটি বক্ষ পাখনায় নয়টি ফিন্‌-রে থাকে। প্রথমটি একটি শক্ত কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং এর গোড়ায় আছে বিষাক্ত গ্রন্থি।

শ্রোণী পাখনা (Pelvic fins)—বক্ষ পাখনার বেশ খানিকটা পেছনে অঙ্কদেশে অবস্থিত পায়ুছিদ্রের দু'পাশ থেকে আরও একজোড়া পাখনা বেরিয়েছে —এগুলি শ্রোণী পাখনা। প্রতিটি শ্রোণী পাখনায় ছয়টি ফিন্‌-রে থাকে।

বেজোড় পাখনা :—এদের দেহে মোট তিনটি বেজোড় পাখনা আছে।

অঙ্কীয় পাখনা (Ventral fin)—পায়ুছিদ্রের পশ্চাৎভাগ হতে আরম্ভ হয়ে পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত একটি পাতলা পাখনা অঙ্কদেশের মধ্যরেখার ওপর দিয়ে চ'লে গেছে—একে পায়ু পাখনাও (Anal fin) বলে।

পৃষ্ঠ পাখনা (Dorsal fin)—শিঙি মাছের ক্ষেত্রে এই পাখনাটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও ছোট এবং মাথার পেছনে ও ধড়ের অগ্রভাগে পিঠের মধ্যরেখায় অবস্থিত।

পুচ্ছ পাখনা (Caudal fin)—লেজের পশ্চাৎপ্রান্তে এই পাখনাটি অবস্থিত। এটি নরম, অবিভক্ত ও আকারে কতকটা গোল।

মাগুর মাছ (Magur fish)
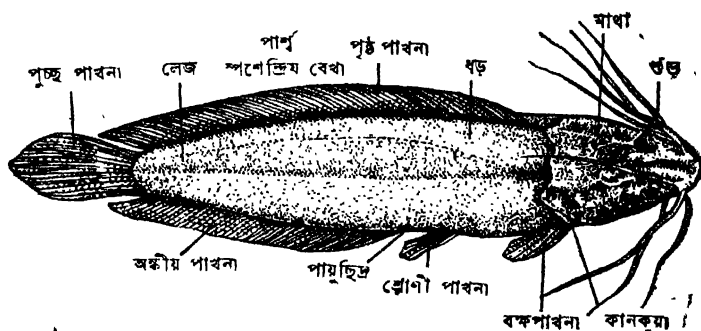
মাগুর মাছের বহিরাকৃতি

বৈজ্ঞানিক নাম **ক্ল্যারিয়াস ব্যাট্রাকাস্‌** (Clarias batrachus)। মাগুর মাছের বহিরাকৃতি মোটামুটি শিঙিমাছের বহিরাকৃতির অনুরূপ। এইজন্য আলাদা ক'রে এর বহিরাকৃতির বিবরণ দেওয়া হল না। কেবল শিঙিমাছের সহিত এর **পার্থক্যের বিবরণ** নিম্নে প্রদত্ত হল।

শিঙি	মাগুর
১। এরা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ও সরু হয়।	১। এরা আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ও বেশ সুপুষ্ট হয়।
২। পরিণত বয়সে এদের গায়ের রঙ্‌ মিশ্‌মিশে কালো ও কিঞ্চিৎ লালচে।	২। পরিণত বয়সে এদের গায়ের রঙ্‌ মিশ্‌মিশে কালো নয়—কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে।

শিঙি	মাগুর
৩। এদের মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট, সরু ও আঁকা-বাঁকা দাগবিহীন।	৩। এদের মাথা অপেক্ষাকৃত চওড়া ও আঁকা বাঁকা দাগযুক্ত।
৪। এদের মাথার পেছনে অবস্থিত পৃষ্ঠ পাখনাটি (Dorsal fin) ক্ষুদ্র।	৪। এদের পৃষ্ঠপাখনাটি মাথার পেছন দিক থেকে আরম্ভ হয়ে পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত বিস্তৃত।
৫। বক্ষ পাখনা (Pectoral fin) নয়টি ফিন্-রে বিশিষ্ট।	৫। বক্ষ পাখনা এগারোটি ফিন-রে বিশিষ্ট।
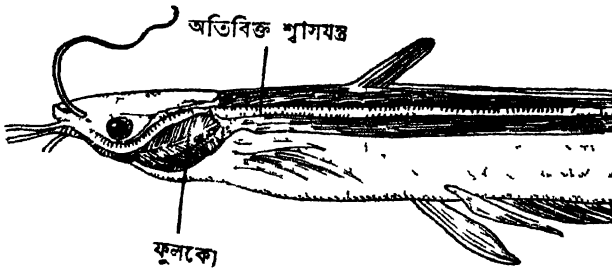
শিঙি মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র
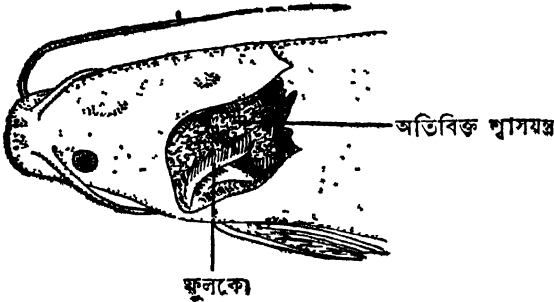
মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

শিঙি	মাগুর
৬। বায়ু হতে অক্সিজেন গ্রহণের জন্য এদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। এদের ফুলকোর ওপর থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় লেজ পর্যন্ত দেহের ভেতর পিঠের দিকে দু'পাশে দু'টি লম্বা বায়ু নল (air tube) থাকে—এইগুলিই অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র।	৬। এদেরও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। দু'পাশের ফুলকোর ঠিক পেছনেই ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখাযুক্ত গাছের মত (Branchial tree) এদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র বিদ্যমান।
৭। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রগুলি ফুলকোর সহিত সংলগ্ন নয়।	৭। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রগুলি ফুলকোর সহিত সংলগ্ন।

কই মাছ (Koi fish)

কই মাছও জিয়লমাছের অন্তর্ভুক্ত। কই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম **অ্যানাবাস টেষ্টুডিনিয়াস (Anabas testudineus)**।

বহিরাকৃতি ঃ

(External features)

দেহাকৃতি :—দেহটি দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম ও পার্শ্বদেশ থেকে চ্যাপ্টা। সমস্ত দেহটি তিনটি অংশে বিভক্ত—(১) মাথা, (২) ধড় ও (৩) লেজ।

দেহায়তন :—এরা লম্বায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চির মত হয়।
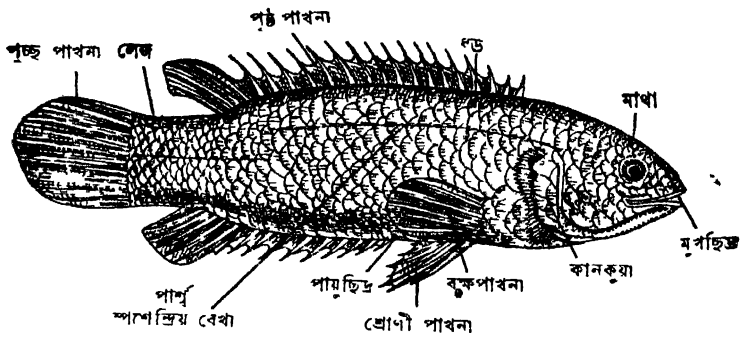
কই মাছের বহিরাকৃতি

আঁশ ঃ—এদের সমস্ত দেহটি আঁশদ্বারা আবৃত। প্রতিটি আঁশের মুক্ত ধারটি দাঁতের মত ছোট ছোট কাঁটা যুক্ত হয়। এই রকম আঁশকে **কণ্টক আঁশ** বা **টিনয়েড্ স্কেল** (**Ctenoid scale**) বলে।

টিনয়েড্ আঁশ

মুখছিদ্র ঃ—স্থূল ত্রিকোণাকৃতি মাথাটির অগ্রপ্রান্তের কিঞ্চিৎ নিম্নদেশে এদের মুখছিদ্রটি অবস্থিত। মুখছিদ্রটি ওপরের ও নীচের দাঁতালো চোয়াল দ্বারা সংবদ্ধ। মুখটির বন্ধ অথবা একটু খোলা অবস্থায় নীচের চোয়ালটি ওপরেরটিকে ছাড়িয়ে একটু বেরিয়ে থাকে।
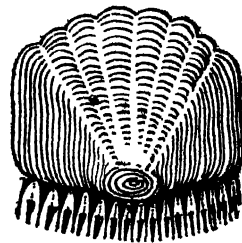
নাসারন্ধ্র ঃ—ওপরের চোয়ালের ওপরে মধ্যরেখার দু'পাশে দু'টি ছোট নাসারন্ধ্র থাকে।

চোখ:—নাসারন্ধ্রের পেছনে মাথার দু'পাশে বেশ বড় ও গোলাকার পাতাহীন চোখ দেখা যায়। চোখগুলি স্বচ্ছ ও পাতলা তৃতীয় পাতা বা **নিক্‌টিটেটিং মেমব্রেন** (nictitating membrane) দ্বারা আবৃত থাকে।

কান্‌কো:—মাথার দু'পাশে নীচের দিকে একজোড়া অর্ধচন্দ্রাকৃতির কান্‌কো দেখা যায়। কান্‌কোর মুক্ত ধারটি কাঁটাযুক্ত। কান্‌কো চিরুণীর ঝালরের মত টক্ টকে লাল রঙের ফুল্‌কোগুলিকে আবৃত ক'রে রাখে।

পার্শ্ব স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা (Lateral line sense organs):—কান্‌কোর পেছন থেকে আরম্ভ ক'রে দেহের দু'পাশ দিয়ে লেজ পর্যন্ত যে রেখা দু'টি চ'লে গেছে তাদের নাম পার্শ্ব স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা।

পায়ুছিদ্র:—অঙ্কদেশে শ্রোণী পাখনা দু'টোর মধ্যবর্তীস্থানে পায়ুছিদ্রটি অবস্থিত।

বিভিন্ন পাখনা:—এদের দেহে দু' জোড়া জোড়া-পাখনা ও তিনটি বেজোড় পাখনা থাকে।

জোড়া পাখনা:

বক্ষ পাখনা (Pectoral fins)—ধড়ের দু'পাশে কান্‌কোর ঠিক পেছনে একজোড়া বক্ষ পাখনা দেখা যায়। প্রতিটি বক্ষ পাখনায় প্রায় বারোটি ফিন-রে থাকে।

শ্রোণী পাখনা (Pelvic fins)—ধড়ের অঙ্কদেশের দু'পাশে আরও একজোড়া পাখনা থাকে—এইগুলি শ্রোণী পাখনা। এই পাখনাগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও প্রতিটিতে ছয়টি ফিন-রে থাকে।

বেজোড় পাখনা:

পায়ু পাখনা (Anal fin)—পায়ুছিদ্রের বেশ কিছু ব্যবধানে অঙ্কদেশের মধ্যরেখায় অনেকগুলি শক্ত কাঁটার ন্যায় ফিন-রে বিশিষ্ট একটি পাখনা লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত থাকে—একে পায়ু পাখনা বলে। পায়ু পাখনার পশ্চাৎ অংশটি বেশ চওড়া ও নরম ফিন-রে বিশিষ্ট।

পৃষ্ঠ পাখনা (Dorsal fin)—ধড়ের পিঠের দিকে মধ্যরেখায় লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত একটি বিস্তৃত পাখনা থাকে—একে পৃষ্ঠ পাখনা বলে। এর

সম্মুখের বিস্তৃত অংশটি অনেকগুলি শক্ত কাঁটার ন্যায় ফিন্-রে বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র পশ্চাৎ অংশটি নরম ফিন্-রে বিশিষ্ট। এই পশ্চাৎ অংশটিকে অ্যাডিপোজ ফিন (Adipose fin) বলে।

পুচ্ছ পাখনা (Caudal fin)—লেজের শেষ প্রান্তে পুচ্ছ পাখনাটি অবস্থিত। এর আকৃতি মোটামুটি গোলাকার ও এর ফিন্-রে গুলিও নরম।

অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র :—শিঙি ও মাগুর মাছের মত কই মাছেরও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। এদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রগুলি দেখতে অনেকটা ছোট গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত এবং ফুলকো-কক্ষের অভ্যন্তরে ফুলকোগুলির ঠিক ওপরেই অবস্থিত। এইগুলি ফুলকোর সহিত সংলগ্ন অবস্থায় থাকে।
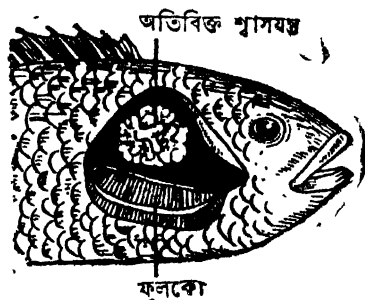
কই মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

কুনো ব্যাঙ (Toad)

ব্যাঙ নানা জাতের। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে সব ব্যাঙ দেখা যায় তাদের মধ্যে কুনো ব্যাঙ আর সোনা ব্যাঙই প্রধান। কুনো ব্যাঙের বৈজ্ঞানিক নাম **বিউফো মেলানস্টিকটাস্** (**Bufo melanostictus**)। এরা সাধারণতঃ ভেজা মাটিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায়, গর্তের ভেতরে বাস করে। ব্যাঙ পর্ব—কর্ডাটা (Chordata), বিভাগ—ন্যাথোস্টোমাটা (Gnathostomata), উপপর্ব—ভার্টিব্রাটা (vertebrata) ও শ্রেণী—উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া (Amphibia) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

বহিরাকৃতি :
(External features)

দেহাকৃতি :—এদের দেহটি দ্বিপার্শ্বীয় রূপে প্রতিসম ও দু'টি অংশে বিভক্ত—(১) **মাথা** ও (২) **ধড়**। মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থলে কোন গ্রীবা নেই।

দেহায়তন :—পরিণত বয়সে এরা সাধারণতঃ লম্বায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি হয়।

ত্বক (Skin) :—এদের ত্বক গ্রন্থিবহুল ও গ্রন্থিগুলি ছোট ছোট গুটির (warts) আকারে ত্বকের প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পিঠের চামড়া পেটের

দিকের চামড়া অপেক্ষা পুরু ও অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক বড় বড় বিষাক্ত গুটিতে ভরা থাকে। ত্বকের রঙ্ কালচে অথবা ধূসর; কিন্তু অঙ্কদেশ অপেক্ষাকৃত সাদাটে ধূসর।
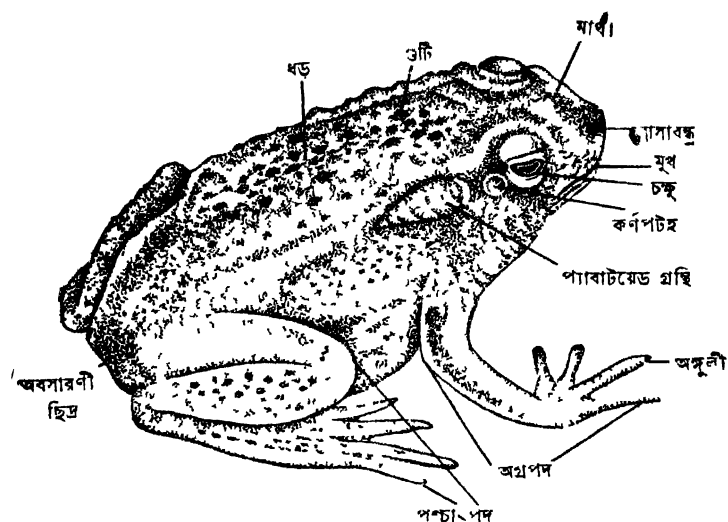
কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি

মাথার বর্ণনা:—মাথাটি অগ্রভাগে (Anterior region) অবস্থিত ও এর সামনের বহিঃরেখাটি (Outline) প্রায় অর্ধবৃত্তাকার। মাথায় নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায়—

মুখছিদ্র—মাথার অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত মুখছিদ্রটি এতই বড় যে এটি মাথার এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত প্রসারিত। মুখছিদ্রটি দাঁতবিহীন ওপরের ও নীচের চোয়াল (Upper and Lower jaws) দ্বারা সুসংবদ্ধ।

বহিঃনাসারন্ধ্র (**External nostrils**)—ওপরের চোয়ালের সম্মুখদিকে মধ্যরেখার দু'পাশে দু'টি বহিঃনাসারন্ধ্র দেখা যায়। এগুলি **নাসিকা পথ** (**Nasal passages**) ও **অন্তঃনাসারন্ধ্র** (**External nostrils**) দ্বারা **মুখবিবরের** (**Buccal cavity**) সহিত সংযুক্ত।

চোখ—বহিঃনাসারন্ধ্রের পেছনে মাথার দু'ধারে গোলাকার ও স্ফীতকায় (bulging) দু'টি চোখ দেখা যায়। প্রতিটি চোখ **ওপরের পাতা** (**Upper eyelid**) ও **নীচের পাতা** (**Lower eyelid**) যুক্ত। ওপরের পাতাটি পুরু, মাংসল ও বড়, কিন্তু নীচের পাতাটি অতটা পুরু ও বড় নয়। এছাড়া একটি

পাতলা ও **স্বচ্ছ তৃতীয় পাতা** চোখের নীচের পাতার সংগে সংলগ্ন থাকে ও প্রয়োজনানুসারে নীচের দিক থেকে ওপরের দিকে প্রসারিত হয়ে সমস্ত চোখটিকে আবৃত করে। এই তৃতীয় পাতাটিকে বলে **নিকৃটিটেটিং মেমব্রেন** (Nictitating membrane)।

কর্ণপটহ (Tympanic membrane) —চোখের পেছনেই প্রতিপাশে একটি ক'রে কতকটা সাদা, গোল ও মসৃণ চামড়ার আবরণ দেখা যায়। এই আবরণটি কানের ছিদ্রটিকে ঢেকে রাখে, সেইজন্য একে কর্ণপটহ বলে।

ধড়ের (Trunk) বর্ণনা :—ধড়টি মাথা অপেক্ষা অনেক বড় ও এর সম্মুখভাগ হল **বক্ষদেশ** (Thorax) ও পশ্চাৎভাগ হল **উদর** (Abdomen)। ধড়ে নিম্নলিখিত অংগ প্রত্যংগ দেখা যায়—

প্যারাটয়েড্ গ্রন্থি (Paratoid gland)*—কর্ণপটহের ঠিক পেছনেই ধড়ের অগ্রভাগের দু'পাশে দু'টি স্ফীত ও বিরাটকায় গ্রন্থি দেখা যায়। এদেরকে প্যারাটয়েড্ গ্রন্থি বলে। এর সামনের দিকটি স্থূল ও পেছনের দিকটি ক্রমশঃ সরু হয়ে শেষ হয়েছে।

অগ্রপদ (Fore limb)—এক জোড়া অগ্রপদ ধড়ের অগ্রভাগের দু'পাশে বিদ্যমান। প্রতিটি অগ্রপদ **বাহু** (Arm or brachium) **পুরোবাহু** (Fore arm or antebrachium) **করতল** (Hand or manus) ও **অঙ্গুলী** (Fingers or digits) এই কয়টি অংশে বিভক্ত। বাহু ও পুরোবাহুর সংযোগস্থলকে বলে **কনুই** (Elbow), আর পুরোবাহু ও করতলের সংযোগস্থলকে বলে **কব্জি** (Wrist)। প্রতিটি অগ্রপদে আঙুলের সংখ্যা চার ও তৃতীয়টি দীর্ঘতম। প্রজনন ঋতুতে (বর্ষা) কেবল পুরুষ ব্যাঙের বুড়ো আঙুলের গোড়ায় হাতের তালুতে একটি কালো ফোলা অংশ দেখা যায়, একে **থাম্ব প্যাড** (Thumb pad) বলে।

পশ্চাৎপদ (Hind limb)—দেহের পশ্চাৎভাগের দু'ধারে আরও একজোড়া পদ দেখা যায়। এই দু'টি পশ্চাৎপদ এবং এরা অগ্রপদ অপেক্ষা অনেক লম্বা ও মোটা। প্রতিটি পশ্চাৎপদ **জঙ্ঘা** বা **উরু** (Thigh),

* পূর্বে একে প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid gland) বলা হত। কিন্তু আরও উচ্চস্তরের প্রাণীতে যে প্যারোটিড্ গ্রন্থি পাওয়া যায় তা' এক প্রকার লালা গ্রন্থি ও মুখের ভেতর লালা নিঃসরণ করে, কিন্তু ব্যাঙের এই গ্রন্থিটি সে রকম কোন কাজ করে না এবং প্যারোটিড গ্রন্থির সাথে এর উৎপত্তিগত সম্পর্কও নেই। সুতরাং দ্বিধা নিরসনের জন্য একে এখন প্যারাটয়েড গ্রন্থি বলে।

জানুতল (shank), **পদপাত** (Foot or pes) ও **পদাঙ্গুলী** (Toes or digits) এই কয়টি অংশে বিভক্ত। উরু ও জানুতলের সংযোগস্থলকে বলে **হাঁটু** (Knee) আর জানুতল ও পদপাতের সংযোগস্থল হচ্ছে **গোড়ালী** (Ankle)। প্রতিটি পশ্চাৎপদে আঙুলের সংখ্যা পাঁচ ও চতুর্থটি দীর্ঘতম। এই অঙ্গুলীগুলির গোড়া পাতলা চামড়া দিয়ে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়ে **লিপ্তপদ** (Webbed feet) গঠন করেছে।

উল্লেখযোগ্য যে অগ্র ও পশ্চাৎপদের সমস্ত অঙ্গুলীই নখবিহীন।

অবসারণী ছিদ্র (Cloacal aperture or vent)—ধড়ের শেষ প্রান্তের মধ্যস্থলে একটি অবসারণী ছিদ্র অর্থাৎ মল, মূত্র ইত্যাদির নির্গম পথ থাকে।

সোনা ব্যাঙ (Frog)

এরা সাধারণতঃ জলে বাস করে। তবে অনেক সময় এরা ডাঙাতে ও ভেজা স্যাঁৎসেঁতে যায়গায় চ'রে বেড়ায়। সোনা ব্যাঙের বৈজ্ঞানিক নাম **র‍্যাণা**
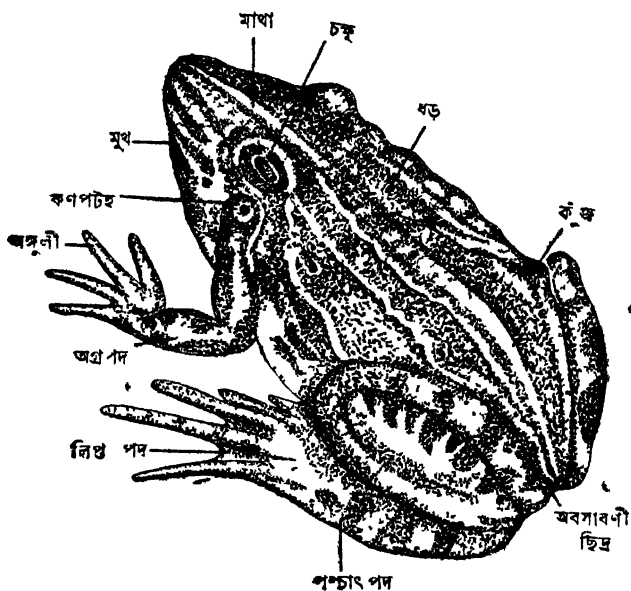
সোনা ব্যাঙের বহিরাকৃতি

টাইগ্রিণা ('Rana tigrina)। একে কোলা ব্যাঙও বলা হ'য়ে থাকে। এর বহিরাকৃতি কুনো ব্যাঙেরই অনুরূপ। তাই আলাদা ক'রে এর বহিরাকৃতির

বিবরণ না দিয়ে নিম্নে কুনো ব্যাঙ ও সোনা ব্যাঙের বহিরাকৃতির পার্থক্য দেওয়া হল—

কুনো ব্যাঙ (Toad)	সোনা ব্যাঙ (Frog)
১। এরা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট।	১। এরা আকারে অপেক্ষাকৃত বড়।
২। এদের ত্বক বহু গুটি যুক্ত ও কর্কশ।	২। এদের ত্বক গুটি বিহীন মসৃণ ও পিচ্ছিল।
৩। এদের পেটের দিকের চামড়ার রঙ্ ধূসর ও পিঠের দিকের চামড়ার রঙ কালচে।	৩। এদের পেটের দিকের চামড়ার রঙ সাদা বা পীত। পিঠের রঙ সবুজের ওপর কালো গোল গোল দাগ ও হলদে ডোরা কাটা (বাঘের গায়ের মত)।
৪। এদের মাথার বহিঃরেখা (outline) মোটামুটি অর্ধবৃত্তাকার।	৪। এদের মাথার বহিঃরেখা মোটামুটি ত্রিভুজাকার।
৫। এদের চোয়ালদুটি দাঁত-বিহীন।	৫। এদের ওপরের চোয়াল ছোট ছোট দাঁতযুক্ত।
৬। এদের একটি স্ফীত, উন্নত ও সুস্পষ্ট প্যারাটয়েড গ্রন্থি আছে।	৬। এদের প্যারাটয়েড গ্রন্থিটি থাকে না।
৭। এদের পাগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম মাংসল হওয়ায় বড় বড় লাফ দিতে সমর্থ নয়।	৭। এদের পাগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা ও বেশী মাংসল হওয়ায় বড় বড় লাফ দিতে সমর্থ।
৮। এদের পশ্চাৎপদের অঙ্গুলী-গুলির কেবল গোড়ারদিক পাতলা চামড়া দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় ভালভাবে লিপ্তপদ (webbed feet) গঠিত হয়নি। তাই এরা খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে না।	৮। এদের পশ্চাৎপদের অঙ্গুলী-গুলি প্রায় পুরোপুরি ভাবে পাতলা চামড়া দিয়ে পরস্পরের সংঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে ভালভাবে লিপ্ত পদ গঠন করেছে। লিপ্ত পদ সাঁতারের পক্ষে খুব উপযোগী। তাই সোনা ব্যাঙ সাঁতারে খুব পটু।
৯। এদের কোমরে পিঠের দিকে কোন কুঁজ নেই।	৯। এদের কোমরে পিঠের দিকে একটি কুঁজ থাকে।

লিজার্ড (Lizard)

টিক্‌টিকি, গিরগিটি, উড়ুক্কু টিক্‌টিকি—**ড্র্যাকো ভোলান্স** (Draco-volans), বহুরূপী (Cameleon) প্রভৃতি সরীসৃপদের (Reptiles) লিজার্ড বলা হয়। এদের মধ্যে টিক্‌টিকি ও গিরগিটির সংগে আমরা প্রায় সকলেই সুপরিচিত। গিরগিটি সাধারণতঃ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় ও এর বৈজ্ঞানিক নাম **ক্যালোটিস ভার্সিকলর** (Calotes versicolor)। আর টিক্‌টিকি বা গৃহগোধিকা সাধারণতঃ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরে বেড়ায় ও কীট-পতঙ্গাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। টিক্‌টিকির বৈজ্ঞানিক নাম **হেমিড্যাক্টাইলাস ফ্লুভিভিরিডিস** (Hemidactylus fluviviridis)। এরা সবগুলিই পর্ব কর্ডাটার অন্তর্ভুক্ত সরীসৃপ জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী। টিক্‌টিকির বহিরাকৃতির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

বহিরাকৃতি :
(External features)

দেহাকৃতি :—এদের দেহটি দ্বি-পার্শ্বীয়রূপে প্রতিসম এবং পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্কদেশ হতে কিঞ্চিৎ চাপা। সমস্ত দেহটি চারটি অংশে বিভক্ত—(১) মাথা, (২) গ্রীবা, (৩) ধড় ও (৪) লেজ।

দেহায়তন :—পরিণত বয়সে এরা সাধারণতঃ ছয়-সাত ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়।
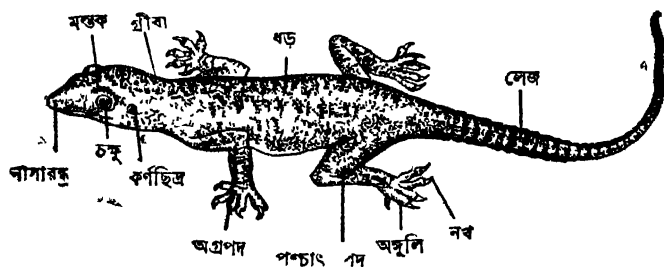
টিক্‌টিকির বহিরাকৃতি

ত্বক :—এদের দেহের চামড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **বহিস্ত্বকীয় আঁশ** (Epidermal scales) দ্বারা আবৃত থাকে। আঁশ ছাড়া এদের দেহের পিঠের দিকে ছোট ছোট বাদামীরঙের অনেক গুটি থাকে। এদের গায়ের রঙ গাঢ় ধূসর বা ফিকে বাদামী।

মাথার বর্ণনা :—মাথাটি দেহের অগ্রভাগে অবস্থিত ও প্রায় ত্রিকোণাকার। নিম্নলিখিত অংশগুলি মাথায় দেখা যায়।

মুখছিদ্র—মাথার অগ্রপ্রান্তে চওড়া মুখছিদ্রটি অবস্থিত। মুখছিদ্রটি ওপরের ও নীচের চোয়ালযুক্ত। চোয়ালগুলিতে ছোট ছোট অনেক দাঁত থাকে। দাঁতগুলি একই রকমের—হোমোডন্ট (Homodont)।

বহিঃনাসারন্ধ্র—ওপরের চোয়াল ও ঠোঁটের ওপরে ঠিকমাঝখানেই দু'টি বহিঃনাসারন্ধ্র দেখা যায়।

চোখ—নাসারন্ধ্রের পেছনে ও তার থেকে বেশ কিছু ব্যবধানে মাথার দু'পাশে দু'টি গোলাকার চোখ দেখা যায়। প্রতিটি চোখ সঞ্চালনশীল **ওপরের পাতা** (Upper eye-lid), **নিচের পাতা** (Lower eye-lid) ও একটি স্বচ্ছ **তৃতীয় পাতা** বা **নিকটিটেটিং মেমব্রেন** (Nictitating membrane) দ্বারা সুরক্ষিত।

কর্ণপটহ (Tympanic membrane)—চোখের পেছনে মাথার দু'পাশে গোলাকার মসৃণ চামড়ার ন্যায় কর্ণপটহ দেখা যায়। কর্ণপটহগুলি কিঞ্চিৎ গর্তের মধ্যে ঢোকানো থাকে। গর্তটিকে কর্ণছিদ্র বলে।

গ্রীবার (Neck) **বর্ণনা :**—মাথার ঠিক পেছনেই থাকে গ্রীবা। এটি মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থল এবং মাথা ও ধড় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু।

ধড়ের বর্ণনা :—ধড়টি বেশ লম্বা ও এর সম্মুখভাগ **বক্ষদেশ** (Thorax) ও পশ্চাৎভাগ **উদর** (Abdomen)। ধড়ে নিম্নলিখিত অংগ প্রত্যংগ দেখা যায়—

অগ্রপদ ((Fore limb) —ধড়ের অগ্রভাগের দু'পাশে একজোড়া অগ্রপদ থাকে। প্রতিটি অগ্রপদ বাহু, পুরো-বাহু, করতল ও অঙ্গুলী নিয়ে গঠিত। প্রতিটি পায়ে পাঁচটি **নখরবিশিষ্ট অঙ্গুলী** (clawed digits) থাকে।
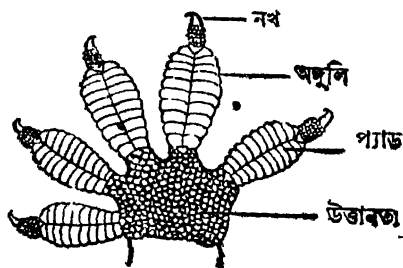
টিকটিকির পদতল

পশ্চাৎপদ (Hind limb)—ধড়ের শেষভাগের দু'পাশে একজোড়া পশ্চাৎপদ দেখা যায়। প্রতিটি পশ্চাৎপদ, উরু, জাঙ্ঘতল, পদপাত ও পদাঙ্গুলী নিয়ে গঠিত। পদাঙ্গুলীগুলি নখরবিশিষ্ট ও সংখ্যায় পাঁচ।

উল্লেখযোগ্য যে অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ প্রতিটির তলায়ই ছোট ছোট অসংখ্য **উত্তানতা** (Concavities) ও প্রতিটি আঙুলের তলার দু'ধারে একজোড়া সমান্তরাল **মাংসল গদী** বা **প্যাড** (Muscular pad) থাকে। এগুলি থাকার ফলেই খাড়া দেওয়ালে আটকে থাকতে এদের কোন অসুবিধে হয় না।

অবসারণী ছিদ্র (Cloacal aperture)—ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি মল, মূত্র প্রভৃতির নির্গম পথ বা অবসারণী ছিদ্র থাকে।

লেজের বর্ণনা :—লেজটি বেশ লম্বা ও অবসারণীছিদ্রের ঠিক পেছন থেকে আরম্ভ হয়ে দেহের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। লেজের গোড়াটি বেশ মোটা ও ওপরে-নীচে চ্যাপ্টা, কিন্তু শেষের দিকটি ক্রমশঃ গোলাকার ও সরু হ'য়ে শেষ হয়েছে। এদের লেজ স্পর্শ করলে খ'সে যায়—আক্রান্ত হ'লে এইভাবে এরা লেজ খসিয়ে পলায়ন করে। পরে আবার লেজের বিনষ্ট অংশ পুনরুৎপাদিত হয়।

পায়রা (Pigeon)

আকাশ বিজয়ের গৌরবে যে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী গৌরবান্বিত তাদের মধ্যে **পক্ষিকুল** (Aves) অন্যতম। পায়রা পক্ষিকুলেরই প্রতিনিধি। গোলা, লক্কা প্রভৃতি নানা জাতের ও বিচিত্র বর্ণের পায়রা দেখা যায়। তাদের কেউবা গৃহপালিত, কেউবা বন্য। বন্য গোলা পায়রাই (Rock pigeon) বেশী পরিমাণে দেখা যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম **কলাম্বা লিভিয়া** (Columba livia)।

বহিরাকৃতি :
(External Features)

দেহাকৃতি :—এদের দেহটি কতকটা নৌকোর গলুইএর মত (Stream lined) ও সমস্ত দেহটি চারটি অংশে বিভক্ত—(১) মাথা, (২) গ্রীবা, (৩) ধড় ও (৪) লেজ। মাথা ও গ্রীবা ধড়ের সহিত খাড়াভাবে সংযুক্ত থাকে।

দেহায়তন :—এরা লম্বায় প্রায় এক ফুটের মত হয়।

পালক (Feathers) :—চঞ্চু ও পশ্চাৎপদ ব্যতীত এদের সর্বাঙ্গ পালকে আবৃত থাকে। পালকগুলির আকার ও গঠন বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং সেই অনুযায়ী তাদের নামও বিভিন্ন। সারা দেহকে আবৃত ক'রে যে সমস্ত ছোট ছোট পালক দেখা যায় তাদের বলে **আকৃতি পালক** বা

কন্‌টুর ফেদার (Contour feathers)। আকৃতি পালকের ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধানের শীষের মত এক প্রকার অদ্ভুত আকৃতির পালক থাকে, তাদের বলে **ফাইলোপ্লিউম** (Filoplumes)। ডানা বা অগ্রপদে যে লম্বা লম্বা পালকগুলি থাকে তাদের নাম **রেমিজেস** (Remiges), আর লেজেতে যে বড় বড় পালকগুলি দেখা যায় তাদের বলে **রেক্‌ট্রিসেস** (Rectrices)। ডানার পালক রেমিজেস ও লেজের পালক রেক্‌ট্রিসেস ওড়ায় সাহায্য করে ব'লে এদেরকে **ওড়বার পালক** বা **কুইল** (Quills or flight feathers) বলে।
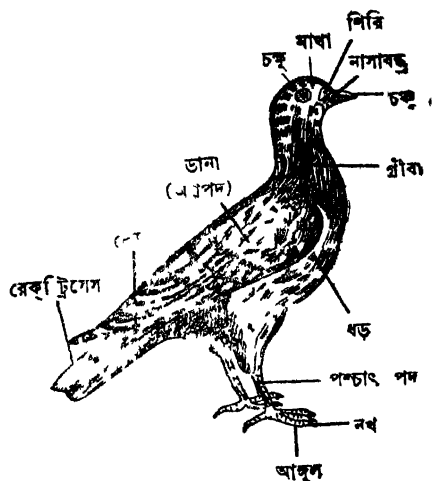
পায়রার বহিরাকৃতি

মাথার বর্ণনা :—মাথাটি ছোট, গোলাকার ও সঞ্চালনশীল। এতে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায়।

চঞ্চু (Beaks)—মাথার সম্মুখভাগে একজোড়া শক্ত, সূচল ও ত্রিকোণাকার চঞ্চু বা ঠোঁট থাকে। মুখগহ্বরটি এই চঞ্চুগুলির দ্বারা আবদ্ধ। ওপরের চঞ্চুটি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়ায় নীচেরটিকে কিঞ্চিৎ ঢেকে রাখে।

বহিঃনাসারন্ধ্র (External nostrils)—ওপরের চঞ্চুর গোড়ায় দু'পাশে দু'টি বহিঃনাসারন্ধ্র সুস্পষ্ট। এর চারপাশের কিছুটা অংশে একটি স্থূল চামড়ার আবরণ দেখা যায়—একে শিরি (Cere) বলে।

চোখ—মাথার দু'পাশে দু'টি গোলাকার চোখ আছে। প্রতিটি চোখ ওপরের পাতা, নীচের পাতা ও একটি অর্ধস্বচ্ছ (Semi-transparent) তৃতীয় পাতা বা নিকৃটিটেটিং মেমব্রেন দ্বারা-সুরক্ষিত।

শ্রবণছিদ্র (Auditory aperture)—চোখের পেছনে ও কিছু নীচের দিকে দু'পাশে দু'টি শ্রবণছিদ্র থাকে। এগুলি পালকে আবৃত থাকায় বাইরের দিক থেকে দেখা যায় না।

গ্রীবার বর্ণনা :—*গ্রীবাটি লম্বা, সরু ও নমনীয় এবং মাথা* ও ধড়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

ধড়ের বর্ণনা :—ধড়টি দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বেশ স্থূল ও বড়। এর সম্মুখভাগটি মোটা ও পেছন দিকটি ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। ধড়ে নিম্নলিখিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়।

ডানা (Wings)—ধড়ের সম্মুখভাগের দু'পাশে একজোড়া ডানা দেখা যায়। বিশ্রামকালে ডানাদু'টি পিঠের ওপরে বিন্যস্ত থাকে; কিন্তু ওড়বার সময় এগুলি ধড়ের সহিত সমকোণ উৎপন্ন ক'রে বিস্তারিত হয়। ডানাগুলি অগ্রপদেরই পরিবর্তিত রূপ এবং অগ্রপদের প্রায় সমস্ত অংশই এতে বিদ্যমান।
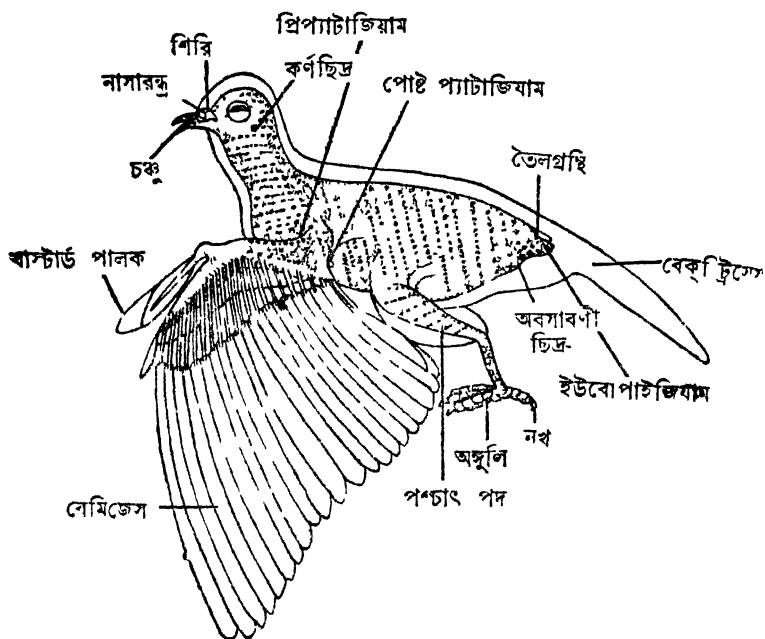
পায়রার বহিরাকৃতির চিত্র

প্রতিটি ডানায় তিনটি অসম্পূর্ণ অঙ্গুলী থাকে। প্রথম অঙ্গুলীতে (Pollex) কিছু সংখ্যক ছোট ছোট অদ্ভুত ধরণের পালক দেখা যায়। এগুলিকে **বাস্টার্ড পালক (Bastard wings)** বলে। প্রতিটি ডানার অগ্রভাগের সীমায় একটি পাতলা চামড়া বাহু ও পুরোবাহুকে যুক্ত ক'রে রেখেছে, তাকে **অ্যালার মেমব্রেন** বা **প্রিপ্যাটাজিয়াম (Alar membrane or**

Prepatagium) বলে। সেইরূপ পুরোবাহুর সহিত এর সংলগ্ন দেহাংশ আর একটি পাতলা চামড়া দ্বারা সংযুক্ত। এই দ্বিতীয় চামড়াটিকে বলে **পোষ্ট প্যাটাজিয়াম** (Post patagium)। ডানার পেছনদিকে মোট তেইশটি বড় বড় পালক বা **রেমিজেস** (Remiges) সজ্জিত থাকে।

পশ্চাৎপদ (Hind limbs)—ধড়ের পশ্চাৎভাগে একজোড়া মজবুত পশ্চাৎপদ থাকে। প্রতিটি পশ্চাৎপদ উরু (Thigh), জানুতল (Shank) ও পদপাত (Foot) নিয়ে গঠিত। উরুটি ছোট, মজবুত, মাংসল ও পালকে আবৃত। পশ্চাৎপদের আর বাকী অংশে মাংস বা পালক থাকে না; কিন্তু আঁশ (Scales) দ্বারা আবৃত থাকে। পায়ে সবমোট চারটি অঙ্গুলী থাকে। প্রথম অঙ্গুলীটি (Hallux) পশ্চাৎমুখী, কিন্তু আর বাকী তিনটি অঙ্গুলী সম্মুখের দিকে প্রসারিত।

অবসারণী ছিদ্র (Cloacal aperture)—ধড়ের শেষ প্রান্তে ধড় ও লেজের সংযোগস্থলের অঙ্কদেশে মল-মূত্রাদির নির্গমপথ বা অবসারণী ছিদ্রটি অবস্থিত।

লেজের বর্ণনা :—প্রকৃত লেজটি খুবই ছোট ও ত্রিকোণাকার, ঠিক ধড়ের পশ্চাতেই অবস্থিত। একে **ইউরোপাইজিয়াম** (Uropygium) বলে। সেখান থেকেই বারোটি লম্বা লম্বা পুচ্ছ পালক বা রেক্ট্রিসেস (Rectrices) বের হয়েছে। সাধারণতঃ পুচ্ছ পালকগুলিকেই লেজ বলা হয়। ইউরোপাইজিয়ামের পৃষ্ঠদেশে একটি তৈল গ্রন্থি থাকে, তাকে প্রীন গ্ল্যাণ্ড (Preen gland) বলে।

গিনিপিগ (Guinea pig)

স্তন্যপায়ী (Mammalia) প্রাণীদের স্থান জৈব বিবর্তনের সর্বোচ্চস্তরে। গিনিপিগ স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই প্রতিভূ। এরা প্রকৃতিতে ভীরু ও তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট তৃণভোজী (Herbivorous) প্রাণী। গিনিপিগ নানারঙের হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম **কেভিয়া পোর্সেলাস** (Cavia porcellus)।

বহিরাকৃতি :

(External Features)

দেহাকৃতি :—দেহটি দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং মাথা ও ধড়ে বিভক্ত। একটি ছোট গ্রীবা মাথা ও ধড়কে সংযুক্ত ক'রে রেখেছে। এদের লেজ থাকে না।

দেহায়তন :—এরা লম্বায় সাধারণতঃ ছয়-সাত ইঞ্চি হয়।

লোম (Hairs) :—মুখের সম্মুখভাগের কিয়দংশ ও পদতল ব্যতীত প্রায় সমস্ত দেহটিই লোমাবৃত।

বহিঃকর্ণ
মাথা
তুণ্ড
ভাইব্রেসি
নাসারন্ধ্র
ওষ্ঠ
মুখছিদ্র
অঙ্গুলি
নখ
অগ্রপদ
গ্রীবা
ধড়
পশ্চাৎপদ

গিনিপিগের বহিরাকৃতি
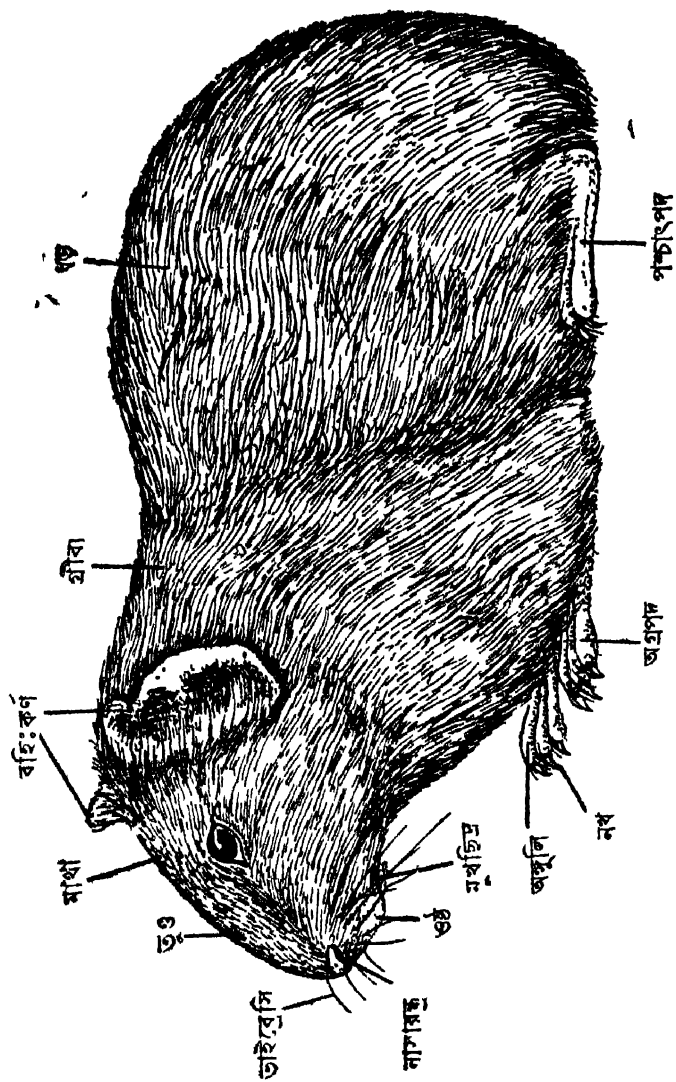
মাথার বর্ণনা :—মাথাটি অগ্রভাগে অবস্থিত ও এতে নিম্নলিখিত অংগ-প্রত্যংগ দেখা যায়—

তুণ্ড (Snout)—মাথার অগ্রভাগের দিক প্রসারিত হ'য়ে একটি তুণ্ডের সৃষ্টি করেছে।

বহিঃনাসারন্ধ্র (External nostrils)—তুণ্ডের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত এক জোড়া বহিঃনাসারন্ধ্র দেখা যায়।

মুখছিদ্র –বহিঃনাসারন্ধ্রের কিঞ্চিৎ নিম্নেই চওড়া মুখছিদ্রটি অবস্থিত। এটি **ওপরোষ্ঠ** (Upper lip) ও **অধরোষ্ঠ** (lower lip) দ্বারা রক্ষিত। ওপরোষ্ঠের মাঝখানে একটি চিড় (Cleft) থাকায় সামনের দাঁত দু'টি পরিষ্কার দেখা যায়। ওপরোষ্ঠের দু'পাশ থেকে কতকগুলি লম্বা লম্বা বিশেষ ধরণের সংবেদী ও স্পর্শানুভূতিশীল লোম বের হয়েছে। এগুলিকে গোঁফ বা ভাইব্রেসি (Whiskers or vibrassae) বলে।

চোখ—ঢালু মাথাটির দু'পাশে একজোড়া চোখ বিদ্যমান। প্রতিটি চোখ ওপরের ও নীচের পাতা দ্বারা সুরক্ষিত। এদের চোখের পাতায় কেশ থাকে না। তৃতীয় পাতা বা নিকটিটেটিং মেমব্রেনটি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে একটি ক্ষুদ্র পিণ্ডাকার ভেষ্টিজিয়াল অংগ (Vestigial organ) হিসাবে চোখের কোণে অবস্থিত।

বহিঃকর্ণ (Pinna or external ear)—চোখের পেছনে মাথার দু'পাশে বহিঃকর্ণদুটি সুস্পষ্ট। প্রতিটি বহিঃকর্ণের পেছনের ধারটিতে একটি ছোট খাঁজ দেখা যায়। বহিঃকর্ণের ভেতরে থাকে এদের শ্রবণছিদ্র।

ধড়ের (Trunk) **বর্ণনা** :—ধড়ের সম্মুখভাগ বক্ষদেশ (thorax) ও পশ্চাৎভাগ উদর (Abdomen)। ধড়ে নিম্নলিখিত অংগ-প্রত্যংগ দেখা যায়—

অগ্রপদ—এই পদ জোড়াটি বক্ষদেশের দু'পাশে সংযুক্ত। প্রতিটি অগ্রপদ বাহু, পুরোবাহু, করতল ও চারটি নখযুক্ত অঙ্গুলী নিয়ে গঠিত।

পশ্চাৎপদ—এই পদ জোড়াটি ধড়ের শেষভাগের দু'পাশে অবস্থিত ও অগ্রপদ অপেক্ষা সুপুষ্ট। প্রতিটি পশ্চাৎপদ উরু (Thigh), জানুতল (Shank), পদপাত (Foot or pes) ও তিনটি নখযুক্ত পদাঙ্গুলী (Toes) নিয়ে গঠিত।

স্তনবৃন্ত (Teats)—উদরের তলার দিকে (Ventral surface) দু'পাশে একটি ক'রে মোট দু'টি স্তনবৃন্ত থাকে। স্তনবৃন্তে যুক্ত স্তনগ্রন্থি (Mammary glands) পরিণত স্ত্রী গিনিপিগে সুপুষ্ট হয়।

পায়ুছিদ্র (Anus)—এদের লেজ থাকে না বটে তবে লেজের একটু গোড়া থাকে, আর তার তলাতেই পায়ুছিদ্রটি অবস্থিত।

রেচন-জননছিদ্র (Urino-genital aperture)—পায়ুছিদ্রের সম্মুখভাগেই এদের রেচন-জননছিদ্র অবস্থিত। স্ত্রী গিনিপিগে ছিদ্রটিকে বলে **ভাল্‌ভা** (Vulva)। পুরুষ গিনিপিগে ছিদ্রটি একটি ছোট নলাকৃতি অংগের ডগায় অবস্থিত। এই নলাকৃতি অংগটিকে **শিশ্ন** (**Penis**) বলে। সাধারণ অবস্থায় শিশ্নটি **প্রেপুস** (**Prepuce**) নামক একটি শিথিল আবরণের মধ্যে সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে। পুরুষ গিনিপিগে অণ্ডকোষ (Testes) দুটি চর্ম আস্তরণ (Scrotum) দ্বারা আবৃত অবস্থায় পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত থাকে। প্রজনন ঋতুতে এইগুলি সুস্পষ্ট হয়।

Exercise (অনুশীলনী)

1. Describe the External features of the Hydra.

[হাইড্রার বহিরাকৃতির একটি বিবরণ দাও।]

2. What is the scientific name of the Earthworm? Describe its External peculiarities.

[কেঁচোর বৈজ্ঞানিক নাম কী? এর বহিরাকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।]

3. Give an account of the External features of the Prawn and state how you distinguish the male Prawn from the female one.

[চিংড়ির বহিরাকৃতির একটি বিবরণ দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি কিভাবে চিনবে বল।]

4. Describe the External characters of the Cockroach and point out its Arthropod features.

[আরশোলার বহিরাকৃতি বর্ণনা ক'রে এর সন্ধিপদ প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও।]

5. What is spinneret? Describe the External features of an animal where spinneretes are met with.

[জালবুনন অংগ কী? জালবুনন অংগযুক্ত একটি প্রাণীর বহিরাকৃতি বর্ণনা কর।]

6. Write an acconnt of the External features of scolopendra.

[তেঁতুলে বিছের বহিরাকৃতির একটি বিবরণ দাও।]

7. Describe the External features of Labeo rohita.

[রুই মাছের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর।]

8. Give the scientific name of the Koi fish and mention its External peculiarities.

[কই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম বল ও এর বহিরাকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি বল।]

9. Tabulate the differences between the Singi and the Magur. What are their scientific names ?

[শিঙি ও মাগুর মাছের পার্থক্যগুলি ছক কেটে দেখাও। তাদের বৈজ্ঞানিক নাম কী ?]

10. Write in a tabular form the differences between the External characters of Bufo and Rana.

[কুনো ও সোনা ব্যাঙের বহিরাকৃতির পার্থক্য একটি ছকের আকারে লেখ।]

11. Describe the External features of a lizard you studied.

[তোমার পঠিত কোন লিজার্ডের বহিরাকৃতির বিবরণ দাও।]

12. How does a bird differ from all other vertebrates ? State the External peculiarities of Columba livia.

[পাখী কিরূপে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী হ'তে পৃথক ? পায়রার বহিরাকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি বল।]

13. Draw a labelled sketch of the Guinea pig and point out its Mammalian features.

[গিনিপিগের একটি ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশ দাগ কেটে দেখাও এবং এর স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্যগুলি বল।]

14. Write notes on—

(a) Hypostome, (b) Clitellum, (c) Rostrum, (d) Cervicum (e) Elytra, (f) Sclerite, (g) Cycloid scale, (d) Paratoid gland, (i) Webbed foot, (j) Uropygium, (k) Vibrassae.

[টীকা লেখ:—(ক) হাইপোষ্টোম, (খ) ক্লাইটেলাম, (গ) রষ্ট্রাম, (ঘ) সারভিকাম্, (ঙ) এলিট্রা, (চ) স্ক্লেরাইট, (ছ) সাইক্লয়েড আঁশ, (জ) প্যারাটয়েড্ গ্রন্থি, (ঝ) লিপ্তপদ, (ঞ) ইউরোপাইজাম, (ট) ভাইব্রেসি।

৩

কতিপয় প্রাণীর বিশদ বিবরণ

(Detailed description of some animals)

পূর্ব অধ্যায়ে কতিপয় প্রাণীর বহিরাকৃতির সাধারণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে কয়েকটি প্রাণীর প্রাণিজগতে স্থান, স্বভাব ও বাসস্থান এবং কার্যকারিতাসহ বহিরাকৃতির বিশদ বিবরণ দেওয়া হল।

কেঁচো :

(Earthworm—Pheretima posthuma)

প্রাণিজগতে স্থান (Systematic position) :—কেঁচো পর্ব-**অ্যানিলিডার** (Annelida) অন্তর্ভুক্ত, শ্রেণী—**কিটোপোডা** (Chaetopoda) ও বর্গ—**অলিগোকিটার** (Oligochaeta) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and Habitat) :—কেঁচো মাটির উপরিস্তরে গর্ত ক'রে বাস করে। নদীর ধারে মাটিতে, মাঠে, বাগানে, উঠান প্রভৃতি জায়গায় বিক্ষিপ্ত বিষ্ঠাকুণ্ডলী দেখে এদের গর্তের অস্তিত্ব বোঝা যায়। পচা প্রাণী ও উদ্ভিদের গলিত রসসিক্ত মাটিই এদের প্রধান খাদ্য। যেহেতু মাটিতে এদের খাদ্যোপাদান কম পরিমাণ, সেই হেতু এরা সাধারণতঃ ক্রমাগত মাটি খায় ও বিষ্ঠাকুণ্ডলী পরিত্যাগ করে। দেহের সূচল অগ্রপ্রান্তের সাহায্যেই এরা মাটিতে গর্ত করে এবং তলাকার মাটি ওপরে নিয়ে আসে। এইভাবে মাটি ওলট-পালট ক'রে ও বিষ্ঠাকুণ্ডলীর দ্বারা তা সারযুক্ত ক'রে কেঁচো মাটির উর্বরাশক্তি বাড়িয়ে দেয়। এইজন্য চার্লস ডারুইন কেঁচোকে মাটির স্বাভাবিক কর্ষক (Natural tillers of the soil) বলেছেন। সাধারণতঃ দিনের বেলায় এরা গর্তের মধ্যেই অবস্থান করে ; কিন্তু রাত্রিবেলায় গর্ত থেকে বের হ'য়ে এসে পাতার টুকরো গর্তের ভেতরে নিয়ে যায় ও তা' খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পেঁয়াজ প্রভৃতির মত স্বাদুগন্ধযুক্ত খাদ্য এরা খুব ভালবাসে। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে যখন এদের গর্ত জলে ভ'রে যায় তখন এরা গর্তের আবাস পরিত্যাগ করে ও উন্মুক্ত মাটির ওপর চলে আসে।

কার্যকারিতা সহ বহিরাকৃতি (External features with their functions) :—কেঁচোর বহিরাকৃতি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তাদের কার্যকারিতার বিবরণ দেওয়া হল।
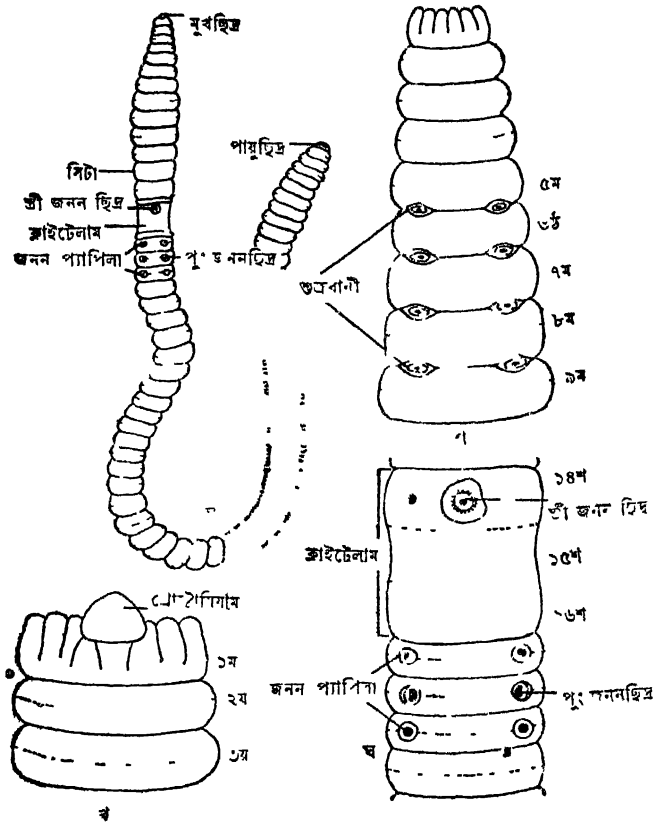
(ক) কেঁচোর অঙ্কীয় দিক, (খ) কেঁচোর অগ্রভাগের কয়েকটি খণ্ডের পৃষ্ঠ দেশ,
(গ) কেঁচোর অঙ্ক দেশে শুক্রধানী ছিদ্র, (ঘ) কেঁচোর অঙ্ক দেশে ক্লাইটেলাম ও জননছিদ্র

কৃত্তিকাবরণী—সমস্ত দেহটি আবৃত ক'রে যে নরম কৃত্তিকাবরণীটি থাকে তা' দেহকে সুরক্ষিত রাখে। কৃত্তিকাবরণীটি রসসিক্ত থাকায় তা' শ্বাসকার্যেও (Respiration) সহায়তা করে।

মুখছিদ্র—অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র অর্ধচন্দ্রাকার মুখছিদ্র দ্বারা খাদ্যবস্তু গৃহীত হয়।

প্রোষ্টোমিয়াম বা ওষ্ঠ—মুখছিদ্রের ওপর ঝুলন্ত প্রোষ্টোমিয়ামটি মুখ ছিদ্রকে রক্ষা করে ও খাদ্যগ্রহণে সহায়তা করে।

পায়ুছিদ্র—পশ্চাৎপ্রান্তে অবস্থিত গোলাকার পায়ুছিদ্র দ্বারা এরা বিষ্ঠাকুণ্ডলী পরিত্যাগ করে।

ক্লাইটেলাম—চতুর্দশ হতে ষোড়শ দেহখণ্ডকে ঘিরে গ্রন্থিযুক্ত কলার যে আবরণ বা ক্লাইটেলামটি থাকে, জননকালে তা' থেকে একপ্রকার আঠালো রস নির্গত হ'য়ে দু'টি প্রাণীকে দৃঢ় সংবদ্ধভাবে ধ'রে রাখতে সহায়তা করে। ফেরিটিমা পোস্থুমা ক্লাইটেলাম দ্বারা গুটি (Cocoon) নির্মাণ করতে পারে কিনা তার কিছু জানা যায়নি। তবে অন্যান্য বিজাতীয় কেঁচো ক্লাইটেলাম হ'তে একপ্রকার রস নির্গত ক'রে একটি কোকুন বা গুটি প্রস্তুত করে ও তার ভেতর ডিম সঞ্চিত রাখে।

সিটি (Setae)—প্রথম, শেষ ও ক্লাইটেলামের দেহখণ্ডগুলি ব্যতীত প্রত্যেক দেহখণ্ডের মাঝে বৃত্তাকারে অসংখ্য শুঁয়ার মত যে সিটিগুলি থাকে সেগুলি চলা ফেরায় ও গর্তের দেওয়ালগুলি ধ'রে রাখতে সাহায্য করে।

জননছিদ্র—চতুর্দশ দেহখণ্ডের অঙ্কদেশের মধ্যে যে স্ত্রী জননছিদ্রটি থাকে তা দিয়ে ডিম্বাণু (Egg) ও অষ্টাদশ দেহখণ্ডের অঙ্কদেশের দু'পাশে অবস্থিত একজোড়া পুং জননছিদ্র দিয়ে শুক্রাণু (Sperms) বের হয়। সপ্তদশ ও ঊনবিংশ দেহখণ্ডের অঙ্কদেশের দু'পাশে যে চারটি জনন প্যাপিলা থাকে সেগুলি হতে একপ্রকার রস নির্গত হয়ে সঙ্গমকালে সহায়তা করে।

শুক্রধানী ছিদ্র (Spermathecal pores)—অঙ্কদেশের দু'পাশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তম, সপ্তম ও অষ্টম, অষ্টম ও নবম দেহখণ্ডগুলির অন্তর্বর্তী রেখায় মোট চারজোড়া যে শুক্রধানী ছিদ্র থাকে সেগুলি পুং জননছিদ্র হতে নির্গত শুক্রাণুগুলিকে গ্রহণ করে।

পৃষ্ঠছিদ্র (Dorsal pores)—দ্বাদশ দেহখণ্ড হতে শুরু ক'রে শেষ দেহখণ্ড পর্যন্ত পিঠের দু'ধারে অবস্থিত পৃষ্ঠছিদ্র দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ রস নির্গত হয়ে কৃত্তিকাবরণী যুক্ত ত্বকটিকে সিক্ত রাখে।

রেচনছিদ্র (Nephridiopores)—প্রথম দুই দেহখণ্ড বাদে সমস্ত দেহে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেচনছিদ্র দ্বারা নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য বস্তু (Nitrogenous waste products) তরলাকারে বহিষ্কৃত হয়।

আরশোলা :

(Cockroach—Periplaneta ameriacna)

প্রাণিজগতে স্থান (Systematic position) :—আরশোলা পর্ব—আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) ইন্‌সেক্টা (Insecta) বা পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী।

স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and habitat) :—এরা দাঁতালো চোয়ালযুক্ত পতঙ্গ। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই এরা সব থেকে ভালবাসে। এরা গুদাম ঘর, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতি জায়গায় থেকে প্রভূত খাদ্য-শস্য নষ্ট করে। এরা স্বভাবে নিশাচর, অতিভোজী ও গৃহস্থালীর সাধারণ আপদ। এইজন্য এরা ক্ষতিকারক বা অপকারী (Harmful) পতঙ্গভুক্ত। সাধারণতঃ দিনের বেলায় এরা সুবিধামত জায়গায় লুকিয়ে থাকে ও রাত্রিতে বের হয়ে আসে। যদিও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই এরা পছন্দ করে তবু অন্যান্য খাদ্যও এরা গ্রহণ করে। সেইজন্য এদেরকে সর্বভুক (Omnivorous) প্রাণী বলা যায়।

কার্যকারিতাসহ বহিরাকৃতি (External features with functions) :—আরশোলার বহিরাকৃতির বিবরণ পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে তাদের কার্যকারিতা দেওয়া হল।

কৃত্তিকাবরণী—সমস্ত দেহকে আবৃত ক'রে যে শক্ত কৃত্তিকাবরণী বা বহিঃকঙ্কালটি থাকে তা দেহটিকে ধ'রে রাখতে ও সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে। কৃত্তিকাবরণীটি দেহনিঃসৃত নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য বস্তু দ্বারা নির্মিত। সুতরাং খোলস পরিত্যাগ (Ecdysis) দ্বারা আংশিকভাবে রেচনক্রিয়াও (Excretion) সম্পন্ন হয়। জীবনচক্র (Life cycle) সমাধা করার সময় এরা কয়েকবার খোলস ত্যাগ করে।

পুঞ্জাক্ষি—মাথার দু'পাশে অবস্থিত বৃন্তহীন পুঞ্জাক্ষিদ্বয়ের প্রতিটির ওপর ঘরকাটা কতকগুলি দাগ আছে। অসংখ্য সরলাক্ষির সমষ্টির ফলে এই দাগ দেখা যায়। কোন বস্তুর ছবি চোখের ওপর পড়লে বিভিন্ন সরলাক্ষির ওপর তা প্রতিফলিত হয়; ফলে পূর্ণাঙ্গ বস্তুর প্রতিচ্ছবি ঝাপসা দেখায়।

শুঁড় বা অ্যানটিনা—মাথার অগ্রভাগে অবস্থিত বহু গাঁট যুক্ত শুঁড় দুটি খুব সংবেদী ও স্পর্শানুভূতিশীল।

মুখ ও মুখ উপাঙ্গ (Mouth and mouth parts)—মাথার অগ্রভাগের অঙ্কদেশে অবস্থিত মুখছিদ্রকে ঘিরে কতকগুলি উপাঙ্গ আছে তাদেরকে মুখ উপাঙ্গ বলে। তাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল—

(১) **চোয়াল (Mandible)**—একজোড়া শক্ত চোয়াল মুখের দু'পাশে অবস্থিত। এঁদের ভেতরের দিকটা করাতের দাঁতের মত দাঁতালো। খাদ্য বস্তুকে আংশিকভাবে চর্বণ ও নিষ্পেষণ করাই এদের কাজ।
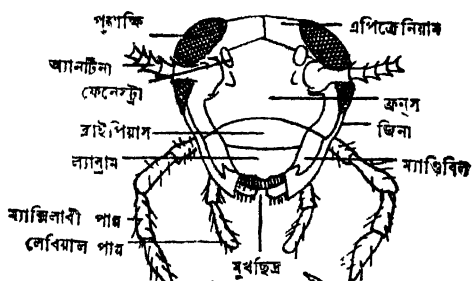
আরশোলার মাথা ও বিভিন্ন মুখ উপাঙ্গ

(২) **ম্যাক্সিলা (Maxilla)**—চোয়ালের পেছনেই দু'পাশে এক-জোড়া ম্যাক্সিলা থাকে। এরা খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে।

(৩) **লেবিয়াম (Labium)**—মুখছিদ্রের তলার দিকে ও ম্যাক্সিলা দুটোর অন্তর্বর্তীস্থানের পেছনে একটি উপাঙ্গ দেখা যায়—একে **লেবিয়াম** বা **অধঃরোষ্ঠ** বলে। এটিও খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে।

(৪) **ল্যাব্রাম (Labrum)**—মুখছিদ্রের সম্মুখে ও দু'টি চোয়ালের অন্তর্বর্তীস্থানের সামনে আরও একটি অর্ধবৃত্তাকার উপাঙ্গ থাকে—একে **ল্যাব্রাম** বা **ওপরোষ্ঠ** বলে। এটি মুখছিদ্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

(৫) **জিহ্বা (Tongue)**—জিবটি যদিও মুখবিবরের অভ্যন্তরে অবস্থিত তবু বাইরের দিক থেকে এর অবস্থিতি বেশ বোঝা যায়। লালা নিঃসৃত ক'রে খাদ্যকে ভিজিয়ে দেওয়াই এর কাজ।

বক্ষ (Thorax) ও বক্ষ উপাঙ্গ (Thoracic appendages) :—বক্ষটি তিনটি অংশে বিভক্ত—অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ। বক্ষে পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত বক্ষ উপাঙ্গগুলি দেখা যায়—

পদ (**Legs**)—প্রতিটি বক্ষাংশের অঙ্কদেশে একজোড়া ক'রে মোট তিন জোড়া পা আছে। প্রতিটি পা গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে ডগা পর্যন্ত কক্সা (Coxa), ট্রোকেনটার (Trochanter), ফিমার (Femur), টিবিয়া (Tibia) ও পাঁচটি গাঁটযুক্ত টারসাস (Tarsus)—এই পাঁচটি খণ্ড নিয়ে গঠিত। টারসাসের শেষখণ্ডে একজোড়া বক্র সঞ্চরণশীল নখ থাকে। আরশোলা পায়ের সাহায্যে চলা-ফেরা করে।
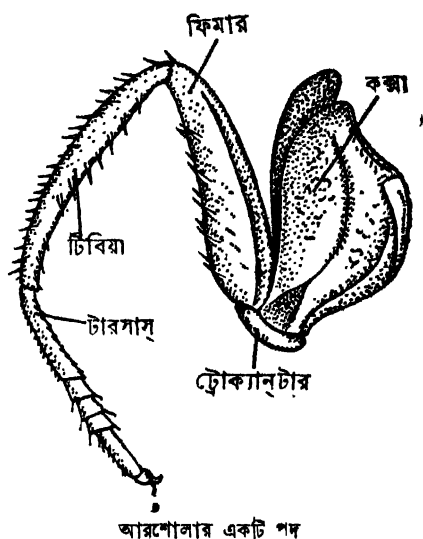
আরশোলার একটি পদ

ডানা (**Wings**)—মধ্য ও পশ্চাৎ বক্ষাংশের উপরিভাগে একজোড়া ক'রে মোট দু'-জোড়া ডানা আছে। প্রথম জোড়া ডানাটি শক্ত, অস্বচ্ছ ও এরা দ্বিতীয় জোড়া ডানা-গুলিকে ঢেকে রাখে। এইজন্য প্রথম জোড়া ডানা দু'টিকে ডানা আবরণী বা **এলিট্রা** (**Elytra**) বলে। দ্বিতীয় জোড়া ডানাগুলি পাতলা ও অর্ধস্বচ্ছ ঝিল্লীর মত। এরাই আরশোলাকে ওড়ায় সাহায্য করে।

উদর ও তার বিভিন্ন অংশ :—উদরটি মাথা ও বক্ষ অপেক্ষা বড এবং এর পেছন দিকটি ক্রমশঃ সরু হ'য়ে গেছে। উদরটি দশটি দেহখণ্ডে বিভক্ত।

পায়ুছিদ্র (**Anus**)—উদরের দশম দেহখণ্ডের শেষপ্রান্তে অবস্থিত পায়ুছিদ্র দ্বারা খাদ্যের অপাচ্য অংশ বা মল নিষ্কাশিত হয়। পায়ুছিদ্রের দু'পাশে দু'টি ছোট কাঠির মত আকারের অ্যানাল সারসি (Anal cerci) থাকে।

জননছিদ্র (**Gonopore**)—অষ্টম দেহখণ্ডের স্টারনামে অবস্থিত স্ত্রী জননছিদ্র ও পশ্চাৎপ্রান্তের কিছু সম্মুখে অবস্থিত পুং জননছিদ্র দ্বারা এরা জনন কার্য সম্পন্ন করে। স্ত্রী আরশোলার উদরের সপ্তম দেহখণ্ডের কৃত্তিকা-বরণীর নিম্নভাগ বৃহদাকারের, দেখতে প্রায় নৌকোর মত। এর ভেতরেই ডিম জমা থাকে। পুরুষ আরশোলার কিন্তু এইরূপ হয় না।

শ্বাসছিদ্র (Stigmata)—বক্ষে দু'জোড়া ও উদরে আটজোড়া যে শ্বাসছিদ্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তারা আরশোলার শ্বাসকার্যে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ এই ছিদ্রগুলি দিয়েই বায়ু শ্বাসনালী বা ট্র্যাকিয়ায় (Tracheae) প্রবেশ করে।

নিবারণের উপায় :—আরশোলা গৃহস্থালীর একটি সাধারণ উৎপাত (Common household pest)। সুতরাং এদেরকে বিনাশ করার ও তাড়াবার বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন রকম ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে; তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—

(১) বোরাক্স (Borax) মিশ্রিত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য (ভাত, আলু, আটা, ময়দা প্রভৃতি) ঘরের আশে পাশে ছড়িয়ে দিলে, তাদের লোভে যখন আরশোলা সেগুলি খায় তখন বোরাক্সের বিষক্রিয়ার ফলে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(২) নিকোটিন (Nicotene), প্যারিস গ্রীণ (Paris green), D. D. T., বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড (Benzene hexachloride) প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ মারিবার বিষাক্ত ঔষুধ (Insecticides) খড়ি মাটির গুঁড়ো বা উপযুক্ত দ্রাবক (Solvent) যথা—জল, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতির সাথে মিশ্রিত ক'রে আরশোলার গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিলে বিষক্রিয়ায় তাদের মৃত্যু হয়।

(৩) কাগজ পুড়িয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি ক'রে আরশোলাকে তাড়ানো যায়।

চিংড়ি :

(Prawn—Palaemon carcinus)

প্রাণিজগতে স্থান (Systematic position) :—চিংড়ি পর্ব—আর্থ্রোপোডা (Arthropoda), শ্রেণী—ক্রাস্টেসিয়ার (Crustacea) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and habitat) :—পুকুর, নদী, হ্রদ প্রভৃতি জায়গায় এদের বাস। জল থেকে তুলে আনলে ডাঙায় এরা বেশীক্ষণ বাঁচে না। বক্ষদেশে যে পাঁচ জোড়া বড় বড় পদ আছে তাদের সাহায্যে এরা হাঁটে। প্রথম পাঁচজোড়া উদর উপাঙ্গ বা প্লিওপড্ (Pleopods) দ্বারা এরা সাঁতার কাটে। আর শেষ উদর উপাঙ্গ জোড়া বা ইউরোপড্ (Uropods) নৌকোর হালের মত নেড়ে এরা জলে ধাক্কা দিয়ে সামনে বা পেছনে চলতে পারে। এরা সর্বভুক

(Omnivorous) প্রাণী ও সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি দাঁড়ার সাহায্যে ধ'রে আহার করে।

মাঝে মাঝে খোলস পরিত্যাগ ক'রে নতুন খোলস গঠন করাও এদের স্বভাব। খোলস পরিত্যাগের এই প্রক্রিয়াকে **একডাইসিস** (Ecdysis) বলে।

বর্ষাকালে এরা ডিম পাড়ে। স্ত্রী চিংড়ির উদর উপাংগের অন্তর্বর্তীস্থানে ডিমগুলি জমা হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা চিংড়ি বের হ'য়ে আসে। বাচ্চা চিংড়ি কয়েকবার খোলস পরিত্যাগের পর পূর্ণাঙ্গ চিংড়িতে পরিণত হয়।

কার্যকারিতাসহ বহিরাকৃতি (**External features with functions**) :—এদের বহিরাকৃতির বিবরণ পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন এদের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতার বিবরণ দেওয়া হল। (ছবি ১৮৬ পৃঃ)

রসট্রাম (**Rostrum**)—শিরোবক্ষকে আবৃত ক'রে যে **ক্যারাপেসটি** (**Carapace**) রয়েছে তার অগ্রভাগটি ক্রমশঃ সরু হ'য়ে একটি শক্ত লম্বা বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এর ওপর নীচ দু'ধারই করাতের দাঁতের ন্যায় দাঁতালো। এটি চিংড়িকে আত্মরক্ষায় ও আক্রমণে সাহায্য করে।

পুঞ্জাক্ষি (**Compound eye**)—রসট্রামের গোড়ার দিকে অবস্থিত বৃন্তযুক্ত কালো ও গোল পুঞ্জাক্ষি দু'টি চিংড়িকে দেখতে সাহায্য করে।

উপাঙ্গসমূহ (**Appendages**) :—চিংড়ির দেহে মোট উনিশ জোড়া উপাঙ্গ আছে। তাদের মধ্যে পাঁচ জোড়া **শির উপাঙ্গ** (**Cephalic appendages**), আট জোড়া **বক্ষ উপাঙ্গ** (**Thoracic appendages**) ও ছয় জোড়া **উদর উপাঙ্গ** (**Abdominal appendages**)। নিম্নে তাদের বিবরণ দেওয়া হল।

শির উপাঙ্গসমূহ : (১) **প্রথম শুঁড় বা অ্যান্টিনা** (**First antenna**)—দেহের অগ্রভাগের দু'পাশে চক্ষুবৃন্তের ঠিক নীচেই এদের অবস্থান। এদেরকে **অ্যানটিনিউল**-ও (**Antennule**) বলে। প্রতিটি তিনটি গাঁটযুক্ত এবং তার অগ্রভাগে বহু গাঁটবিশিষ্ট তিনটি **শুঁয়া** বা **ফ্ল্যাজিলা** (**Flagella**) আছে। শুঁয়াগুলি খুব স্পর্শানুভূতিশীল ও ঘ্রাণগ্রহণক্ষম। প্রতিটি প্রথমজোড়া অ্যানটিনার গোড়ার খণ্ডের অভ্যন্তরে একটি ছোট গোলাকার বালুকাপূর্ণ থলি (sac) দেখা যায়, একে **স্ট্যাটোসিষ্ট** (**Statocyst**) বা **অটোসিস্ট** (**Otocyst**) বলে। এর সাহায্যে চিংড়ি জলের মধ্যে নিজের অবস্থান পরিবর্তন (Change of position) বুঝতে পারে।

(২) **দ্বিতীয় শুঁড় বা অ্যানটিনা (Second antenna)**—প্রতিটি প্রথম অ্যানটিনার নীচে ও একটু পেছনে একটি ক'রে মোট দুটি দ্বিতীয় অ্যানটিনা আছে। প্রতিটিতে দু'টি খণ্ড যুক্ত একটি দণ্ড ও তার অগ্রভাগে একটি **শুঁয়া (Flagellum)** ও একটি বিস্তৃত আঁশের ন্যায় অংশ বা **স্কোয়ামা (Squama)** থাকে। দ্বিতীয় জোড়া শুঁড়টিও স্পর্শানুভূতিশীল ও ঘ্রাণগ্রহণক্ষম। প্রতিটি দ্বিতীয় অ্যানটিনার গোড়ায় একটি ক'রে যে **রেচনছিদ্র (Excretory pore)** থাকে তা' দ্বারা নাইট্রোজেন ঘটিত তরল বর্জ্য বস্তু নিষ্কাশিত হয়।

(৩) **চোয়াল বা ম্যাণ্ডিবিল (Mandible)**—মুখছিদ্রের দু'পাশে অবস্থিত চোয়ালদ্বয়ের প্রতিটি কাইটিন নির্মিত শক্ত উপাঙ্গ। এর অগ্রভাগে কাটবার দাঁত ও তার কিছু নীচে চিবোবার দাঁত থাকে।

(৪) **প্রথম ম্যাক্সিলা (First maxilla)**—এদেরকে **ম্যাক্সিলিউলা**-ও **(Maxillula)** বলে। প্রত্যেকটি চোয়ালের ঠিক পেছনেই এদের অবস্থান ও প্রতিটি তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতির পাতার ন্যায় অংশদ্বারা গঠিত। পাতাগুলির অগ্রভাগে শক্ত শক্ত রোঁয়া থাকায় এইগুলি খাদ্যবস্তুকে ছিঁড়তে সহায়তা করে।

(৫) **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা (Second maxilla)**—প্রতিটি প্রথম ম্যাক্সিলার পেছনে একটি ক'রে পাতার ন্যায় দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা থাকে। প্রতিটিতে স্কাফোগ্‌নেথাইট (Scaphognathite) নামে একটি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অর্ধচন্দ্রাকার বিস্তৃত অংশ থাকে। এর ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোঁয়া (setae) সাজানো থাকে। দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা আংশিকভাবে খাদ্য চবণে ও স্কাফোগ্‌নেথাইটকে আন্দোলিত ক'রে ফুলকো-কক্ষে (Gill-chamber) জল প্রবেশ ও নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং এটি শ্বাসকার্যেও সহায়তা করে।

বক্ষ উপাঙ্গসমূহ (Thoracic appendages):—(১) **প্রথম ম্যাক্সিলিপেড্ (First maxilliped)**—দ্বিতীয় ম্যাক্সিলার পেছনে দু'পাশে একটি ক'রে পাতার ন্যায় প্রথম ম্যাক্সিলিপেড্ থাকে। প্রতিটির গোড়া চওড়া ও শক্ত—খাদ্য বস্তু চিবোতে সাহায্য করে। প্রতিটির অগ্রভাগে এপিপোডাইট (Epipodite) নামে একটি দ্বিধাবিভক্ত অংশ আছে—এটি শ্বাসকার্যে সহায়তা করে।

(২) **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড (Second maxilliped)**—প্রথম ম্যাক্সিলিপেডের পেছনেই অদ্ভুত আকৃতির দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড জোড়াটি অবস্থিত। প্রতিটির গোড়ায় শ্বাসকার্যে সহায়তাকারী একটি ক্ষুদ্র পাতার ন্যায়

এপিপোডাইট্ (Epipodite) থাকে। এছাড়া দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেডের নিম্নদেশে শ্বাসকার্যের জন্য একটি ফুলকোও আটকানো থাকে।

(৩) তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড (Third maxilliped)—দ্বিতীয় জোড়ার
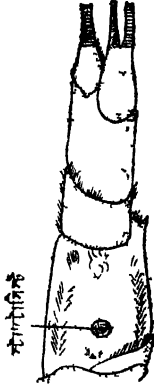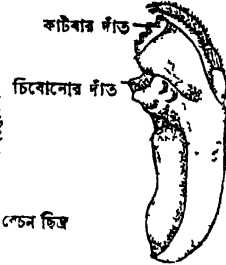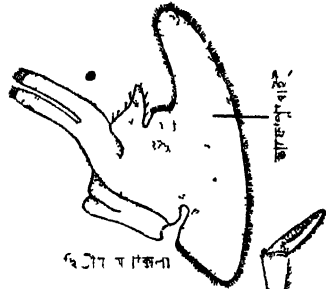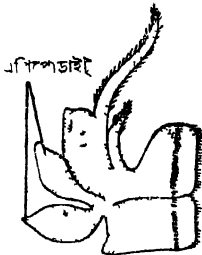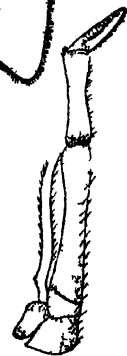
চিংড়ির শিরোবক্ষের উপাঙ্গসমূহ

পেছনেই তৃতীয় জোড়া। এর আকৃতি অনেকটা প্রায় পদের ন্যায়। এর

গোড়াতেও শ্বাসকার্যে সহায়তাকারী একটি এপিপোডাইট্ (Epipodite) আছে।

(৪) **পাঁচ জোড়া পদ** (Five pairs of walking legs)—তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেডের পেছনে পর পর পাঁচ জোড়া পদ অবস্থিত। প্রত্যেকটি পদ গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত কক্সোপোডাইট্ (Coxopodite), বেসিপোডাইট্ (Basipodite), ইস্কিয়াম (Ischium), মেরাস (Merus), কারপাস (Carpus), প্রোপোডাস (Propodus), ড্যাক্‌টাইলাস (Dactylus) এই সাতটি পায়ের অংশ বা **পোডোমিয়ার** (Podomeres) নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় জোড়া পদটি আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া পদের অগ্রভাগ সাঁড়াসির মত হয়েছে ব'লে এদের **দাঁড়া** বলে। দাঁড়ার সাহায্যে এরা খাদ্যবস্তু ধরে। পদগুলির সাহায্যে এরা হাঁটতে পারে। তৃতীয় ও পঞ্চম পদের গোড়ায় যথাক্রমে স্ত্রী ও পুং জননছিদ্র অবস্থিত। **প্রজনন** সময়ে এগুলি হতে যথাক্রমে **ডিম** (Eggs) ও **শুক্রকীট** (Sperms) নির্গত হয়।

উদর উপাঙ্গসমূহ (Abdominal appendages) :—উদরের ছয়টি দেহখণ্ডের প্রতিটির অঙ্কদেশে একজোড়া ক'রে মোট ছয় জোড়া উদর উপাঙ্গ বিদ্যমান। প্রতিটি উদর উপাঙ্গ আকারে ইংরাজী 'Y' বর্ণের মত। দণ্ডটিকে প্রোটোপোডাইট (Protopodite) এবং ভেতরের বাহুটিকে এনডোপোডাইট (Endopodite) ও বাইরের বাহুটিকে এক্‌সোপোডাইট (Exopodite) বলে। এইরূপ উপাঙ্গগুলিকে দ্বিবাহুবিশিষ্ট উপাঙ্গ (Biramus appendages) বলে। এটি ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। নিম্নে উদর উপাঙ্গগুলির বিবরণ দেওয়া হল।

(১) **প্লিওপড্** (Pleopods)—প্রথম পাঁচ জোড়া উদর উপাঙ্গকে প্লিওপড্ বলে। প্রথম জোড়া প্লিওপডের প্রতিটির এক্‌সোপোডাইট বাহুটি এন্‌ডোপোডাইট বাহু অপেক্ষা অনেক বড় ও বিস্তৃত। দ্বিতীয় জোড়ার প্রত্যেকটিতে এক্‌সোপোডাইট ও এন্‌ডোপোডাইট বাহু দু'টি প্রায় সমান—এন্‌ডোপোইটটি কিঞ্চিৎ ছোট। তৃতীয় হতে পঞ্চম জোড়া প্লিওপডের প্রতিটির এন্‌ডোপোডাইট এক্‌সোপোডাইট অপেক্ষা ছোট। দ্বিতীয় হতে পঞ্চম জোড়ার প্রতিটির এন্‌ডোপোডাইটের নীচের দিকে ও তার ভেতরের ধারটির গায়ে লাগানো একটি কাঠির ন্যায় অংশ দেখা যায়—একে **অ্যাপেনডিক্স ইন্‌টারনা** (Appendix interna) বলে। স্ত্রী চিংড়িতে একপাশের অ্যাপেন্‌ডিক্স ইন্‌টারনাগুলি অপর পাশেরগুলির সাথে মিলিত হয়ে ডিম জমা রাখবার জায়গা প্রস্তুত করে। পুরুষ

চিংড়ির দ্বিতীয় জোড়া প্লিওপডের প্রত্যেকটিতে অ্যাপেনডিক্স ইন্‌টারনা ব্যতীত এন্‌ডোপোডাইট থেকে আর একটি অতিরিক্ত ছোট শাখা বের হয়েছে
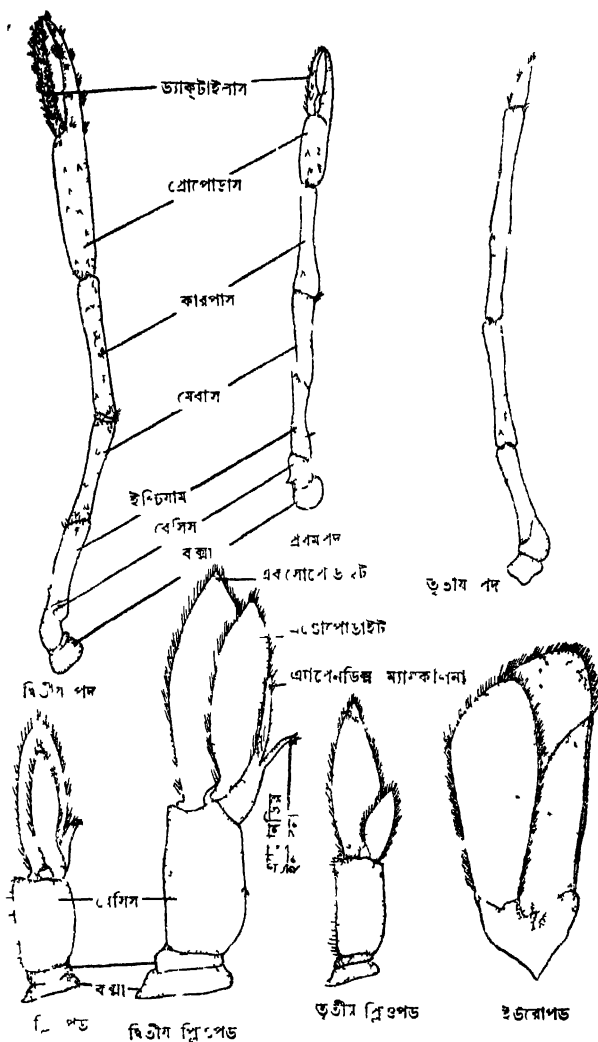
চিংড়ির পদ ও উদর উপাঙ্গ

একে অ্যাপেন্‌ডিক্স ম্যাসকিউলিনা (Appendix masculina) বলে। সঙ্গমকালে এরা সহায়তা করে। প্লিওপড্‌গুলির এক্‌সোপোডাইট ও

এন্‌ডোপোডাইটগুলি বিস্তৃত হওয়ায় এরা নৌকার দাঁড়ের মত কাজ ক'রে চিংড়িকে সাঁতার কাটায় সাহায্য করে।

(২) **ইউরোপড্** (Uropods)—শেষ জোড়া উদর উপাঙ্গগুলি বেশ বড় ও আকৃতিতে স্বতন্ত্র। এদের এক্‌সোপোডাইট ও এন্‌পোডাইটগুলি খুব বড় ও পাখার ন্যায় বিস্তৃত। ইউরোপড্ দু'টি চিংড়ির শেষ প্রান্তে অবস্থিত সরু ও সচল **টেলসন** টির (telson) সহযোগিতায় একটি শক্তিশালী **পুচ্ছ পাখনা** (Tail fin) গঠন করেছে। পুচ্ছ পাখনাটি হালের ন্যায় কাজ করে ও গতির দিক নির্ণয়ে সহায়তা করে।

প্লিওপড্ ও ইউরোপড্গুলি সাঁতার কাটায় ব্যবহৃত হয় ব'লে এদেরকে **সুইমারেট্স্**ও (Swimmerets) বলে।

কঠিনাস্থি বিশিষ্ট মাছ : ভেট্‌কী

(Bony fish : Bhetki—Lates calcarifer)

প্রাণিজগতে স্থান :—পর্ব কর্ডাটা (Phylum Chordata)—জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থায় নোটোকর্ড, গলবিলের ফুলকোছিদ্র ও পৃষ্ঠদেশীয় ফাঁপা স্নায়ুসূত্র আছে।

বিভাগ—ভার্টিব্রাটা (Section-Vertebrata)—মাথার খুলি ও মেরুদণ্ড আছে।

উপপর্ব—ন্যাথোষ্টোমাটা (Sub phylum-Gnathostomata)—চোয়াল বিশিষ্ট।

উপবিস্থিত শ্রেণী—পিসেস (Super class—Pisces)—ফিন-রে বিশিষ্ট জোড়া পাখনা আছে।

শ্রেণী—অস্‌টিকথিস্ (Class—Osteichthyes)—দেহ কঙ্কাল কঠিনাস্থিতে গঠিত।

স্বভাব ও বাসস্থান :—সমুদ্রে পতিত নদীর মোহনার লবণাক্ত জলেই এরা সাধারণতঃ বাস করে। সমুদ্রেও এদের দেখা যায়। অন্যজাতীয় মাছ, মাছের ডিম, চিংড়ি, অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী ও তাদের লার্ভা প্রভৃতি শিকার ধ'রে এরা পুষ্টিসাধন করে। সুতরাং স্বভাবে এরা মাংসাশী (Carnivorous)।

কার্যকারিতাসহ বহিরাকৃতি :—**দেহাকৃতি**—এদের দেহ লম্বা ও দু'পাশ হতে চ্যাপ্টা এবং দ্বিপার্শ্বীয়রূপে প্রতিসম। সমস্ত দেহটি **মাথা, ধড়** ও **লেজে** বিভক্ত। অগ্রভাগ থেকে কান্‌কো পর্যন্ত মাথা, কান্‌কোর পেছন থেকে পায়ু পর্যন্ত ধড় ও পায়ুর পরের বাকী অংশ লেজ।

দেহায়তন—এরা লম্বায় চার ইঞ্চি থেকে চার ফুট পর্যন্ত হয়।

ভেট্‌কী মাছের বহিরাকৃতি
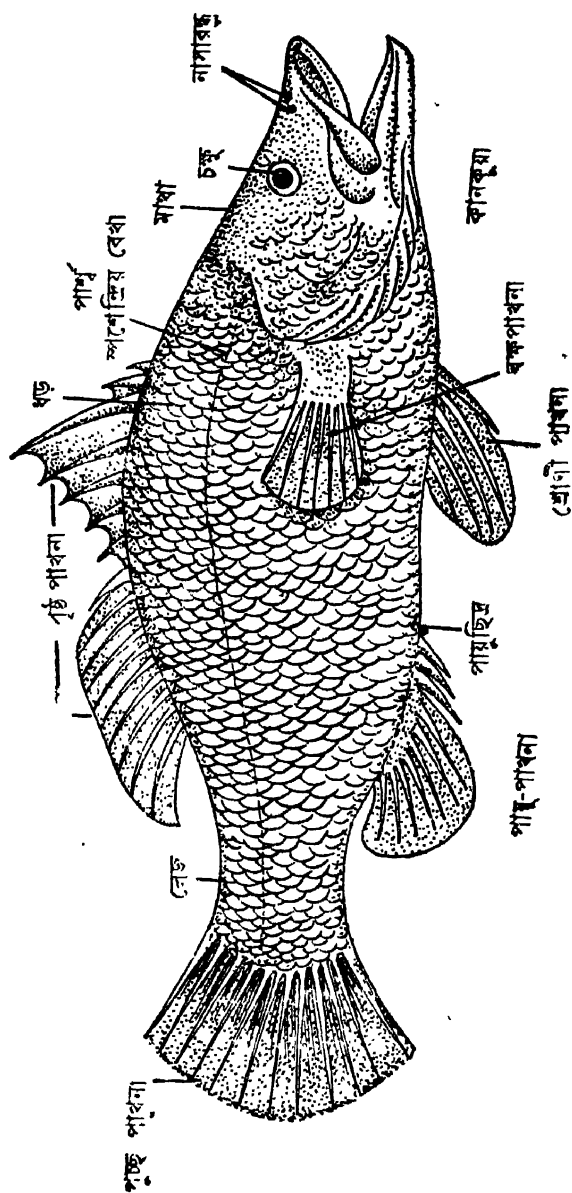
আঁশ—সমস্ত দেহটি আঁশদ্বারা আবৃত—আঁশগুলি এমনভাবে সাজানো যে সামনের আঁশগুলি পেছনের আঁশগুলির কিছু অংশ ঢেকে রাখে। প্রতিটি আঁশের পশ্চাৎদিকের মুক্ত ধারটি ছোট ছোট দাঁতের মত কাঁটাযুক্ত। এই প্রকার আঁশকে টিনয়েড আঁশ (Ctenoid scale) বলে। আঁশগুলি দেহটিকে সুরক্ষিত রাখে।

মুখছিদ্র—ধড় অপেক্ষা সরু মাথাটির অগ্রপ্রান্তে মুখছিদ্রটি অবস্থিত। মুখছিদ্রটি উপরের ও নীচের চোয়াল দ্বারা আবদ্ধ। মুখছিদ্র খাদ্য ও শ্বাসকার্যের জন্য জল গ্রহণে সাহায্য করে।

নাসারন্ধ্র—মাথার অগ্রভাগে চোখের সামনে প্রতি পাশে একজোড়া ক'রে মোট দু'জোড়া নাসারন্ধ্র আছে। প্রতিটি সামনের নাসারন্ধ্র একটি কপাটিকা (valve) যুক্ত। নাসারন্ধ্রগুলি মুখবিবরের সাথে যুক্ত নয়। এইগুলি কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

চোখ—নাসারন্ধ্রের পেছনেই দু'পাশে দু'টি গোলাকার চোখ। চোখে ওপরের পাতা ও নীচের পাতা থাকে না; কিন্তু সমস্ত চোখটি একটি স্বচ্ছ তৃতীয় পাতা বা **নিকৃটিটেটিং মেমব্রেনে** আবৃত থাকে। জলের ভেতরে চোখ দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

কানকো—মাথার পেছন দিকে দু'পাশে দুটি অর্ধচন্দ্রাকার কানকো থাকে। প্রতিটির মুক্ত পশ্চাৎধারে একটি পাতলা ঝিল্লি দেখা যায়—এটি **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল মেমব্রেন** (Branchiostegal membrane)। কানকো **ফুলকো** (gills) ও **ফুলকো-কক্ষকে** (gill-chamber) ঢেকে রাখে। মুখদ্বারা গৃহীত জল ফুলকোর সাহায্যে **শ্বাসকার্য** (Respiration) হবার পর কানকো খুলে গিয়ে সেই জলকে বের ক'রে দেয়।

পার্শ্ব স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা—কানকোর পেছন থেকে আরম্ভ হয়ে দেহের দু'পাশ দিয়ে লেজ পর্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে যে পার্শ্ব স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা দু'টি চ'লে গেছে সেগুলি অনুভূতিশীল হওয়ায় তাদের দ্বারা তাপ, চাপ, স্রোতের গতি প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোঝা যায়।

পায়ুছিদ্র—ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে অঙ্কদেশে একটি গর্তের ভেতর পায়ুছিদ্রটি অবস্থিত। পায়ুছিদ্র ছাড়াও ঐ গর্তে **রেচনছিদ্র** ও **জননছিদ্র** দেখা যায়। পায়ু মল নিকাশনে, রেচনছিদ্র রেচন কার্যে, ও জননছিদ্র জনন কার্যে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন পাখনা (fins) :

জোড়া পাখনা :—(১) বক্ষ পাখনা (Pectoral fins)—কান্‌কোর পেছনে ধড়ের ঠিক অগ্রভাগেই এই জোড়া পাখনার অবস্থান। প্রতিটি কঠিনাস্থি নির্মিত চৌদ্দটি ফিন্‌-রে যুক্ত।

(২) **শ্রোণী পাখনা (Pelvic fins)**—বক্ষ পাখনার পেছনেই অঙ্কদেশে এদের অবস্থান। প্রতিটি পাঁচটি ফিন্‌-রে বিশিষ্ট। প্রথম ফিন্‌-রেটি একটি শক্ত কাঁটায় পরিণত হয়েছে।

বেজোড় পাখনা :—(১) অগ্রভাগের পৃষ্ঠ পাখনা (Anterior Dorsal fin)—ধড়ের অগ্রভাগের পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখায় এর অবস্থান। এটি সাতটি শক্ত কাঁটার মত ফিন্‌ রে বিশিষ্ট। তৃতীয় ফিন্‌-রেটি বৃহত্তম।

(২) **পশ্চাৎভাগের পৃষ্ঠ পাখনা (Posterior Dorsal fin)**—অগ্রভাগের পৃষ্ঠ পাখনার পশ্চাতেই ধড়ের পশ্চাৎভাগের পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখায় এর অবস্থান। এটি বারোটি ফিন্‌-রে যুক্ত। প্রথম ফিন্‌-রেটি কাঁটায় পরিণত হয়েছে।

(৩) **পায়ু পাখনা (Anal fin)**—পায়ুর পশ্চাতে লেজের অঙ্কদেশের মধ্য রেখায় এর অবস্থান। এটি এগারোটি ফিন্‌-রে বিশিষ্ট। প্রথম তিনটি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে।

(৪) **পুচ্ছ পাখনা (Caudal fin)**—এটা বেশ বড় ও দেহের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এর বাইরের ধারটি অর্ধচন্দ্রাকার। এতে শক্ত অস্থি নির্মিত মোট উনিশটি ফিন্‌-রে আছে।

পাখনার কাজ :—পাখনাগুলির সাহায্যে এরা জলের মধ্যে সহজ ও সমান্তরালভাবে ভেসে থাকতে পারে। তাছাড়া জোড়া পাখনাগুলি সাঁতার কাটার সময় জলের অভ্যন্তরে ওঠা-নামায় সাহায্য করে, অন্য বেজোড় পাখনাগুলি নৌকোর হালের মত কাজ ক'রে গতির দিক নির্দেশ করে।

ব্যাঙ :

(Toads & Frogs)

প্রাণিজগতে স্থান :—পর্ব—কর্ডাটা। বিভাগ—ভার্টিব্রাটা। উপপর্ব—ন্যাথোস্টোমাটা। শ্রেণী—উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া (কারণ, ত্বক নগ্ন, স্যাঁৎসেঁতে ও গ্রন্থিবহুল)।

স্বভাব ও বাসস্থান :—ব্যাঙ নানাপ্রকার। সুতরাং এদের স্বভাব ও বাসস্থান বিচিত্র। আমাদের দেশের **কুনো ব্যাঙ** (Bufo melanostictus) সাধারণতঃ ভেজা মাটিতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায়, গর্তের ভেতর ভাঙা দেওয়ালের

ফাঁকে প্রভৃতি জায়গায় বাস করে। **কোলা বা সোনা ব্যাঙ** (Rana tigrina) সাধারণতঃ বাস করে জলের নিকটবর্তী স্থানে—পুকুর, ঝিল, ডোবা, নালা প্রভৃতি জায়গার কাছাকাছি এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। আবার **গেছো ব্যাঙের**ও (Hyla versicolor, H. arborea) সংবাদ পাওয়া গেছে—তারা অবশ্য আফ্রিকার ব্যাঙ। **উড়ো ব্যাঙের** (Rhacophorous paradalis) কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—ভালভাবে না উড়তে পারলেও সহজেই এরা এক গাছ থেকে আর এক গাছে ভেসে যায় (ছবি ১২৩ পৃঃ)। কুনো, কোলা প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এরা কীট-পতঙ্গ, কেঁচো ও অন্যান্য ছোটো ছোটো প্রাণী ধ'রে খায়।

জলেই থাকুক আর ডাঙায়ই থাকুক, ডিম পাড়বার সময় কিন্তু সমস্ত ব্যাঙকেই জলে আসতে হয় এবং এদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা বা ব্যাঙাচি অবস্থা জলেই অতিবাহিত হয়। এদের অপত্যস্নেহ খুবই প্রবল ও চমকপ্রদ। স্ত্রী অথবা পুরুষ আবার ক্ষেত্রবিশেষে উভয়েই ডিম সংরক্ষণ ও সন্তান-সন্ততি পালনে (parental care) অংশ গ্রহণ করে। ফ্রান্স ও ইতালির **পুরুষ ধাত্রী ব্যাঙ** (midwife toad=Alytes obstetricans) পশ্চাৎ পদদ্বয়ের মাঝখানে গুচ্ছাকারে ডিম সংরক্ষিত রাখে (ছবি ১২৩ পৃঃ)। স্ত্রী-পাইপা ব্যাঙ (Pipa pipa), স্ত্রী গেছো ব্যাঙ (Hyla goeldii) পিঠের ওপর ডিম রক্ষা ও সন্তান পালন করে। রাইনোডারমা নামক আর এক জাতীয় ব্যাঙের পুরুষেরা নরম থলির মধ্যে সন্তান পালন করে।

এরা অনুষ্ণশোণিত প্রাণী (cold blooded animal)। যেমন খুব বেশী গরম এরা সহ্য করতে পারে না, তেমনি খুব বেশী শীতও এরা সহ্য করতে পারে না। শীতকালে প্রাণভয়ে এরা গর্তের মধ্যে আশ্রয় নেয়। এই সময় এরা প্রায় নিশ্চুপ থাকে—না খাদ্য গ্রহণ করে, না নিশ্বাস নেয়। এই সময় এরা সিক্ত চামড়া দ্বারা খুব ধীরে ধীরে শ্বাসকার্য সম্পন্ন ক'রে বেঁচে থাকে। চামড়ার দ্বারা শ্বাসকার্যকে কিউটেনিয়াস শ্বাসকার্য (cutaneous respiration) বলে। দেহভ্যন্তরে সঞ্চিত স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট বডি (Fat bodies) থেকেই এই সময় পুষ্টি সাধিত হয়। প্রায় তিনমাস এইভাবে জীবনযাপন করার পর বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এরা গর্তের আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন আরম্ভ করে। শীতকালের এই নিশ্চুপ অবস্থাকে **শীতঘুম** বা **হাইবারনেসন** (Hibernation) বলে।

বর্ষাকাল ব্যাঙেদের প্রজনন ঋতু। এই সময় পুরুষ ব্যাঙগুলি কর্কশ শব্দে স্ত্রী ব্যাঙদের আহ্বান জানায়। স্ত্রী ব্যাঙগুলি কিন্তু কোন প্রকার শব্দ করতে পারে না। নীচের চোয়ালের তলদেশে চামড়ার তলায় কালো রঙের একটি স্বরযন্ত্র বা ভোকাল স্যাক (vocal sac) থাকার ফলেই পুরুষ ব্যাঙ ডাকতে পারে। বাইরে থেকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে কালো ভোকাল স্যাকটির অস্তিত্ব বোঝা যায়।

কার্যকারিতাসহ বহিরাকৃতিঃ—কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি এবং কুনো ও কোলা ব্যাঙের বহিরাকৃতির পার্থক্যের বিবরণ পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন এদের বহিরাকৃতির বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা বলা হল।

ত্বক—এদের নগ্ন ত্বকটি গ্রন্থিবহুল হওয়ায় তা ত্বকটিকে সর্বদা সিক্ত রাখে। সিক্ত ত্বক শ্বাসকার্যে অংশ গ্রহণ করে।

মুখছিদ্র—মাথার অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত চওড়া মুখটি খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য গ্রহণে জিভ্‌টির (tongue) ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জিভ্‌টির সম্মুখভাগ মুখ-বিবরের তলভূমির সামনের দিকে আটকানো থাকে, পশ্চাৎ দিকটি থাকে মুক্ত। সুতরাং শিকার ধরার সময় সমস্ত আঠালো জিভ্‌টি বের করে দিয়ে শিকারের গা স্পর্শ করতে পারে ও শিকারসহ জিভ্‌টি পুনরায় মুখ বিবরে নিয়ে যায়।

বহিঃ নাসারন্ধ্র—ওপরের চোয়ালের সম্মুখ দিকের দু'পাশে অবস্থিত বহিঃ নাসারন্ধ্র দু'টি শ্বাসকার্যে ও ঘ্রাণ গ্রহণে ব্যবহৃত হয়।

চোখ—বহিঃনাসারন্ধ্রের পেছনে গোলাকার ও স্ফীতকায় চোখ দু'টি দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ করে। ওপরের পাতা, নীচের পাতা ও স্বচ্ছ নিকটিটেটিং মেমব্রেন চোখকে সুরক্ষিত রাখে।

কর্ণপটহ—চোখের পেছনে অবস্থিত গোলাকার কর্ণপটহ দু'টি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

প্যারাটয়েড্ গ্রন্থি (Paratoid gland)—ধড়ের সম্মুখভাগের দু'পাশে ও কর্ণপটহের ঠিক পশ্চাতে অবস্থিত প্যারাটয়েড গ্রন্থি দু'টি বিষাক্ত রস বা গরল নিঃসৃত ক'রে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ—অগ্রপদ পশ্চাৎপদ অপেক্ষা বেশ ছোট এবং পশ্চাৎপদ অপেক্ষা বেশী মাংসল। সুতরাং পায়ের মাংস পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ব্যাঙ সহজেই ডাঙার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারে। পশ্চাৎপদে লিপ্ত পদ (webbed feet) গঠিত হওয়ায় এরা জলে সাঁতার কাটতেও

পারে। কোলা ব্যাঙের লিপ্তপদ খুব ভালভাবে গঠিত হওয়ায়, এরা সাঁতারে খুব দক্ষ
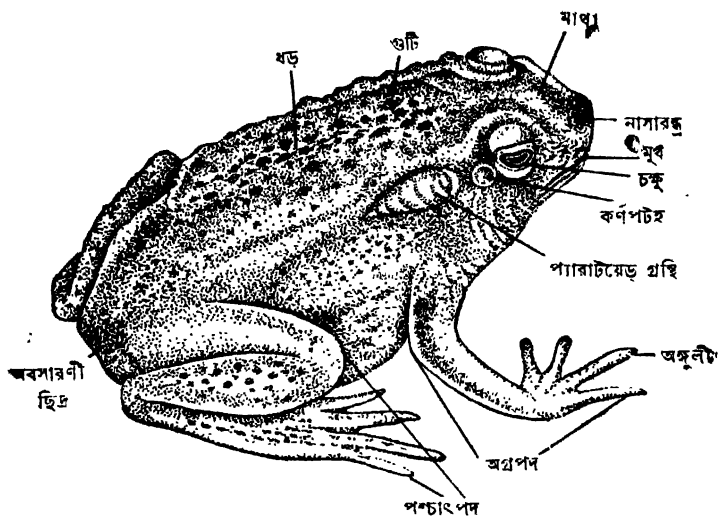
কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি

অবসারণী ছিদ্র (Cloacal aperture)—ধড়ের শেষপ্রান্তে দুটি পশ্চাৎপদের অন্তর্বর্তী জায়গায় মধ্যস্থলে যে অবসারণী ছিদ্র থাকে তা দিয়ে যেমন মল-মূত্র নিঃস্রাবিত হয়, তেমনি প্রজনন কাল পুরুষ ব্যাঙের শুক্রাণু (spermatozoa) ও স্ত্রী ব্যাঙের ডিম্বাণু (eggs) বের হয়ে আসে।

পাখী :
(Bird)

প্রাণিজগতে স্থান :—পর্ব—কর্ডাটা। বিভাগ—ভার্টিব্রাটা। উপপর্ব—ন্যাথোস্টোমাটা। শ্রেণী—আভিস (Aves)—দেহ পালক দ্বারা ঢাকা ও চঞ্চুবিশিষ্ট।

স্বভাব ও বাসস্থান :—এই পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের পাখী আছে। সুতরাং তাদের স্বভাব ও বাসস্থানও বিভিন্ন। **পায়রা (Columba livia)** যাকে সাধারণতঃ জীববিজ্ঞানে পাখীদের প্রতিনিধি হিসেবে ধরা হয় তার বাসস্থল পুরানো বাড়ীর বারন্দা, ঘরের কার্নিশ, ঘুলঘুলি ইত্যাদি। পাখীরা

সাধারণতঃ আকাশচারী—পক্ষ বিস্তার ক'রে আকাশে উড়ে বেড়ানোই এদের স্বভাব। আবার কেউ কেউ (যেমন হাঁস) জলে সুন্দর সাঁতার কেটে বেড়ায়। আবার এমন পাখীও আছে যারা মোটেই উডতে পারে না কিন্তু দ্রুত দৌড়তে পারে। এই পাখাদের **দৌড় পাখী** (Ratitae) বলে।

উড়োপাখীদের (carinatae) যেমন অগ্রপদ জোড়াটি সুন্দর একজোড়া পাখায় পরিণত হয়েছে, দৌড পাখীর কিন্তু সে রকম কোন পাখা নেই—তাদের পাখা জোড়াটি প্রায় অবলুপ্তির পথে। কিন্তু দৌড় পাখীদের পশ্চাৎপদ হয় বেশ লম্বা, মজবুত ও দৌড়োবার পক্ষে খুব উপযোগী। উটপাখী (Ostrich), এমু (Emu), রীয়া (Rhea), কিউই (Kiwi) প্রভৃতি দৌড় পাখীদের উদাহরণ।

পাখীদের অপত্যস্নেহ খুবই বিস্ময়কর। ডিম পাড়বার পূর্বে এরা খড, কুটো প্রভৃতি জোগার ক'রে কোন নিরাপদ স্থানে বাসা বাঁধে। ডিম না ফোটা পর্যন্ত প্রায় সকল সময় ডিমগুলিকে এরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার পরও যে পর্যন্ত না বাচ্চাগুলি স্বাবলম্বী হয় ততদিন পর্যন্ত এরা বাচ্চাগুলিকে সযত্নে লালন-পালন করে। এই সময় কোন শত্রুর আক্রমন পাখী মোটেই বরদাস্ত করে না—তীক্ষ্ণ চঞ্চু ও পায়ের নখরের সাহায্যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে।

কার্যকারিতাসহ বহিরাকৃতি :—পাখীদের প্রতিনিধি হিসাবে পায়রার বহিরাকৃতির বিবরণ পূর্ব অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখন তার বহিরাকৃতির বিশেষ বিশেষ অংশ ও তাদের কার্যকারিতার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

পালক (Feathers)—চঞ্চু ও পশ্চাৎপদ ব্যতীত এদের সর্বাঙ্গ পালকে আবৃত। পালকগুলির আকার ও গঠন বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। একটি আদর্শ পালক ভালভাবে পরীক্ষা করলে এর মধ্যরেখায় লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত একটি কাঠির মত মধ্য অক্ষ (central axis) দেখা যায়—একে **র‍্যাচিস্** (Rachis) অথবা ক্যালামাস (Calamus) বলে। মধ্য অক্ষের দু'পাশের বিস্তৃত অংশকে বলে **পালকপাত** বা **ভেন** (Vane)। মধ্য অক্ষের গোড়ার কিছু অংশে কিন্তু ভেন থাকে না, সেই অংশটি মোটা ও একে বলে **কুইল** (Quill)। কুইলের তলায় ও ওপরের একপাশে একটি ক'রে মোট দু'টি ছিদ্র আছে। তলার ছিদ্রটিকে বলে **ইন্‌ফিরিয়র আম্বিলিকাস** (Inferior umbilicus) আর ওপরের একপাশের ছিদ্রটির নাম **সুপিরিয়র আম্বিলিকাস**

(Superior umbilicus)। সুপিরিয়র আম্বিলিকাসের কাছে ক্ষুদ্রাকৃতির একগুচ্ছ পালক দেখা যায়—একে **আফ্‌টার শ্যাফ্‌ট্** (After shaft) বলে। দেহের সর্বাঙ্গে পালকগুলি নির্দিষ্ট রেখাপথ বা টেরিলিতে (Pterylae) সাজানো থাকে। পালকগুলি ওড়ায় ও তাপ-পরিবাহী না হওয়ায় দেহের উত্তাপ রক্ষা করতে সহায়তা করে।
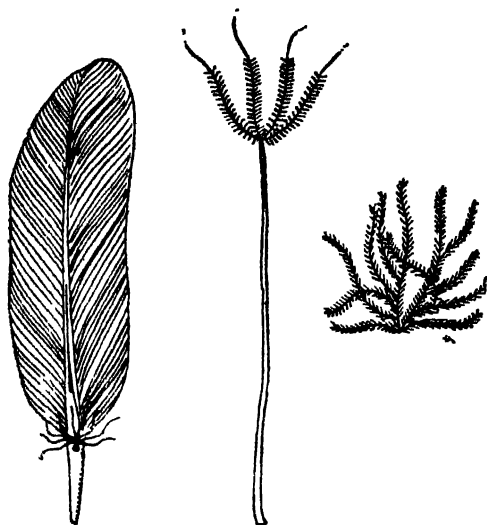
পাখীর কয়েকটি পালক
(ক) একটি আদর্শ পালক, (খ) ফাইলোপ্লিউম, (গ) নেষ্ট লিং ডাউন (শিশু পাখবার প্রায় সারা দেহে দেখা যায়)

চঞ্চু (Beaks)—মাথার সম্মুখভাগে অবস্থিত এক জোড়া দাঁতবিহীন চঞ্চু বা ঠোঁট দ্বারা এরা খাদ্য গ্রহণ করে। চঞ্চু আত্মরক্ষা ও আক্রমণেও সাহায্য করে। বিভিন্ন পাখীতে অভিযোজন অনুসারে চঞ্চুর আকার বিভিন্ন প্রকার হয়।

বহিঃনাসারন্ধ্র—ওপরের চঞ্চুর গোড়ায় দু'পাশে অবস্থিত বহিঃনাসারন্ধ্র দুটি শ্বাসকার্য ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

চোখ—ওপরের পাতা, নীচের পাতা ও অর্ধস্বচ্ছ নিকটিটেটিং মেমব্রেন দ্বারা সুরক্ষিত গোলাকার চোখ দু'টি দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

শ্রবণছিদ্র—চোখের পেছনে পালকাবৃত শ্রবণছিদ্র দু'টি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

গ্রীবা—মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত গ্রীবাটি নমনীয় হওয়ায় মাথাকে বিভিন্ন দিকে নড়াতে সহায়তা করে।

ডানা বা পাখা—ধড়ের অগ্রভাগের দু'ধারে অবস্থিত ডানা জোড়া দু'টি

ওড়ায় সাহায্য করে। তেইশটি **রেমিজেস**(Remiges) বা ডানার লম্বা লম্বা পালকগুলি ওড়ায় বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করে।

পশ্চাৎপদ*—পশ্চাৎপদ জোড়াটি সোজাভাবে বসতে ও হাঁটতে সহায়তা করে এবং এর অঙ্গুলীগুলি গাছের ডাল প্রভৃতি ধরতে সাহায্য করে। বিভিন্ন পাখীর পরিবেশ ও অভিযোজন অনুসারে পায়ের আকৃতিও বিভিন্ন।

অবসারণী ছিদ্র—ধড়ের শেষপ্রান্তে ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে অবসারণী ছিদ্রটির দ্বারা মল, মূত্র নিষ্কাশিত হয়।

যৌন মিলনের সময় পুরুষ পায়রার এই ছিদ্র পথেই **শুক্রাণু** (Sperms) নিঃসরিত হয়। স্ত্রী পায়রা এই ছিদ্র পথেই **ডিম** প্রসব করে।

লেজ—প্রকৃত লেজ বা **ইউরোপাইজিয়ামটি** খুবই ছোট সেকথা পূর্ব অধ্যায়েই বলা হয়েছে। ইউরোপাইজিয়াম থেকে যে বারোটি পুচ্ছ পালক বা **রেক্‌ট্রিসেস** (Rectrices) বের হয়েছে সেগুলি ওড়ার সময় হালের মত কাজ করে এবং ওড়া বন্ধ করায় সাহায্য করে। ইউরোপাইজিয়ামের পৃষ্ঠদেশে যে তৈল গ্রন্থি বা **প্রীণ গ্ল্যাণ্ডটি** আছে তা থেকে তৈল নিঃসৃত হয়ে পালকগুলিকে তৈলাক্ত রাখতে সাহায্য করে।

গিনিপিগ ঃ
(Guinea Pig—Cavia porcellus)

প্রাণিজগতে স্থান (Systematic position) ঃ—পর্ব—কর্ডাটা, বিভাগ—ভার্টিব্রাটা, উপপর্ব—ন্যাথোষ্টোমাটা, শ্রেণী—ম্যামেলিয়া (দেহে লোম, বহিঃকর্ণ ও স্তন বর্তমান।)

স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and Habitat) :—স্বভাবে এরা অত্যন্ত নিরীহ উদ্ভিদভোজী (Herbivorous) প্রাণী—সাধারণতঃ ঘাস, পাতা, শস্যাদি খেয়েই জীবন ধারণ করে। নামে যদিও গিনিপিগ তবু এরা পিগও (শুয়োর) নয় এবং আফ্রিকার গিনি উপকূলও এদের বাসভূমি নয়। বস্তুতঃ এরা দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণী। সাধারণতঃ এরা দলবদ্ধভাবে বনে-জঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে মাটির নীচে গর্ত ক'রে বাস করে। আশে পাশে কোন বিজাতীয় শত্রু দেখলে এরা তৎক্ষণাৎ গর্তের ভেতর আশ্রয় নেয়। আমাদের

*পশ্চাৎপদে যে টেণ্ডন (Tendon) গুলি থাকে পাখী ঘুমিয়ে গেলে, সেগুলি অঙ্গুলিগুলিকে গাছের ডালকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে। ফলে ঘুমলে এরা প'ড়ে যায় না।

দেশে যে সমস্ত গিনিপিগ দেখা যায়, এরা দক্ষিণ আমেরিকা হতে আমদানীকৃত গিনিপিগদেরই বংশধর এবং এরা সকলেই গৃহপালিত।

কার্যকারিতাসহ বহিরাকৃতি (External features with functions) :

এখানে বহিরাকৃতির বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা দেওয়া হল।

লোম—সারা দেহকে আবৃত ক'রে যে লোম দেখা যায় সেগুলি তাপ-পরিবাহী না হওয়ায় দেহের উষ্ণতা রক্ষা করতে সাহায্য করে। লোম শৈত্য হতে দেহকে রক্ষা করে।

বহিঃনাসারন্ধ্র—মাথার তুণ্ডের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত বহিঃনাসারন্ধ্র দু'টি শ্বাসকার্যে ও ঘ্রাণ গ্রহণে সাহায্য করে।

মুখছিদ্র—বহিঃনাসারন্ধ্র দুটির কিঞ্চিৎ নিম্নে অবস্থিত মুখছিদ্রটি খাদ্য গ্রহণের অংগ। ওপরের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যে দাঁত দু'টি দেখা যায় তাদের নাম কৃন্তক দন্ত বা **ইনসাইজর** (Incisor)*। এইগুলি ঘাস, পাতা-লতাদি ছিঁড়তে সহায়তা করে। চিবোবার পেষণদন্ত (Premolars & molars) মুখ বিবরের ভেতরের উভয় চোয়ালেই বিদ্যমান।

চোখ—ঢালু মাথাটির দু'পাশে অবস্থিত চোখ দু'টি দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

বহিঃকর্ণ বা পিনা—চোখের পেছনে মাথার দু'পাশে অবস্থিত বহিঃকর্ণ দুটি শব্দগ্রহণ ক'রে শব্দকে মধ্যকর্ণের ভেতর দিয়ে অন্তঃকর্ণে পাঠাতে সহায়তা করে।

অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ—ধড়ের অগ্রভাগে অবস্থিত অগ্রপদ দু'টি ও পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত পশ্চাৎপদ দু'টি হাঁটতে, বসতে ও দৌড়োতে সাহায্য করে।

স্তনবৃন্ত (Teats)—উদরের তলার দিকে অবস্থিত দু'পাশে দু'টি স্তনবৃন্ত দ্বারা স্ত্রী গিনিপিগ সন্তানদের মাতৃদুগ্ধ খাওয়ায়।

পায়ুছিদ্র (Anus)—ধড়ের পশ্চাৎপ্রান্তে অবস্থিত পায়ুছিদ্র দ্বারা খাদ্যের অপাচ্য অংশ বা মল নিষ্কাষিত হয়।

রেচন-জনন ছিদ্র—পূর্ব অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে। এটি রেচন কার্যে (Excretion) ও জননকার্যে (Reproduction) সাহায্য করে।

*কৃন্তক দাঁত বা ইনসাইজর জীবনকাল ধরে খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এরা অন্য কিছুর সাথে কৃন্তক দাঁত ঘষে এর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। কোন কারণে এদের কৃন্তক দাঁত ভেঙ্গে গেলে তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে এবং সেই বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এদের মুখছিদ্র সব সময়ের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফলে এদের মৃত্যু হয়।

Exercise (অনুশীলনী)

1. Write an account of the habit and habitat of Pheretima and justify the statement—"Earthworms are the natural tillers of the soil."

[কেঁচোর স্বভাব ও বাসস্থান বর্ণনা কর ও যুক্তিদ্বারা সমর্থন কর—"কেঁচো মৃত্তিকার স্বাভাবিক কর্ষক"।]

2. Describe the different appertures found on the body of the Earthworm and mention the functions they carry on.

[কার্যকারিতাসহ কেঁচোর দেহের বিভিন্ন ছিদ্রগুলি বর্ণনা কর।]

3. Describe the mouth parts and the thoracic appendages of the cockroach.

[আরশোলার মুখের ও বুকের উপাঙ্গগুলির বিবরণ দাও।]

4. Write an account of the appendages of the Prawn.

[চিংড়ির উপাঙ্গগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ।]

5. Describe various fins present in the body of the Bhetki and state their functions.

[ভেটকীর দেহের বিভিন্ন পাখনার কার্যকারিতাসহ বিবরণ দাও।]

6. Write what you know about the parental care of Toads and Frogs.

[ব্যাঙের অপত্যস্নেহ সম্বন্ধে যা জান বল।]

7. What is meant by Ratitae and Carinatae birds? Describe the functions of various external features of a Carinatae bird.

[দৌড়পাখী ও উড়ো পাখী বলতে কী বোঝায়? একটি উড়ো পাখীর বহিরাকৃতির বিভিন্ন অংশগুলির কার্যকারিতা বল।]

8. Compare the external features of Bufo & Cavia.

[কুনো ব্যাঙ ও গিনিপিগের বহিরাকৃতির তুলনা কর।]

9. Write notes on :—(a) Ecdysis, (b) Statocyst, (c) Hibernation, (d) Remiges. (e) Pinna.

[টীকা লেখ :—(ক) এক্‌ডাইসিস, (খ) স্ট্যাটোসিষ্ট, (গ) শীত ঘুম (ঘ) রেমিজেস, (ঙ) বহিঃকর্ণ।]

৪

ব্যবহারিক

(Practical)

এই অধ্যায়ে প্রদর্শনের (Demonstration) সুবিধার্থে কয়েকটি পতঙ্গের জীবন-বৃত্তান্ত ও বহিরাকৃতি এবং কঠিনাস্থি বিশিষ্ট মাছের ফুলকো ও শ্বাস কার্যের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হ'ল। ছাত্ররা যাতে হাতে-নাতে জিয়ল মাছ ডুবিয়ে মারার পরীক্ষাটি করতে পারে সেইজন্য পরীক্ষা-পদ্ধতিটি বর্ণিত হ'ল।

মশার জীবন বৃত্তান্ত :

(Life history of Mosquito)

পতঙ্গ সাধারণতঃ দু'রকমের—অপকারী (Harmful) ও উপকারী (Beneficial)। মানব সমাজের যারা ক্ষতি সাধন করে তারা অপকারী; আর যারা উপকার সাধন করে তারা উপকারী। মশা অপকারী পতঙ্গ। কারণ এরা বিভিন্ন রোগ বীজাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ তিন প্রকার মশা মানুষের দেহে রোগ বীজাণু প্রবেশ করায়,—(ক) **অ্যানোফিলিস** (Anopheles)—এই জাতীয় স্ত্রী মশা ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু মানবদেহে প্রবেশ করায়, (খ) **কিউলেক্স** (Culex)—এই জাতীয় স্ত্রী মশা ফাইলেরিয়া (গোদ) রোগের বীজাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করায়, (গ) **ষ্টিগোমায়া বা এডিস** (Stegomyia or Aedis) —ডেঙ্গু জ্বর ও প্লীত জ্বরের বীজাণু মানবদেহে প্রবেশ করায়।

জীবনচক্র (Life-cycle) :—সকল প্রকার মশার জীবনেই চারটি **অবস্থা**; যথা—(১) ডিম (Egg), (২) শূককীট (Larva), (৩) মূককীট (Pupa), (৪) পূর্ণাঙ্গ (Imago)।

ডিম—অ্যানোফিলিস মশকী ডোবা, নালা, পুকুর প্রভৃতির মোটামুটি পরিষ্কার জলে ও বাড়ীর আশে পাশের ভাঙা হাঁড়ি, নারকেলের মালা প্রভৃতির মধ্যে সঞ্চিত বৃষ্টির জলে ডিম পাড়ে। এক এক বারে মশকী প্রায় দেড়শত পর্যন্ত ডিম পাড়ে। এদের ডিমগুলি প্রথমাবস্থায় সাদা ও পরে ক্রমে ক্রমে কালো হ'য়ে যায়। ডিমগুলি এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে এদেরকে ভাল দেখা যায় না।

ণুবীক্ষণ যন্ত্রে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় যে ডিমগুলির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক াবে জলের ওপর ভাসে। দুই হতে আড়াই দিন ডিমগুলি এইরূপ অবস্থায় াকে।

অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার জীবন-চক্রের বিভিন্ন অবস্থা
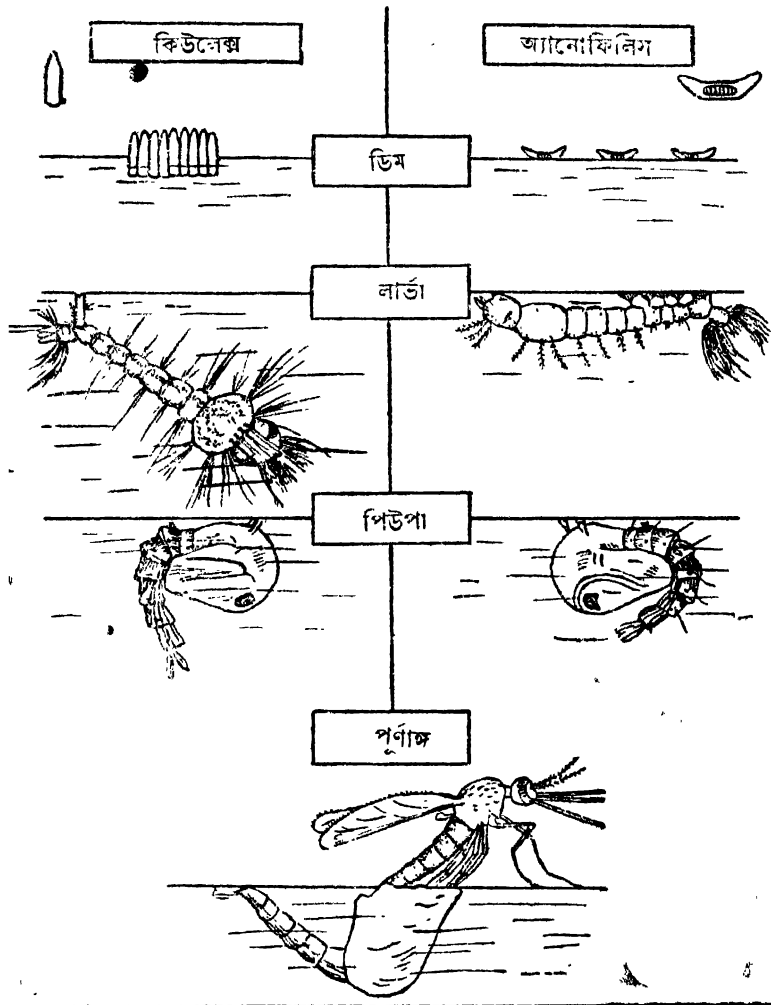
শূককীট বা লার্ভা—সাধারণতঃ তিনদিনের মধ্যেই ডিম ফুটে এক প্রকার কীট বের হয়। এদেরকে শূককীট বলে। শূককীটকে খালি চোখেই দেখা যায়। শূককীটের আকৃতি অদ্ভুত—না থাকে পাখা; না থাকে পা। এদের দেহটি লম্বা ও গায়ে খোঁচা খোঁচা রোম থাকে। দেহটিকে মাথা, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত করা যায়। মাথার দু'পাশে একটি ক'রে চোখ ও শুঁড় থাকে। শূককীট অবস্থা প্রায় আট-দশ দিন থাকে। এর মধ্যেই এরা তিন-চার বার খোলস পরিত্যাগ ক'রে বড় হতে থাকে। এরপর শূককীটের দেহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'লে এরা স্থির হয় ও এদের মাথার দিকটা ক্রমশঃ ফুলতে থাকে। এইটিই শূককীটের শেষ অবস্থা।

মূককীট বা পিউপা:—তারপর শূককীটের মাথার দিকের উপরিভাগের খোলস ফেটে গেলে এর ভেতর হতে আর একপ্রকার কীট বের হয়—একে মূককীট বলে। মূককীটের আকার অনেকটা ইংরাজী 'কমা'র মত। মস্তকের অংশটি স্থূল ও মোটামুটি গোলাকার, কিন্তু মুখ নেই। মাথার ওপরে চোখের ঠিক নিম্নেই একজোড়া শ্বাসনল থাকে—এদের সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয়। এই সময় উদরের দেহ-খণ্ডগুলি সুস্পষ্ট হয়। এই অবস্থায় এরা দু-তিনদিন জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। এর পর এদের মাথার দিকের খোলসটি ফাটতে আরম্ভ করে ও মূককীটের চঞ্চলতা ক'মে আসে।

পূর্ণাঙ্গ বা ইমাগো—মূককীটের মাথার দিকটা সম্পূর্ণ ফেটে গেলে পূর্ণাঙ্গ মশা বের হ'য়ে আসে। জন্মের পর মশা কয়েক ঘণ্টা উড়তে পারে না, কাজেই তখন এরা মূককীটের খোলসের ওপর ব'সে থাকে। তারপর পাখা শক্ত হলে উড়ে গিয়ে খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ মশার বহিরাকৃতি:—এদের দেহটি প্রধানতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত—মাথা, বক্ষ ও উদর। গোলাকার মাথাটির ওপরের দিকে দুটি বৃহৎ পুঞ্জাক্ষি থাকে। মাথার ঠিক সম্মুখভাগে একটি হুলের ন্যায় শোষক নল বা প্রোবোসিস (Proboscis) আছে—এটি অন্য প্রাণিদেহে প্রবেশ করিয়ে এরা রক্ত শোষণ করে। চোয়াল (Mandibles), অধরোষ্ঠ (Labium), জিভ্ (Hypopharynx) ও ম্যাক্সিলা (Maxillae)—এই কয়টি মুখ উপাঙ্গ

অ্যানোফিলিস

কিউলেক্স

মিলিত হয়েই শোষক নলটি গঠন করেছে। কিন্তু ম্যাক্সিলারী পাল্প (Maxillary palps) ছু'টি শোষক নল গঠনে অংশ গ্রহণ না করায় বাইরে থেকে শোষক নলের দু'পাশে এদের দেখা যায়। এছাড়া মাথার অগ্রভাগের দু'পাশে বহু গাঁট যুক্ত দুটি লোমশ শুঁড় বা অ্যানটিনা আছে—এরা স্পর্শানুভবে সাহায্য করে। বক্ষটি তিনটি অংশে বিভক্ত—অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ। প্রতিটি বক্ষাংশের নিম্নে একজোড়া ক'রে মোট তিন জোড়া পা আছে। মধ্যবক্ষে একজোড়া ডানা আছে। উদরটি আটটি দেহখণ্ডে বিভক্ত ও এর পশ্চাৎপ্রান্তে পায়ুছিদ্রটি অবস্থিত।

অ্যানোফিলিস্ ও কিউলেক্স মশার পার্থক্য

আকৃতিগত পার্থক্য

অ্যানোফিলিস্	কিউলেক্স
১। আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট।	১। আকারে অপেক্ষাকৃত বড়।
২। শুঁড়ের অগ্রভাগ মোটা।	২। শুঁড়ের অগ্রভাগ সরু।
৩। স্ত্রী মশায় ম্যাক্সিলারী পাল্প দু'টি শোষক নলের মতই লম্বা।	৩। স্ত্রী মশায় ম্যাক্সিলারী পাল্প দু'টি ছোট।
৪। পুংমশায় ম্যাক্সিলারী পাল্প-দু'টি ভোঁতা।	৪। পুংমশায় ম্যাক্সিলারী পাল্প দু'টি সূচল।
৫। পাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো কালো আঁশের দাগ আছে।	৫। পাখায় এইরূপ দাগ নেই।

জন্মগত পার্থক্য

অ্যানোফিলিস্	কিউলেক্স
১। ডিমগুলি নৌকাকৃতি ও প্রতিটি ডিমের দু'পাশে বাতাস পূর্ণ ভেলক বা ফ্লোট (floats) আছে।	১। ডিমগুলির তলদেশে একটি ক'রে গোলাকার স্ফীতি বা নব (knob) আছে।
২। ডিমগুলি পাশাপাশি অবস্থান করে অথচ পৃথক পৃথকভাবে জলে ভাসে।	২। ডিমগুলি আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দ্বারা যুক্ত হ'য়ে একসঙ্গে ভাসে।

অ্যানোফিলিস্	কিউলেক্স
৩। শূককীটগুলি জলের সহিত সমান্তরালভাবে ভাসে।	৩। শূককীটগুলি নীচের দিকে মাথা রেখে জলের ভেতর ডুবে থাকে।

প্রকৃতিগত পার্থক্য

অ্যানোফিলিস্	কিউলেক্স
১। এরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে।	১। এরা অপেক্ষাকৃত নোংরা জলে ডিম পাড়ে।
২। এরা দিনের বেলায় বের হয় না।	২। এরা দিনের বেলায়ও বের হয়।
৩। বসবার সময় দেহের পেছন-ভাগ সোজাভাবে তুলে বসবার স্থানের সাথে প্রায় ৪৫° কোণ উৎপন্ন করে।	৩। বসবার সময় পিঠ কুঁজো ক'রে বসবার স্থানের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে।

[এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে মশার জীবন বৃত্তান্ত আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।]

প্রজাপতির জীবন বৃত্তান্ত :

(Life history of Butterfly)

প্রজাপতির চিত্র-বিচিত্র বর্ণ মনমুগ্ধকর। এরাও আর্থ্রোপোডার অন্তর্গত পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। সুতরাং অন্যান্য পতঙ্গের মত এদের জীবনচক্রেও চারটি অবস্থা—ডিম (Egg), শূককীট (Larva), মূককীট (Pupa) ও পূর্ণাঙ্গ (Adult or Imago)।

ডিম—স্ত্রী প্রজাপতি পাতার ওপর একসংগে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি সাধারণতঃ গোলাকার ক্ষুদ্র ও সাদা রঙের।

শূককীট বা লার্ভা—কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে একটি লম্বা ডোরাকাটা কীট বের হয়। এইটিই লার্ভা বা শূককীট। সাধারণ ভাষায় একে শুঁয়া পোকা (Caterpillar) বলে। সাধারণতঃ আত্মরক্ষার জন্য এদের সারা গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়া থাকে। ডিম থেকে বেরিয়েই শূককীটগুলি ধীরে ধীরে পাতার সবুজ অংশ উদরসাৎ করে ও কয়েক বার খোলস পরিত্যাগ ক'রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তারপর এরা পরিণত অবস্থায় নীত হলে খাওয়া বন্ধ ক'রে স্থির হয়।

মূককীট বা পিউপা—পরিণত শূককীট মুখ নিঃসৃত লালা দ্বারা এর চারিদিকে একটি আবরণ গঠন করে। এই অবস্থার নাম গুটি বা কোকুন (Coccoon) এবং এর ভেতরকার শূককীটকে এখন পিউপা বা মূককীট বলে। পাতার গায়ে ছোট একটি বোঁটার সাহায্যে গুটিটি ঝুলতে থাকে। গুটির অন্তরালে এদের দেহের প্রচুর পরিবর্তন হয়।

প্রজাপতির জীবনচক্রের বিভিন্ন অবস্থা
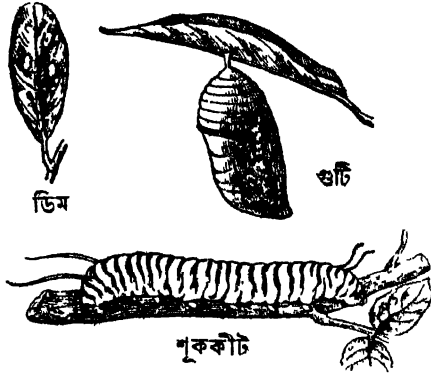
পূর্ণাঙ্গ বা ইমাগো—দশ-পনেরো দিন বাদে গুটি কেটে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ধীরে ধীরে বের হ'য়ে আসে। বেরিয়ে আসার পর কিছুক্ষণ এরা গুটির খোলসটি আঁকড়ে বসে থাকে এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেহের পূর্ণতা পেলে মধুর সন্ধানে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়।

একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির মাথার দু'পাশে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি, মাথার অগ্রভাগে একজোড়া শুঁড় থাকে। শুঁড়গুলির ডগা স্থূল। প্রজাপতির মুখে একটি চ্যাপ্টা চোষক নল ঘড়ির স্প্রিং-এর মত জড়ানো থাকে—তা সোজা করে এরা ফুলের মধু শোষণ করে। প্রজাপতির বক্ষদেশে অবস্থিত দু'জোড়া ডানা চিত্র-বিচিত্র। বসবার সময় ডানাগুলি পিঠের ওপর খাড়া হ'য়ে একত্রে মিশে থাকে। বক্ষদেশের তলার দিকে অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় এদেরও তিনজোড়া পা আছে।

[এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রজাপতির জীবন বৃত্তান্ত আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।]

কঠিনাস্থিবিশিষ্ট মৎস্যের ফুল্‌কো :

(Gills of a bony fish)

রুই, কাতলা প্রভৃতি কঠিনাস্থিবিশিষ্ট মৎস্যের মাথার দু'পাশে কানকোর ভেতর মোট পাঁচজোড়া **ফুলকো** (Gill) থাকে। ফুল্‌কোগুলি **গলবিল** (Pharynx) এর অভ্যন্তর ও **ফুল্‌কো-কক্ষ** (Gill-chamber)-এর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। পূর্ণাঙ্গ ফুল্‌কো মোট চারজোড়া। বাকী একজোড়া অসম্পূর্ণ। **গলবিল** (Pharynx)-এর দু'পাশে মোট পাঁচজোড়া **ফুল্‌কোছিদ্র** (Gill-slits) দেখা যায়। ছিদ্রগুলি **গিল আর্চ** (Gill arches) দ্বারা পরস্পর হতে পৃথক করা থাকে। গিল আর্চগুলি ফুল্‌কোগুলিরই অংশ। প্রতিটি ফুল্‌কো পৃথকভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এতে একটি হাড়ের লম্বা বাঁকানো অক্ষ আছে—অক্ষটিই গিল আর্চ। প্রতিটি গিল আর্চের ভেতরের অবতল দিকে ছোট ছোট কাঁটা দেখা যায়। এগুলিকে **গিল র‍্যাকার** (Gill Rakers) বলে। খাদ্য গলবিলের পথ দিয়ে যাবার সময় যাতে গলবিলের ছিদ্র পথে বের হয়ে না যায় তার জন্য র‍্যাকারগুলি থাকে। প্রতিটি গিল আর্চের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে **ফুল্‌কো-পাতা** (Gill filaments) গুলি সজ্জিত থাকে। এগুলিতে প্রচুর **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবাহী নালী** (Blood capillaries) থাকায় এগুলির রঙ্‌ টক্‌ টকে লাল। মাছ শ্বাসকার্যের সময় মুখ দিয়ে জল নেয় ও সেই জল ফুল্‌কোছিদ্র দিয়ে বের ক'রে দেয়। ছিদ্র পথে জল বেরিয়ে যাবার সময় ফুল্‌কো পাতাগুলি জলের সংস্পর্শে আসে ও জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুল্‌কো-পাতার রক্তবাহী নালীগুলিতে **ব্যাপন** (Diffusion) প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে ও সেগুলি হতে পরিত্যক্ত দ্রবীভূত কার্বনডাইঅক্সাইড জলে মিশ্রিত হয়ে বের হয়ে যায়। কান্‌কো ওঠা-নামা ক'রে জল বের ক'রে দিতে সাহায্য করে।

জিয়ল মাছ ডুবিয়ে মারার পরীক্ষা :

অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রবিশিষ্ট জিয়ল মাছদের যদিও ফুল্‌কো আছে, তবু শুধুমাত্র ফুল্‌কোর সাহায্যে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়ে বাঁচতে পারে না—বাঁচার জন্য এদেরকে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বায়ু থেকেও অক্সিজেন নিতে হয়।

পরীক্ষা : (Experiment) :—একটি বড় কাচের জার অর্ধেকেরও বেশী জলপূর্ণ করা হল। একটি শিঙি মাছ সেই জলে ছেড়ে দেওয়া হল। এখন মাপ মত একটি তারের জাল নিয়ে জারের ভেতর এমনভাবে আটকে দেওয়া হল, যাতে মাছটি মাথা উঁচু ক'রে জলের ওপরে বায়ুর সংস্পর্শে আসতে পারে।
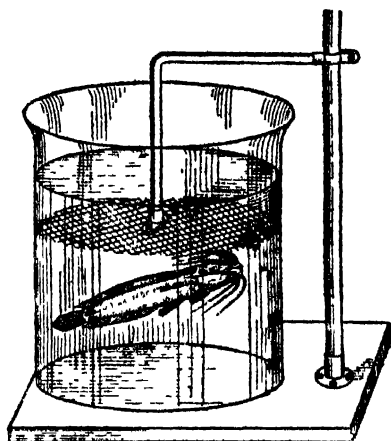
নিরীক্ষা (Observation) :—মাছটি কয়েক ঘণ্টা জলের ভেতর সাঁতার কেটে খেলা করবে ও ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে। তারপর ক্রমাগত মাছটি নির্জীব হয়ে আসবে ও ঘণ্টা চার-পাচের মধ্যেই মাছটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তলায় এলিয়ে পড়বে।

জিয়ল মাছের ডুবিয়ে মারার পরীক্ষা

সিদ্ধান্ত (Inference) :—অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রবিশিষ্ট জিয়ল মাছেরা শুধুমাত্র ফুল্‌কোর সাহায্যে জলে শ্বাসকার্য নিষ্পন্ন ক'রে বেঁচে থাকতে পারে না—বাঁচার জন্য অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বায়ু হ'তে অক্সিজেন গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

জিয়ল মাছ ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ মাছ নিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, সেই মাছ আরও বেশীক্ষণ বেঁচে থাকে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে জিয়ল মাছের বাঁচার পক্ষে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র অপরিহার্য।

INDEX (নির্দেশিকা)

উদ্ভিদবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞান